কুমারখালীর ভাষার সামাজিক স্তর বিন্যাস

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

RB

891.44
ALK

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল.ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ
জুলাই, ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

কুমারখালীর ভাষার সামাজিক স্তর বিন্যাস

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

Dhaka University Library
382705

382705

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল.ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

জুলাই, ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম কর্তৃক উপস্থাপিত, 'কুমারখালীর ভাষার সামাজিক স্তর বিন্যাস' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ গবেষক অন্য প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করেন নি।

(ড: আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

382705

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কুমারখালীর ভাষার সামাজিক স্তর বিন্যাস: গবেষণার জন্য আমি ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ-এর তত্ত্বাবধানে এম.ফিল. কোর্সে রেজিষ্ট্রিভুক্ত হই।

১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 'জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি'তে প্রতিবেদক হিসেবে কাজ করার সময় বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর এম আমিনুল ইসলাম-এর সাথে (নায়েম-এ) পরিচয় ঘটে। মূলত তিনিই আমাকে এ গবেষণা কর্মটি করার জন্য উৎসাহিত করেন। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

আমার শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের নিরন্তর তাগিদ ও সস্নেহ উপদেশনা গবেষণার প্রতিটি স্তরে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। সময়ে-অসময়ে যখনই তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছি, হাসিমুখে আমার কথা শুনেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন, এ জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

গবেষণার কাজে প্রয়োজনীয় বই-পত্র দিয়ে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী পরিচালক জনাব ইয়ামিনুর রহমান বাপ্পী ও রিসার্চ অফিসার জনাব তানভীর আহ্সান, তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। এ ছাড়াও গবেষণা কর্মের বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা আমাকে সহায়তা করেছেন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
জুলাই, ২০০০

382705

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা	১-৪
ভাষা ও সমাজ	৫-২২
নারী ও পুরুষের ভাষা	২৩-৩৯
শিক্ষিতদের ভাষা	৪০-৫৩
অশিক্ষিতদের ভাষা	৫৪-৬৯
হিন্দুদের ভাষা	৭০-৭৫
মুসলমানদের ভাষা	৭৬-৮২
পেশাগত ভাষা	৮৩-৯২
সুইপারদের ভাষা	৯৩-১০১
কুলিদের ভাষা	১০২
প্রাচীন অধিবাসীদের ভাষা	১০৩-১১৪
বর্তমান অধিবাসীদের ভাষা	১১৫-১২৪
উপসংহার	১২৫-১২৬
গ্রন্থপঞ্জি	১২৭-১২৮

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ভাষা মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। ভাষা ছাড়া মানব জীবন কল্পনা করা যায় না। ভাষা মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক করেছে। ভাষার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় মানুষের প্রতিটি কর্মে, প্রতিটি পদক্ষেপে। ভাষাহীন জীবন যেন জলহীন সমুদ্র। পৃথিবী নামক গ্রহে মানুষের বাস। পৃথিবী ছাড়া আরও বেশ কয়েকটি গ্রহ আছে। কিন্তু সে সব গ্রহে জীবের কোন সন্ধান আজ অবধি আবিষ্কৃত হয় নি। পৃথিবীতে নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। সমতল-ভূমি, উঁচু-ভূমি, নিচু-ভূমি, উঁচু-নিচু ভূমি, বন-জঙ্গল, পাহাড়, পর্বত, মরুভূমি, নদী, সমুদ্র, আগ্নেয়-গিরি, জল-প্রপাত, ঝড়, মেঘ, খরা, বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবেশের চক্রজালের অপূর্ব সমন্বয়ে পৃথিবীর সার্বিক পরিচয় পাওয়া যায়। পৃথিবীর পরিবেশে জীবের আবির্ভাব ঘটেছে। জীবন ধারনের জন্য যা প্রয়োজন তা পৃথিবীতে আছে। আর সে জন্যই পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাব। জীবের মধ্যে মানুষও পড়ে যায়। যার জীবন আছে তাকেই জীব বলে। সে হিসেবে মানুষ জীব ছাড়া অন্য কিছু নয়।

প্রত্যেক জীবের আকৃতি, চলার ধরণ, খাওয়ার ধরণ, ঘুমানোর ধরণ, আবাসস্থলের ধরণ এক রকম নয়। প্রতিটি জীব পৃথক পৃথক ভাবে চলে থাকে। জীবের পাশাপাশি আছে উদ্ভিদ, তাতেও বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে জীব-জগতের মধ্যে মানুষ তার মস্তিষ্ককে কাজে লাগিয়েছে। মস্তিষ্ককে কাজে লাগানো অর্থে যা বোঝানো হচ্ছে, তা হলো মানুষের যেমন বুদ্ধি আছে, জ্ঞান আছে তা অন্য কোন জীবের নেই। জ্ঞান-বুদ্ধির প্রতিফলন ঘটে থাকে কর্মে ও ভাষার মাধ্যমে। একক বুদ্ধি যা একজন মানুষের নিজস্ব তার উপযোগীতা পেতে হলে সে বুদ্ধি বা জ্ঞানকে প্রকাশ করতে হয়। মানুষের মনের ভাব ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত। ভাষা মানব মনের দর্পন। ভাষার মাধ্যমে একজন মানুষ অপর একজন মানুষকে বুঝতে পারে; চিনতে পারে। আদিম যুগ থেকে অদ্যাবধি পৃথিবীতে যা কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে সবই মানুষের সম্পদ। বর্তমানের এ অত্যাধুনিক যুগে মানুষ একদিনে আসতে পারে নি। মানুষ তার মস্তিষ্ককে খাটিয়ে নতুন নতুন পন্থা বা কৌশল আবিষ্কারের মাধ্যমে সভ্য ও আধুনিক জীবন পেয়েছে।

জীবের যে চলার ধরণ তার দিকে একটু নজর দিলেই বোঝা যায় প্রতিটি জীব দল বেঁধে চলে থাকে। পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়ায়, পিঁপিলিকা দলবদ্ধ হয়ে চলে; বাঘ, সিংহ ও অন্যান্য প্রাণীও দলবদ্ধভাবে চলে থাকে। সৃষ্টির শুরু থেকে এ বিষয়টি চলে আসছে। মানুষের ক্ষেত্রেও বিষয়টি সমভাবে প্রযোজ্য। মানুষ জন্মের পর থেকেই পরিবার, গোত্র, গোষ্ঠী নানাবিধভাবে সঙ্গবদ্ধ হয়ে পথ চলে আসছে। মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে। মানুষ যে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে থাকে, সেখানে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় ভাষা। আর এই যোগাযোগ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে যে জোটবদ্ধ বা গোষ্ঠীবদ্ধ বা পরিবারবদ্ধ হওয়া তা সামাজিকভাবে হয়ে থাকে।

মানুষ সমাজে বাস করে। সমাজের কিছু নিয়ম-কানুন থাকে। উল্লেখ্য যে পৃথিবীর সব মানুষ কিন্তু শুধুমাত্র একটি সমাজে বাস করে না। নানা জাতের, নানা বর্ণের, নানা ধর্মের কারণে নানা সমাজ গড়ে উঠেছে। এক সমাজের নিয়ম-কানুন অন্য সমাজে গ্রহণযোগ্য হতেও পারে, নাও পারে। একটি সমাজের রীতি অপর একটি সমাজের রীতি বহির্ভূত কোন বিষয় হতে পারে।

সমাজের নিয়ম-কানুন বা নিয়ম-রীতি দৈবাৎক্রমে পাওয়া কোন বিষয় নয়। সব নিয়ম-কানুন মানুষ সৃষ্টি করেছে, মানুষের নিজস্ব প্রয়োজনে। মানুষের সৃষ্টি ক্ষমতার মূলে অবস্থান করে তার মস্তিষ্ক। সৃষ্টির

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়টি প্রকাশিত হয় ভাষার মাধ্যমে। অর্থাৎ মানুষের মস্তিষ্কের সব ধ্যান ধারণা প্রকাশিত হয় ভাষার মাধ্যমে। আদিম যুগে মানুষ যখন বনে জঙ্গলে বাস করতো, শিকারীর বেশে অবস্থান করতো তখনও মানুষ কোন না কোন ভাষার মাধ্যমে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করেছে। পরস্পরের সাথে যোগযোগ রক্ষা না করলে হিংস্র পশু পাখি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মানুষ রক্ষা পেত না। তাছাড়া আদিম যুগ থেকেই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে চলতে শুরু করেছে। একজন মানুষের প্রতি অন্য একজন মানুষের মমত্ববোধ ও মান্য-অমান্যের বিষয়টি তখনও ছিল বলে ধরে নেয়া যায়, তা না হলে মানুষ আজকের অবস্থানে আসতে পারতো না। অর্থাৎ মানুষ জন্মের পর থেকেই সামাজিকভাবে চলতে শুরু করেছে এবং একই সাথে মানুষ তার নিজের মনোভাবকে প্রকাশ করার জন্য ভাষার মত বিস্ময়কর মাধ্যমটির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।

পৃথিবীতে নানা ভাষা রয়েছে। কোন ভাষার লিখিত রূপ আছে। আবার কোন ভাষার লিখিত রূপ নেই। যে সব ভাষার লিখিত রূপ নেই, সে সব ভাষার কথকের মৃত্যুর সাথে সাথে সে সব ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। আবার যে সব ভাষার লিখিত রূপ আছে, সে সব ভাষার কথক সংখ্যা বাড়তে পারে বা কমতে পারে। কথক সংখ্যা বাড়া ও কমার সাথে সাথে ভাষার বেঁচে থাকা ও বিলুপ্ত হওয়া অনেকাংশে নির্ভর করে। ভাষার সাথে ক্ষমতা ও অর্থের বিষয়টি জড়িত। ভাষার সাথে অর্থ ও ক্ষমতার বিষয়টি জড়িত আছে বলেই কোন ভাষা পৃথিবীর অনেক দেশে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য একটি ভাষার প্রতি মানুষের যে ঝোঁক দেখা যায়, তার মূলে অর্থ ও ক্ষমতার বিষয়টি জড়িত। আদিম যুগে মানুষ খন্ড খন্ড গোষ্ঠীতে বাস করতো, বর্তমানে কিন্তু তেমন ভাবে বাস করে না। বর্তমানে সমগ্র পৃথিবী যেন একটি পরিবারের মত হয়ে গেছে। পৃথিবী যে একটি পরিবারের মত অবস্থান করতে পেরেছে, তার মূলে অবস্থান করছে ভাষা। একজনের ভাষা অন্য একজন বুঝতে না পারলে মানুষের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হতো। জ্ঞানবিজ্ঞান, ক্ষমতা ও অর্থনৈতিকভাবে যে সব ভাষাভাষী যথেষ্ট শক্তিশালী, সে সব ভাষাভাষীর ভাষা শেখার প্রতি অন্য ভাষাভাষীদের মধ্যে আগ্রহ দেখা যায়। মূলত অর্থনৈতিক কারণ ও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষা এ ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

কোন ভাষা-ই কোন দেশের অথবা কয়েকটি দেশের কিংবা আন্তর্জাতিক ভাষা হওয়ার জন্য সৃষ্টি হয় নি। পৃথিবীর সব ভাষা-ই প্রথমে কোন পরিবার নির্ভর, গোষ্ঠী নির্ভর কিংবা এলাকা নির্ভর ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। যেমন বাঙালীদের যে প্রচলিত ভাষা বা চলিত ভাষা কিংবা শিষ্ট ভাষা তা গড়ে উঠেছে কলকাতা, উত্তর চব্বিশ পরগণা, নদীয়া ও হুগলীর কথ্য বাংলাকে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ একটি আঞ্চলিক ভাষা বা এলাকার ভাষা সমগ্র বাঙালীদের গ্রহণযোগ্য ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বর্তমানে যেমন সাহিত্যে চলিত ভাষা ব্যবহৃত হয়, এক সময় তা হতো না। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত সাহিত্যের ভাষা হিসেবে সাধু ভাষার স্থান ছিল অগ্রগণ্য। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যায় থেকে সাহিত্যে চলিতভাষার অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকে সমগ্র বাঙালীদের মধ্যে চলিত ভাষার একচ্ছত্র প্রচলন লক্ষণীয়। বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় বর্তমানেও সাধু ও চলিত ভাষার সহ অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া দলিলপত্রে এবং বেশ কিছু অফিসে এখনও সাধুভাষা লিখিত ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ বাঙালী সমাজে ভাষার দুটি স্তর বা রীতি লক্ষণীয়। তবে বর্তমানে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বত্র চলিত ভাষা ব্যবহৃত হয় বা হচ্ছে, তা বলা যেতে পারে।

সমগ্র বাঙালীদের আদর্শ ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া যে বাংলা রূপ, সে বাংলা রূপের সাথে বাংলাদেশের কুমারখালী অঞ্চলের যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। কারণ কুমারখালী নদীয়া জেলার অংশ

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। আদর্শ বা শিষ্ট ভাষা হিসেবে কোন ভাষা স্বীকৃতি পাওয়ার পর ভাষার প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে মানুষের সচেতনা কিংবা অসচেতনার দিকটি সামনে চলে আসে। কোন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা, যে ভাষা আদর্শ কথ্য ভাষার মর্যাদা পেয়ে থাকে, সাধারণভাবে মনে করা হয়, সে অঞ্চলে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে সে ভাষাই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু ভাষার শিষ্ট রূপের ভিত্তিমূলে যে এলাকার ভাষা অবস্থান করেছে বলে প্রতীয়মান হয়, সে এলাকার ভাষা যে সম্পূর্ণরূপে শিষ্টরূপের মত অবস্থান করে তা ঠিক করে বলা যায় না। কারণ ভাষা পরিবর্তনশীল। সময় ও যোগাযোগের ভিন্নতা ভাষার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

সমাজে অবস্থানরত মানুষের ভাষা ব্যবহার কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজের নিয়ম-রীতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনে যেমন সমাজে বাস করে, তেমনি একজন মানুষ অপর একজন মানুষের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ভাষা ব্যবহার করে থাকে। ভাষা ও সমাজ দুটি বিষয়েরই মৌলিকত্ব বর্তমান। মানব শিশু জন্মের পূর্ব হতে কোন সামাজিক নিয়ম-কানুন আয়ত্ত্ব করে আসে না। সে যে সমাজে জন্ম নেয়, সে সমাজের নিয়ম শৃঙ্খলার অনুসারী হয়ে থাকে। ভাষার ক্ষেত্রেও বিষয়টি সমভাবে প্রযোজ্য। শিশু জন্মের পর যে ভাষাভাষী অঞ্চলে বেড়ে ওঠে সে ভাষা-ই শিখে থাকে। শিশুর এই ভাষা জ্ঞান ও সামাজিক জ্ঞান সহজাত। বড়দের আচার-আচরণ ও কথাবার্তা দেখে-শুনে শিশু সে রকম আচার-আচরণ ও কথাবার্তা বলতে চেষ্টা করে।

সমাজে মান্য-অমান্যের বিষয় আছে। বড়, ছোট, ধনী, গরীব, শিক্ষিত, অশিক্ষিত নানা শ্রেণীর মানুষ সমাজে বাস করে থাকে। সমাজে অবস্থান করতে হলে ভাষার প্রয়োগের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমবয়স্ক কিংবা বন্ধুর সাথে যে ভাষায় কথা বলা যায়, বাবা কিংবা মায়ের সাথে সে ভাষায় কথা বলা যায় না। বাড়ির ভৃত্যের সাথে যে ভাষায় কথা বলা হয়, শিক্ষকের সাথে সে ভাষায় কথা বলা হয় না। অর্থাৎ সমাজে মানুষের অবস্থান অনুযায়ী ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কুমারখালীর সমাজে ভাষার ব্যবহার কেমন তা বিশ্লেষণ করাই হলো বর্তমান গবেষকের মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশ আদমশুমারী ১৯৯১, কমিউনিটি সিরিজ, জেলা: কুষ্টিয়া থেকে কুমারখালী সম্বন্ধে যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হলো, ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই কুমারখালী থানা জনসংখ্যার দিক থেকে কুষ্টিয়া জেলার তৃতীয় বৃহত্তম থানা হিসেবে অবস্থান করে আসছে। কুমারখালী থানার নাম করণের ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি মূল হিসেবে অবস্থান করেছে তা কেউই ঠিক মত বলতে পারেন না। পূর্বে এ এলাকার নাম ছিল 'তুলশীডাংগা'। মোগল শাসনামলের সময় এই এলাকায় একজন রাজস্ব সংগ্রাহক নিয়োগপ্রাপ্ত হন, যাঁর নাম ছিল 'কামার কুলি'। সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, কুমারখালী থানা ঐ ব্যক্তির নামানুসারেই পরবর্তীতে পরিচিতি লাভ করেছে।

নদীসহ কুমারখালী থানার আয়তন প্রায় ২৬৫.৮৯ বর্গকিলোমিটার। কুমারখালী থানায় অবস্থিত নদীর আয়তন প্রায় ১১.৯১ বর্গকিলোমিটার। এই থানা ২৩.৪৪′ ও ২৩.৫৮′ উত্তর অক্ষাংশের এবং ৮৯.০৯′ ও ৮৯.২২′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। কুমারখালী থানার মোট জনসংখ্যা ২৬৯০০৮ জন। তার মধ্যে ১৩৯২৫৫ জন পুরুষ এবং ১২৯৭৫৩ জন মহিলা। কুমারখালীর জনসংখ্যার মধ্যে গ্রামে বাস করে ২৫৭৩৩৩ জন। তার মধ্যে পুরুষ ১৩৩১৯৩ জন এবং মহিলা ১২৪১৪০ জন। শহরে বাস করে ১১৬৭৫ জন। তার মধ্যে পুরুষ ৬০৬২ জন এবং মহিলা ৫৬১৩ জন। কুমারখালীতে ৭ বছর ও তার উপরের বয়সের মোট জনসংখ্যার মধ্যে শিক্ষিতের হার ২৪.৯%। তার মধ্যে পুরুষ ৩০.৩% এবং মহিলা ১৯.২%। কুমারখালী থানার উত্তরে পাবনা সদর থানা, পূর্বে খোকসা থানা এবং রাজবাড়ী

Dhaka University Institutional Repository

জেলার পাংশা থানা, দক্ষিণে খোকসা থানা এবং ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা থানা এবং পশ্চিমে কুষ্টিয়া সদর থানা অবস্থিত।

বর্তমান গবেষক লেখাপড়ার কারণে ছোটবেলা কুমারখালীতে অবস্থান করেছেন। কুমারখালীতে অবস্থান করার জন্য কুমারখালীর সামাজিক রীতি-নীতি ও ভাষা ব্যবহারের সাথে পূর্ব পরিচয় রয়েছে, যা সমাজে ভাষা ব্যবহার সংক্রান্ত ফিল্ড ওয়ার্কের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ফিল্ড ওয়ার্কের সময় কুমারখালী থানার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বিভিন্ন বয়স, ধর্ম, পেশা অনুযায়ী বিভিন্ন নারী-পুরুষের সাথে মিশেছি, কথা বলেছি। কুমারখালীর ভাষাভাষীরা নিজেদের মধ্যে কিভাবে কথা বলেন তা প্রত্যক্ষ করেছি। কুমারখালীর বিভিন্ন হাট-বাজারে গিয়ে তাঁদের কথাবার্তা শুনে তা লিপিবদ্ধ করেছি। কুমারখালীর নারী পুরুষেরা স্বাভাবিকভাবে নিজেদের মধ্যে কেমনভাবে কথা বলেন, তা যেমন লক্ষ্য করেছি, ঠিক তেমনি উত্তেজিত অবস্থায় কেমনভাবে ভাষা ব্যবহার করেন, তাও প্রত্যক্ষ করেছি এবং ভাষাভাষীদের জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে তাঁদের ব্যবহৃত ভাষা লিপিবদ্ধ করেছি। ধর্মীয় দিক বিবেচনায় রেখে মুসলমান ও হিন্দুদের ভাষা ব্যবহারের বিষয়ে পৃথক পৃথক ভাবে তথ্য সংগ্রহ করেছি এবং তা লিপিবদ্ধ করেছি। কুমারখালীতে ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহ করেছি এবং চলিত ভাষায় তার রূপ কি তা লিপিবদ্ধ করেছি। কুমারখালীতে বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা ব্যবহৃত হয় কিনা তা খুঁজে বের করেছি। সর্বোপরি কুমারখালীর ভাষার সামাজিক স্তরীকরণের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ও তথ্য নির্ভর গবেষণা করেছি। গবেষক যেহেতু কুমারখালীতে বেশ কিছুকাল যাবত অবস্থান করেছেন, তাই কুমারখালীর বহু মানুষের সাথে তাঁর পূর্ব পরিচয় রয়েছে। তাছাড়াও ফিল্ড ওয়ার্কের সময় নতুন করে বহু লোকের সাথে পরিচিত হয়ে তাঁদের কাছ থেকে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কুমারখালীর ভাষা চলিত ভাষা কিংবা শিষ্ট ভাষার খুব কাছাকাছি। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া কুমারখালীর ভাষা চলিত ভাষা বলে প্রতীয়মান হয়। সামাজিকভাবে মানুষের অবস্থান অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারের যে রূপ তা সংগ্রহ করেছি এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে লিপিবদ্ধ করেছি। সর্বোপরি কুমারখালীর ভাষার সামাজিক স্তরীকরণের দিকটি পূর্ণাঙ্গভাবে প্রত্যক্ষ করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা ও সমাজ

ভাষা : জীবন ধারনের জন্য যেমন অক্সিজেনের প্রয়োজন, জীবনকে পূর্ণাঙ্গতা দান করার জন্য তেমনি ভাষার প্রয়োজন। ভাষা ছাড়া মানব জীবন কল্পনা করা যায় না। জীব সত্তার সাথে 'ভাষা' বিষয়ক শব্দটির যোগসূত্র দেখতে পাওয়া যায়। যে কোন জীবই কোন না কোন ইঙ্গিত অথবা ধ্বনির মাধ্যমে তাদের জীবন প্রবাহকে পরিচালিত করে থাকে। এই ধ্বনির পরিচালিত রূপকে এক অর্থে ভাষা হিসেবে ধরা যেতে পারে। জীব বলতে 'মানুষ'ও তার মধ্যে পড়ে যায়। জীবের পথ চলার জন্য যে ইঙ্গিত বা ধ্বনি সৃষ্টির প্রক্রিয়া দেখা যায় তার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যের মূলে যা অবস্থান করছে তা হলো ভাষা বিষয়ক শব্দটিকে বৈজ্ঞানিকভাবে দেখতে চেষ্টা করা।

মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছে। এটাকে মানব সভ্যতা বা মানব ধর্ম বলা যেতে পারে। একে অপরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে হলে যা প্রয়োজন তা হলো ভাববিনিময় করা। আর এই ভাববিনিময় করতে হলে যা প্রয়োজন তা হলো ভাববিনিময়ের ক্ষমতা বা যোগ্যতা। ভাববিনিময় যোগ্যতা অর্জন করতে যা লাগে তা হলো ভাষার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করবার মত ক্ষমতা। ভাষা ছাড়া ভাববিনিময়ের কোন প্রসঙ্গ জীবন্ত হতে পারে না। ভাষাহীন ভাবমিনিময়তা মৃতের স্বর্গে অবস্থান করে। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ্য যে ভাষা বিষয়ক শব্দটির মধ্যে কোন কিছুকে বোঝাতে সক্ষম ইঙ্গিতও চলে আসে। ভাষা হলো, 'ভাব প্রকাশক উক্তি বা সংকেত (বোবার ভাষা, চোখের ভাষা, পাখীর ভাষা)। ... নির্দিষ্ট কোন দেশ বা অঞ্চলের অধিবাসীদের বা কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের মনের ভাব প্রকাশ করিতে ব্যবহৃত শব্দাবলী ও তাহার প্রয়োগ-কৌশল, (ইংরেজী ভাষা, বাংলা ভাষা, ঢাকার ভাষা)। ... নিজস্ব ভাব প্রকাশের রীতি ...। উক্তি,বচন, কথা ...।' [১]

ভাব প্রকাশক উক্তি বা সংকেত বিচ্ছিন্ন বা খণ্ড খণ্ড কোন বিষয় নয়। সে উক্তি বা সংকেতের অর্থ বিদ্যমান। যার মাধ্যমে বক্তার মনোভাব প্রকাশিত। মানুষের সব থেকে বড় যে আকাঙ্ক্ষা তা হলো তার মনের ভাবকে ভাষার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা। মনের ভাব দেখা যায় না। তবুও এ বিষয়টি ভাষার কেন্দ্র স্থলে অবস্থান করে। 'ধ্বনিতে গড়া বিশেষ বিশেষ প্রতীক কেবল যে বিশেষ বস্তুর নামধারী হয়ে কাজ চালাচ্ছে তা নয়। আরো অনেক সূক্ষ্ম তার কাজ। ভাষাকে তাল রেখে চলতে হয় মনের সঙ্গে। সেই মনের গতি কেবল তো চোখের দেখার সীমানার মধ্যে সংকীর্ণ নয়, যাদের দেখা যায় না, ছোঁওয়া যায় না, কেবলমাত্র ভাবা যায়। মানুষের সবচেয়ে বড়ো দেনাপাওনা তাদেরই নিয়ে।' [২]

মানব সভ্যতায় যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ভাষা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনে এ বিস্ময়কর মাধ্যমটির সূচারু ব্যবহার নিশ্চিত করেছে। পৃথিবীতে যেমন নানা জাতের, নানা বর্ণের, নানা ধর্মের লোক দেখা যায়, তেমনি তাঁরা নানা ভাষায় তাঁদের মনের ভাব প্রকাশ করে থাকেন। ভাষা কখন সৃষ্টি হয়েছে তা বলা যায় না বা এর কোন সঠিক উত্তরও খুঁজে পাওয়া যায় না। ভাষা সৃষ্টি হয়েছে মানুষের প্রয়োজনে। একজন মানুষের সাথে অন্য একজন মানুষের যোগাযোগ যেমন ভাষার মাধ্যমে হয়, তেমনি একটি গোষ্ঠীর সাথে অন্য গোষ্ঠীর, একটি জাতির সাথে অন্য জাতির অথবা একটি রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের যোগাযোগও হয়ে থাকে ভাষার মাধ্যমে। 'ভাষা বানিয়েছে মানুষ, এ কথা কিছু সত্য আবার অনেকখানি সত্য নয়। ভাষা যদি ব্যক্তিগত কোনো মানুষের বা দলের কৃত কার্য হত তা হলে তাকে বানানো বলতুম; কিন্তু ভাষা একটা সমগ্র জাতের লোকের মন থেকে, মুখ থেকে, ক্রমশই গড়ে

Dhaka University Institutional Repository

উঠেছে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জমিতে ভিন্ন ভিন্ন রকমের গাছপালা যেমন অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে, ভাষার মূল প্রকৃতিও তেমনি।' [৩]

ভাষা একজন মানুষের সাথে অন্য মানুষের যোগাযোগ স্থাপন করার একমাত্র সেতু বন্ধন। এই সেতু বন্ধন আবার অউপযোগীতার কোন সেতুবন্ধন নয়। ভাষার উপযোগীতা আছে। মানুষের প্রয়োজনে ভাষায় উপযোগীতার সমন্বয় ঘটে থাকে। ভাষার উপযোগীতার মধ্যে প্রধান হলো বক্তা যা বলতে চায় বা যা বোঝাতে চায় তা শ্রোতাকে বুঝতে হবে বা বোঝার মত ক্ষমতা থাকতে হবে। এই বলা ও বোঝার জন্য ভাষায় শৃঙ্খলা থাকে। প্রতিটি ভাষাভাষী অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ শব্দ দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকে বিশেষ বিশেষ বস্তু বা ভাবপ্রকাশক উক্তি। বিশেষ বিশেষ শব্দ তৈরি করার জন্য প্রতিটি ভাষার উচ্চারণ ভঙ্গি বা শব্দ উচ্চারণ ভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্যই ভাষার সবথেকে বড় অলংকার। পৃথিবীতে যতগুলো ভাষা আছে তার সবগুলোরই যে লিখিতরূপ আছে তা কিন্তু নয়। যে সব ভাষার লিখিত রূপ নেই তার বর্ণ বিন্যাসও নেই। যে সব ভাষার লিখিত রূপ অথবা বর্ণ নেই সে সব ভাষার ব্যবহারিক নিয়ম বা বিধিও সুস্পষ্টভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাই বলে সে সব ভাষার যে অর্থ নেই তা কিন্তু নয়। অর্থ ছাড়া ভাষার প্রকাশ মৃত। অর্থ ছাড়া ভাব প্রকাশ হয় না। লিখিতরূপ ছাড়া যে সব ভাষা আছে সে সব ভাষার ভাষা ব্যবহার কারীদের মধ্যে ভাষা ব্যবহার্য নিয়ম থাকে। তাহলে বলা যেতে পারে যে, লিখিতরূপ ছাড়াও ভাষা আছে এবং ভাষার উৎপত্তি ও ব্যবহারের বেশ পরে লিখিত রূপের উদ্ভব ঘটেছে। ভাষাকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এক এক ভাষাবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ভাষা যেন এক এক রূপে ধরা দিয়েছে।

'ভাষার বয়স কত? ভাষা ব্যবহারকারী মানুষের বয়স কত? ভাষা ও মানুষের বয়স কি এক? এসব প্রশ্ন যেমন মৌলিক উত্তরও তেমনি জটিল। এসব প্রশ্নের কোনো সহজ বা সংক্ষিপ্ত উত্তর নেই। ভাষা ও সভ্যতার ইতিহাস পরস্পর সম্পর্কিত। মানুষের প্রাক্ ইতিহাস নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা খুবই কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয়েছে, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মাধ্যমে মানুষের দৈহিক বিবর্তনের প্রমাণপঞ্জী পাওয়া গিয়েছে কিন্তু ভাষার প্রাক্ ইতিহাসের প্রত্যক্ষ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কেবলমাত্র লিখন প্রণালী আষ্কিারের পরবর্তী সময়ে পাওয়া যায়। পাথর, পোড়ামাটি প্রভৃতির গাত্রে উৎকীর্ণ যে সব লেখা পাওয়া গিয়েছে তার প্রাচীনতমগুলোর বয়স পাঁচ হাজার বছরের অনেক আগে হয়েছিল। সতরাং ভাষার লিখিত রূপের প্রাচীনতম নিদর্শন থেকেও ভাষার উদ্ভব বা বিবর্তনের পূর্ণ সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।' [৪]

'আজকের পৃথিবীতে প্রায় চার হাজারেরও বেশি ভাষায় কথা বলা হয়। ... তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পৃথিবীর ঐ চার হাজার ভাষা অনেকগুলি ভাষাবংশে শ্রেণীবদ্ধ, যার প্রতিটিতে দুই থেকে শতাধিক পর্যন্ত ভাষা অন্তর্ভুক্ত। সম্পর্কিত ভাষাগুলি এক একটি প্রত্নভাষার বিবর্তিত রূপ যে প্রত্নভাষা এখন অবলুপ্ত বা যার কোনো লিখিত নিদর্শন নেই। বংশগতভাবে সম্পর্কহীন বহু সংখ্যক ভাষাগোষ্ঠীর অস্তিত্ব মানব সমাজের ভাষা বৈচিত্র্যের পরিচায়ক এবং এ সম্ভাবনার দ্যোতক যে মানুষের প্রাক্ ইতিহাসের আদি পর্বেই ভাষার উদ্ভব। বস্তুত ভাষা উদ্ভবের ইতিহাস এতই প্রাচীন যে ভাষার ইতিহাস পুনর্গঠনের অত্যাধুনিক পদ্ধতিও মানব সমাজের আদি ভাষা বা আদিম ভাষা গুলির ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ আভাস প্রদানে সক্ষম নয়।' [৫]

ভাষা হলো 'দেশ বিশেষে বা জাতিবিশেষের মধ্যে প্রচলিত অথবা বিশেষ উদ্দেশ্যে বা রূপে ব্যবহৃত শব্দাবলী, এবং তাহার প্রয়োগ প্রণালী, Language, dialect, Style .....মনোভাব প্রকাশক উক্তি বা সংকেত।' [৬]

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা বিষয়ক শব্দটি উচ্চারণের সাথে সাথে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো ভাব প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজনীয় শব্দাবলী ও বাক-কৌশল। এখানে প্রয়োজনীয় শব্দাবলী ও বাক-কৌশল বলতে বক্তা যা বলতে চায় বা বোঝাতে চায় তার জন্য ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দসমষ্টির কথা বলা যেতে পারে। শ্রোতা এই প্রয়োজনীয় বাক-কৌশলের দ্বারা বক্তার মনের ভাব বুঝতে পারেন। ভাষা 'ভাব প্রকাশক উক্তি বা সংকেত। ... নির্দিষ্ট কোনো দেশ বা অঞ্চলের অধিবাসীদের বা কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের মনের ভাব প্রকাশ করতে ব্যবহৃত শব্দাবলী ও তার প্রয়োগ কৌশল। নিজস্ব ভাব প্রকাশের রীতি। উক্তি, রচনা, কথা।' [৭]

ভাষার পূর্বশর্ত হলো কণ্ঠনি:সৃত স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ধ্বনি। স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ধ্বনির বিষয়টির সাথে মানুষের যোগসূত্র থাকতে হবে। কারণ ভাষা মানুষের পারস্পরিক যোগাগের প্রধান হাতিয়ার। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ভাষা সৃষ্টির মূলে ফুসফুস, মুখবিবর, কণ্ঠ, নাসিকা কক্ষ ইত্যাদি বাক্‌যন্ত্রের পাশাপাশি মস্তিষ্কের মানবীয় গুণাবলীর বিষয়টি জড়িত রয়েছে। ভাষার বিষয়ে ধর্ম, বর্ণ, জাতি কিংবা দেশের প্রসঙ্গ প্রযোজ্য নয়।

'ভাষা বলতে আমরা বুঝি ছোট বা বড় একটি জনসমষ্টির ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যম বা মৌখিক যোগাযোগের বাহনকে। পুঁথির ভাষাতো মুখের ভাষাকে ধরে রাখারই প্রয়াস মাত্র। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় এমন অনেক ছোট ছোট ভাষাগোষ্ঠী আছে যাদের সদস্য সংখ্যা কয়েকশতের বেশি নয় এবং দ্রুত ঐসব ভাষা অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বা মৃত ভাষায় পরিণত হতে চলেছে। আবার এমনও দেখা যায় যে ক্ষুদ্র একটি অঞ্চলের ভাষা পৃথিবীর বিরাট অংশ জুড়ে আধিপত্য করছে। যেমন – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে ইংলন্ডের ভাষার একক আধিপত্য। ভাষার পৃথিবী এক আশ্চর্য পৃথিবী কারণ ভাষার কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক, ধর্মীয়, জাতীয় সীমারেখা নেই, একই ভাষা বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন জাতির মাতৃভাষা হতে পারে আবার একটি ভাষা কেবল একটি দেশের একটি জাতির, একটি ধর্মের মানুষের ভাষাও হতে পারে।' [৮]

ভাষা স্বেচ্ছা প্রণোদিত ধ্বনির সমষ্টি। কিন্তু অন্যান্য জীবও ধ্বনি সৃষ্টি করতে পারে। যেমন গরু, ছাগল, হাতি ইত্যাদি। তবুও এদের সৃষ্ট ধ্বনিকে ভাষার আওতায় ফেলা যায় না। কারণ ভাষা একমাত্র মানুষের সৃষ্ট ও একজন মানুষের সাথে অন্য একজন মানুষের যোগাযোগ করবার জন্য প্রকৃতি প্রদত্ত বিস্ময়কর জটিল বৈজ্ঞানিক মাধ্যম। যার দ্বারা মানুষ মানবিক গুণাবলীর মত অপূর্ব সভ্যতার ছায়া তলে আসতে পেরেছে। যা মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীবের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। তবে ভাষার জটিলতা ও বৈজ্ঞানিকতা খুব একটা মানুষের নজরে আসে না। এই না আসার মূলে যা কাজ করে তা হলো সহজে পাওয়া দুর্লভ বিষয়াদি সম্পর্কে মানুষের চিন্তা-ভাবনার দৈন্য বা এক ধরনের উদাসীনতা। 'ভাষা' শুধুমাত্র স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ধ্বনি হলেই চলে না ভাষার অর্থ থাকতে হবে এবং সেই অর্থের প্রহণযোগ্যতাও থাকতে হবে। তাহলেই ভাষার উপযোগীতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাষার উপযোগীতার জন্যই যে কোন ভাষার ভাষিক সংখ্যা নির্ধারিত হয়ে থাকে।'ভাষা হচ্ছে কণ্ঠ নিঃসৃত ধ্বনি যার অর্থগত দিক বিদ্যমান এবং বিশেষ সম্প্রদায় দ্বারা ব্যবহৃত।

ভাষার উপরোক্ত সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে অঙ্গভঙ্গি বা ট্রাফিক সিগন্যাল ভাষা রূপে বিবেচিত নয়। কেননা, এ গুলির সাহায্যে অর্থ প্রকাশিত হলেও কণ্ঠ নিঃসৃত ধ্বনি দ্বারা গঠিত ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান নয়। ভাষার প্রদত্ত সংজ্ঞানুসারে ভাষার যে বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয়, তা হচ্ছে:

Dhaka University Institutional Repository

ক. ভাষা কণ্ঠনি:সৃত ধ্বনির সাহায্যে গঠিত;

খ. ভাষার অর্থদ্যোতকতা গুণ বিদ্যমান, এবং

গ. ভাষা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ও ব্যবহৃত।' [৯]

তা হলে ভাষা হতে হলে অবশ্যই কণ্ঠনি:সৃত ধ্বনির রূপায়নে অর্থবোধক উপাদান হতে হবে। যার মাধ্যমে বক্তার মনের ভাব প্রকাশিত হয়। অর্থবোধক উপাদান কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের যোগাযোগের মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'ভাষা সম্পর্কে বলা যায় যে

প্রথমত: ভাষা একটি ব্যবস্থা(System)

দ্বিতীয়ত: ভাষা প্রতীকের (Symbol) মাধ্যমে রূপান্তরিত সংকেতমালা (System of Symbol)

তৃতীয়ত: ঐ প্রতীকগুলো কণ্ঠধ্বনিজাত (Vocal) অর্থাৎ কণ্ঠনি:সৃত অর্থবোধক ধ্বনির বিন্যাস।

চতুর্থত: এ প্রতীকগুলো স্বেচ্ছা প্রণোদিত (Arbitrary) ।' [১০]

ভাষার কথায় যে বিষয়টি বারবার ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তা হলো ভাষা মানব জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবহারিক হাতিয়ার। যে হাতিয়ারের সুচারু প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত অর্থে মানুষে পরিণত হতে পেরেছে। ভাষা ছাড়া মানব জীবন অকল্পনীয়। সত্যি কথা বলতে কি বাতাসের যে উপযোগীতা আছে তা সাধারণত আমরা খুব একটা অনুভব করতে চেষ্টা করি নে, এ কারণে যে প্রকৃতি থেকে আমরা অতি সহজেই বাতাস পেয়ে থাকি। ভাষার বিষয়েও তেমনি বলা যায়। তবে পৃথিবীর সব মানুষ যেমন বাতাসের উপাদানের মধ্য হতে শুধুমাত্র অক্সিজেন গ্রহণ করে। তেমনটি ভাষার বেলায় খাটে না। কারণ পৃথিবীতে শুধুমাত্র একটি ভাষা ব্যবহৃত হয় না। ভাষা সমাজ নির্ভর অথবা গোষ্ঠী নির্ভর হয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে দেশ অথবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত হয়ে থাকে, তার ব্যবহারের কথক ও অর্থনৈতিক কারণে। ভাষা কণ্ঠ থেকে বের হওয়া ধ্বনির সমন্বয়ে গঠিত। এ ধ্বনির অর্থতাত্ত্বিক ক্রম থাকে। অর্থতাত্ত্বিক ক্রম ছাড়া ভাষা তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। খন্ড খন্ড ধ্বনি যা বিশৃঙ্খল, যার কোন অর্থ নেই তাকে ভাষা বলা যায় না। 'A language is a structural system of arbitrary vocal sounds and sequences of sounds Which is used, in interpersonal communication by an aggregation of human beings, and Which rather exhaustively catalog the things, events and processes in the human environment.' [১১]

প্রত্যেক মানুষের কর্ম ও জীবন প্রবাহ ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে। ভাষাহীন জীবন প্রবাহ ও কর্ম যেন জলহীন সমুদ্র। প্রকৃত অর্থেই মানুষ যা করে কিংবা যা করতে চায় তা ভাষার অলংকারে পরিপূর্ণ হয়ে তাঁর কর্মে প্রতিফলিত হয়। ভাষাবিজ্ঞানী CHARLES F. HOCKETT ভাষার বিষয়ে বলেন, 'Every one in every walk of life, is concerned with language in a practical way, for we make use of it in virtually everything we do. For the most part our use of language is so automatic and natural that we pay no more attention to it than we do to our breathing or to the beating of our hearts.' [১২]

ভাষা মানুষকে পশু থেকে পৃথক করেছে। মানব জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে ভাষার অপরিহার্যতা লক্ষ্য করা যায়। তবে এই অমূল্য সম্পদ ভাষা নিয়ে যতটুকু কাজ হওয়ার কথা বা দরকার ঠিক ততটুকু হয়েছে তা বলা যায় না। ভাষাবিজ্ঞান যে মানব জীবনের সব থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয় এটাও

Dhaka University Institutional Repository

ঠিকমত আলোচিত হয় নি। LEONARD BLOOM FIELD ভাষার বিষয়ে বলেন, 'Language plays a great part in our life. Perhaps because of its familiarity, we rarely observe it , taking it rather for granted, as we do breathing or walking. The effects of language and remarkable, and include much of What distinguishes man from the animals, but language has no place in our educational program or in the speculations of our philosophers.' [১৩]

ভাষা তার চলার গতিকে ছান্দিক ও শ্রুতিমধুর করেছে। ভাষার কাঠামোর দিকে একটু নজর দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভাষার প্রয়োগ রীতি কি হবে তা কখনও কোন শিশুকে খুব একটা শিখিয়ে দিতে হয় না। কিন্তু শিশু যে সমাজে কিংবা যে ভাষিক অঞ্চলে বেড়ে ওঠে সে সমাজের অথবা ভাষিক অঞ্চলের ভাষা আয়ত্ব করে থাকে। প্রথমে ধ্বনি, তারপর ছোট ছোট শব্দ, এভাবে শিশু একদিন সুন্দর সুন্দর বাক্যে তার মনের ভাব প্রকাশ করতে থাকে। এই ধ্বনি, শব্দ ও বাক্যিক প্রয়োগের বিষয়টি ভাষার শৃঙ্খলার সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। ভাষার শৃঙ্খলায় যেন বলে দেয় তার প্রকাশ ভঙ্গি বা রীতি কী হবে। যার পূর্ণাঙ্গতা আসে সম্পূর্ণরূপে অর্থ প্রকাশক বাক্যিক সংগঠনের সুচারু প্রয়োগের মাধ্যম। 'a System of communication consisting of a set small parts and a set of rules Which decide the ways in Which these parts can be combined to produce message that have meaning. Human language consists of wards that are usually spoken or written.' [১৪]

মৌখিক উচ্চারিত ধ্বনি যা কণ্ঠনি:সৃত এবং যার অর্থ আছে তা নিয়েই ভাষা সংক্রান্ত আলোচনা। তবে মৌখিক উচ্চারিত ধ্বনি ছাড়াও ইশারা ইঙ্গিতকেও ভাষার স্তরে ফেলা যায়। কেননা ইশারা, ইঙ্গিতের মাধ্যমে মানুষ যে মনের ভাব প্রকাশ করে না তা কিন্তু নয়। তাছাড়া কখনও দেখা যায় কোন একজন বক্তা কাউকে মুখে একটি কথা বলল, শ্রোতা বক্তার কথা শোনার পর মুখে কিছু না বলে ইশারায় বক্তাকে কোন কিছু বুঝিয়ে দিল। বক্তা ও শ্রোতার এই যোগাযোগকে ভাষা ছাড়া অভাষার স্তরে ফেলা ঠিক হবে বলে প্রতীয়মান হয় না। তাই ইশারা ইঙ্গিত যা দ্বারা মনের ভাব প্রকাশিত হয় এবং সে ভাবকে অন্য কেউ বুঝতে পারে তাকেও ভাষা হিসেবে ধরা যেতে পারে। 'A System of human communication using words, written and spoken, and particular ways of combining them; any such system employed by a community, a nation, etc. .... A mode of communication by inarticulate sounds used by lower human communication, as gesture or facial expression, hand signing, etc.' [১৫]

ভাষার বিষয়ে প্রতিক্ষেত্রেই বলা হয়ে থাকে যে ভাষা মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে। ভাষার এই যে মনের ভাব বিষয়ক প্রকাশ ভঙ্গি তা সহজাত। ভাষার অবস্থান মানব মনে এবং ভাষার প্রকাশ স্বচ্ছ দর্পনের মত অর্থবহ। ভাষার প্রকাশ দিয়ে মানুষ নিজেকে যেমন উপস্থাপন করতে পারে, ঠিক তেমনি অন্যকে বুঝতে পারে। সৃষ্টির শুরু থেকেই ভাষার মাধ্যমে মানুষের পথ চলা। বাগযন্ত্রের দ্বারা সৃষ্ট ধ্বনি সমষ্টির অর্থবহ ক্রমই হলো ভাষার প্রাণ। বাগযন্ত্র দ্বারা সৃষ্ট ধ্বনি হলো অসংখ্য সম্ভাবনাময় অর্থবহ শব্দের প্রাথমিক স্তর। অর্থবহ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ ক্রমের অপূর্ব সমন্বয়ে গঠিত পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশক শব্দ সমষ্টিতেই গঠিত হয় বাক্য। প্রতিটি ভাষা হলো অসংখ্য বাক্যের সমষ্টি। 'মনের ভাব-প্রকাশের জন্য, বাগ্-যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনও বিশেষ জন-সমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্র-ভাবে অবস্থিত, তথ্য বাক্যে প্রযুক্ত, শব্দ-সমটিকে ভাষা বলে।' [১৬]

ভাষার ব্যবহারিকতা নানাবিধ। ভাষার সাথে ধর্মের, অর্থের ও সমাজের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। ভাষায় অর্থতাত্ত্বিক ধ্বনির প্রয়োগ ও ব্যবহারের ভিন্নতা লক্ষণীয়। এক এক

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে এক এক ধরনের ভাষা প্রচলিত। ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও বর্ণগত কারণে একই সমাজে একই ভাষার মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে। ভাষা গোষ্ঠী নির্ভর, এলাকা নির্ভর কিংবা দেশ নির্ভর হতে পারে। উপযোগীতা, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক কারণে কোন ভাষা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে। কোন ভাষার কথক সংখ্যা কমে যাওয়ার পরও ধর্মীয় কারণে সে ভাষা বেঁচে থাকতে পারে। ভাষার বেঁচে থাকা, বিলুপ্ত হওয়া, কথক সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া কিংবা হ্রাস পাওয়া যাই বলা হোক না কেন, ভাষার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, কণ্ঠনি:সৃত অর্থপূর্ণ ধ্বনির অপূর্ব সমন্বয়ের ফল হলো ভাষা। ভাষা সম্পর্কে আমরা বলতে পারি,

'• Language as a rule-governed human communicative system.

- Languages proper, that is, individually named varieties and their subvarieties (dialect, jargon, lingo, slang, patois, argot, ...).
- Language as a cultural System.
- Language as the *functions* that it performs Symbolic, ritual, instrumental, phatic, lingua, franca, (Language of Wider Communication), etc.' [১৭]

ভাষায় ভাব প্রকাশক অঙ্গভঙ্গির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ভাব প্রকাশক অঙ্গভঙ্গি কখনো শব্দ নির্ভর কখনো বা শব্দ নির্ভর নয়। যেমন বাবা কিংবা মায়ের উপর সন্তানের ক্ষোভ বা অভিমান হওয়ায় বাবা-মায়ের সামনে থেকে শব্দ করে পা ফেলতে ফেলতে চলে যাওয়া, অথবা রাগ করে কোন কিছু ছুঁড়ে ফেলে দেয়া এ সব প্রকাশ ভঙ্গি এক ধরনের ভাষা। কিন্তু এ সব ভাষা কণ্ঠনি:সৃত নয়। যা কণ্ঠনি:সৃত নয় সে সব শব্দের অর্থ প্রকাশক রীতি কোন উক্তির মধ্যে পড়ে না। তবে একটি সমৃদ্ধ ও জীবন্ত ভাষার প্রকাশ ভঙ্গির রীতি বৈচিত্র্য সসীম নয় বরং অসীম।

'যাহা দ্বারা মনের ভাব স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা যায় তাহা, যাহার সাহায্যে লোকে কথাবার্তা বলে তাহা, সংস্কৃত বাঙ্গালা প্র: বাক্যরীতি; ভাব প্রকাশক শব্দ সমষ্টির বিশিষ্ট প্রকাশ ভঙ্গি; ভাবপ্রকাশক অঙ্গভঙ্গী।'[১৮] ভাষার ক্ষেত্রে একক সংজ্ঞা বা এক কথায় ভাষা কি, তা বলা সহজ না হলেও ভাষাকে একটি ছকের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেয়েছেন ভাষা বিজ্ঞানীরা। এই চাওয়ার গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতা বিষয়ক ভিন্নমত থাকলেও একটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে তা হলো ভাষায় অবশ্যই ধ্বনি ও অর্থের সম্মিলন ঘটে থাকে। 'ভাষার দু'টি দিক আছে : একটি বহিরঙ্গ (Form), অন্যটি অন্তরঙ্গ (Content); প্রথমটি হল ধ্বনি বা Sound, আর দ্বিতীয়টি হল অর্থ বা Meaning, তা হলে সংক্ষেপে বলা যায়। ভাষার ধ্বনি গুলি হল অর্থের প্রতীক। ভাষবিজ্ঞানী গ্লীসনের (Gleason) ভাষায় এ দু'টি যথাক্রমে Expression aspect ও Content aspect.' [১৯] তা হলে ভাষার বিষয়ে বলা যায়:

- ভাষা ভাব প্রকাশক উক্তি।
- ভাষা মানুষের ব্যবহার্য অপরিহার্য বিষয়।
- ভাষা একজন মানুষের সাথে অপর মানুষের বা একাধিক মানুষের সাথে অপর একাধিক মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম।

Dhaka University Institutional Repository

- মানব সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দুতে ভাষা অবস্থান করে আসছে।
- উপযোগিতার কারণে ভাষায় নতুন নতুন শব্দের অথবা বাক্যের সংযোজন কিংবা বিয়োজন ঘটে।
- ভাষা পরিবর্তনশীল। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ভাষা আপন গতিতে পরিবর্তিত হয়ে থাকে।
- ভাষা কণ্ঠ থেকে বের হওয়া মস্তিষ্কজাত অর্থপূর্ণ বিষয়।
- অর্থ প্রকাশক ইঙ্গিত, যার দ্বারা মানুষ অর্থপূর্ণ কিছু বোঝে বা বোঝায় তাকেও ভাষা বলা যায়।
- অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত বা ইশারাকে সরাসরি ভাষা না বলে চোখের ভাষা, হাতের ভাষা ইত্যাদি হিসেবে বলাই শ্রেয়।
- ভাষার মূল উপাদান কণ্ঠ নি:সৃত ধ্বনি।
- ধ্বনি, রূপ, শব্দ ও বাক্যের ক্রম অনুসারে ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
- ভাষা অবশ্যই কোন না কোন জনগোষ্ঠীর যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
- ভাষা মানব সৃষ্ট, তবে কখন কে কোন সময় ভাষা সৃষ্টি করেছে তা বলা যায় না। ভাষা সমষ্ঠিগতভাবে মানুষের চেষ্টার ফল হিসেবে ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়েছে।
- ভাষা বিশৃঙ্খল কোন বিষয় নয় । বরং শৃঙ্খল ও শ্রুতিমধুর।
- গ্রহনযোগ্যতা, ক্ষমতা, কথকসংখ্যা ও অর্থনৈতিক কারণে কোন ভাষার গুরুত্ব কখনও বেড়ে বা কমে যেতে পারে।
- প্রতিটি ভাষারই যে লিখিতরূপ বা বর্ণ আছে তা নয়, তবে ভাষা হতে হলে অবশ্যই অর্থ থাকতে হবে।
- বর্ণবিন্যাস বা লিখিতরূপ ছাড়া যে সব ভাষা আছে, সে সব ভাষার কথকের মৃত্যুর সাথে সাথে ঐ সব ভাষার বিলুপ্তির সম্ভাবণা থাকে।
- বাক-কৌশল বা প্রয়োগকৌশল প্রতিটি ভাষায় স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে।
- ভাষা বাক সংকেতের সংগঠন, যার অর্থতাত্ত্বিক ক্রম বর্তমান।
- ভাষা সমাজের মৌলিক ও প্রধান সেতুবন্ধন।

সমাজ

সাধারণত 'সমাজ' বলতে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে বোঝানো হয়ে থাকে। সমাজবিজ্ঞানী Maclver-এর মতে সামাজিক সম্পর্কের পূর্ণাঙ্গ রূপই হল সমাজ।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজবিজ্ঞানের বিকাশের প্রাথমিক যুগে 'সমাজ' অর্থে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককেই বোঝানো হতো। অর্থাৎ এক্ষেত্রে পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক বিষয়টিকেই তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ম্যাকাইভার সমাজ বলতে সামাজিক সম্পর্কের সামগ্রিক দিককে বুঝিয়েছেন যার মধ্যে আমাদের জীবন অতিবাহিত হয়। অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞানী Giddens-এর মতে 'মানুষকে নিয়েই সমাজ' মানুষ পরস্পরের সাথে যৌথভাবে মিলেমিশে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদি একত্রিত হয় বা কোন সংগঠন গড়ে তোলে তবে তাকে সমাজ বলে। সংজ্ঞাটির একটি বিশেষ দিক রয়েছে। অর্থাৎ সমাজ গঠন হয় সেই সব মানুষগুলিকে নিয়ে যাদের 'কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন'-এর লক্ষ্য রয়েছে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে একটি Common Interest বা Goal রয়েছে।

মানুষের আপন জীবনের প্রয়োজনের তাগিদেই সমাজের সৃষ্টি হয়েছে। সমাজের সৃষ্টি একদিনেই বা হঠাৎ করেই হয় নি। ধাপে ধাপে মানুষের বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথে সমাজের উৎপত্তি ও বিবর্তন ঘটেছে। সুপ্রাচীনকাল থেকেই মানুষ সমাজে বাস করে আসছে। সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে সমাজে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন গোষ্ঠী, সংঘ ও প্রতিষ্ঠান।

'সমাজ প্রত্যয়টির একক এবং সর্বজনস্বীকৃত কোনো সংজ্ঞা নেই। বিভিন্ন অর্থে এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ব্যাপক অর্থে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সমগ্রককে সমাজ বলে। আবার সমাজ বলতে বিভিন্ন বয়সের এমন একদল নারী পুরুষের সমষ্টিকেও বোঝায় যারা একত্রে পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রে এবং বিভিন্ন প্রথা প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়া পদ্ধতিতে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। সমাজ বলতে কতিপয় অনুভূতিক্ষম একই জাতীয় জীবের সমষ্টিকেও বোঝায় (A group of sentient beings) আবার সমাজ বলতে অনেক সময় সভা সমিতিকেও বোঝানো হয়। এ ছাড়া সমাজ বলতে সামাজিক জীবন ও সমাজের কার্যাবলীর সমষ্টিকেও বোঝানো হয়ে থাকে। সমাজ বলতে কখনো বা সমাজবদ্ধ জনসমষ্টিকেও আবার কখনো বা একই মন-মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মানসিক ঐক্য ও অনুভূতিকে বোঝায়।' [২০]

সমাজ বিষয়ক যে ধারনা তার বিস্তৃতি বা তার মমার্থ এক কথায় বোঝানো সহজ সাধ্য নয়। তবে পৃথিবীতে মানুষ জন্মের পরই নিজের প্রয়োজনে সমাজবদ্ধ হতে শিখেছে। এটা মানুষের অভ্যাসের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। দলবদ্ধ ভাবে চলা প্রাণী জগতের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিষয়টি মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীবের মধ্যেও দেখা যায়। আমরা যদি পিঁপিলিকার দিকে তাকাই, মৌমাছির দিকে নজর দিই, তাহলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। এমনকি হিংস্র পশু সিংহ বা বাঘ তারাও নিজেদের শৃঙ্খলায় পথ চলে । সমাজের বিষয়ে যে কথাটি বলা যায় তা হ'ল শৃঙ্খলা। মানব জীবনের যে শৃঙ্খলা সমাজ ব্যবস্থায় তা উদ্ভাসিত । মানুষের নিজস্ব প্রয়োজনে সমাজের জন্ম বা সৃষ্টি।

মানুষের নিজস্ব প্রয়োজন মেটানোর জন্যই সমাজের উৎপত্তি, এক জনের সাথে অন্যজনের সম্পর্ক স্থাপন করবার যে প্রক্রিয়া তা সমাজ সূত্রে আবদ্ধ। 'সমাজ হলো এমন এক জনগোষ্ঠী যাদের মধ্যে পারস্পরিক ভাবে আদান-প্রদান রয়েছে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তারা পারস্পরিক সম্পর্কে সংঘবদ্ধ। পারস্পরিক সম্পর্ক সূত্রে বসবাস করতে গিয়ে সহযোগিতা ও দ্বন্দ্ব সংঘাত উভয়েরই অস্তিত্ব আমরা অনুভব করি। সমাজের মধ্যে তাই মিলন-বিরোধ সবই বর্তমান। এতদসত্ত্বেও সমাজস্থ ব্যক্তিরা পারস্পরিক সম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ এবং পরস্পর নির্ভরশীল।

সমাজের সৃষ্টিও হয়েছিল মানুষের পারস্পরিক অভাব ও প্রয়োজনবোধ থেকে যুগ, কাল এবং স্থান ভেদে সমাজের বৈশিষ্ট্যগত তারতম্য লক্ষ্য করা যায় কিন্তু মানুষের পারস্পরিকতা ছাড়া সমাজ অকল্পনীয় ।' [২১]

Dhaka University Institutional Repository

প্রায়শই একটি কথা শোনা যায় তাহলো মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক জীব মানুষ এই ছোট বাক্যটি দ্বারা এটুকু বোঝা যায় যে অন্যান্য জীব থেকে মানুষ পৃথক হয়েছে 'সমাজ' নামক বিধাটির আওতায় এসে। সমাজের মূল বিষয় হলো পারস্পরিক সম্পর্ক। এক জন মানুষের সাথে অন্য একজন মানুষের যে সম্পর্ক তাই সামাজের মৌলিক উপাদান। সমাজ জীবনের নানা প্রসঙ্গকে সমাজ বিজ্ঞানীরা সমাজ কাঠামো হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন "ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সব সম্পর্ককেই সমাজ কাঠামোর অঙ্গ" বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে " .... আমরা যখন সমাজ-কাঠামোর সমীক্ষা করি তখন একটি নির্দিষ্ট সময়ে কিছু সংখ্যক মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন-সূত্র হিসেবে বিদ্যমান প্রকৃত সম্পর্কের বাস্তব অবস্থানটিকে অনুধাবন করতে চাই"। (পৃ: ১৯১-১৯২)।' [২২]

ব্যক্তি মানুষের সম্পর্ক দৈবাৎ ক্রমে পাওয়া কোন বিষয় কিংবা পুঁথিগত বিদ্যা নয়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করেছে মানুষ। সম্পর্কের যে সুফল অথবা কুফল তাও মানুষের আচার আচরণে পরিক্ষিত হয়েছে উপযোগিতার মানদন্ডে। ব্যবহারিক অর্থে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমঝোতা করতে হলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যোগাযোগের প্রয়োজনীতা অনস্বীকার্য। সমাজ এমন স্তরে অবস্থান করছে যেখানে ব্যক্তি ও সমাজ একে অপরের সহায়ক। কখনো মনে হতে পারে ব্যক্তি ও সামজের মধ্যে বৈপরীত্য আছে। কখনো মনে হতে পারে ব্যক্তি সমাজের অর্ন্তগত। কিন্তু একথা ঠিক যে সবকিছুর মূলেই অবস্থান করছে ব্যক্তি। ব্যক্তি ছাড়া সমাজের অস্তিত্ব অকল্পনীয় ব্যক্তি সমাজের অন্তর্ভুক্ত একই সঙ্গে সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক বৈপরীত্যেরও। সে সমাজ সংগঠনের অঙ্গ, তেমনি নিজে স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ সত্তা; যেমন সমাজের জন্য, তেমনি নিজের জন্যও। .... বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ব্যক্তির অস্তিত্ব অংশত সামাজিক, অংশত ব্যক্তিগত। তবে ব্যক্তি ঐক্যের একটি নূন্যতম, মৌল ও চূড়ান্ত বর্গেরও অন্তর্ভুক্ত। এই ঐক্য আসলে ব্যক্তির মধ্যে একই সঙ্গে যে দুই বিপরীত প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তার সমন্বয় ছাড়া কিছু নয়। ব্যক্তির প্রকৃতির একটি দিক গড়ে ওঠে সে সমাজের অর্ন্তভুক্ত, সমাজ-সৃষ্ট এবং সমাজের দায়িত্ব-ও কর্তব্য-সম্পন্ন সদস্য হওয়ার ফলে। অপরটি গড়ে ওঠে স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে তার ক্রিয়ার ফলে, যেখানে সে জীবনকে দেখে নিজের ব্যক্তি-কেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে, কেবল নিজের জন্য।' [২৩]

সমাজ মানুষের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মানব শিশু জন্মের পর হতেই তাকে সামাজিক শৃঙ্খলায় বড় হতে হয়। সামাজিক কাঠামো, সামাজিক রীতি-নীতি ও অন্যান্য সামাজিক বিষয়াদি শিশু আয়ত্ব করতে শেখে তার অভিভাবক, নিকট আত্মীয় কিংবা যাদের কাছে যে পরিবেশে সে বড় হয়, তাদের কাছ থেকে। মূলত: মানুষের সমগ্র জীবনই একটি সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়। সে যখন শিশু তখন সে আত্মস্থ করছে তার চারপাশের প্রকৃতিকে, তার চারপাশের মানুষকে ও তাদের সম্পর্ককে। কার সাথে কার কি সম্পর্ক, কোন পরিস্থিতিতে কি আচরণ করতে হবে, মানুষের পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া প্রভৃতি। আবার সে যখন পরিবারের গন্ডি ছেড়ে বের হয়ে আসছে, সেখানে আবার সে তাকে আবিষ্কার করছে নতুন এক ব্যক্তি হিসেবে। স্কুলে তার সহপাঠীদের সাথে তার আচরণ, তার অবস্থান নিজের কাছে বা অন্যের কাছে কিংবা শিক্ষকদের সাথে তার ভূমিকা, বিষয়গুলি সে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে আত্মস্থ করে। তাহলে প্রশ্ন উঠছে আমাদের সকল সামাজিকীকরণের পেছনে সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (Social Institution) এর ভূমিকাই কি বেশী? মূলত: সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তৈরি হয় বহুদিনের সামাজিক রীতি-নীতিরই পরিপ্রেক্ষিতে। আর তা গড়ে উঠে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে। তাই ব্যক্তি পর্যায়ে যেমন সমাজে মানুষের ভূমিকা রয়েছে তেমনি সমাজও মানুষকে সমাজের বসবাসের উপযোগি করে গড়ে তুলছে বিভিন্ন ধরনের সামাজিকীরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশ ও সামাজিক কাঠামোতে এক ধরনের আচরণ বা শিষ্টাচার পরিলক্ষিত হয় যা ধীরে ধীরে স্থায়ী ও মান্য আচরণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। ভৌগোলিক অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় সীমানা, গোষ্ঠী, ধর্ম ও বর্ণগত বিষয়াদির জন্য সামাজিক রীতি-নীতিতে পার্থক্য দেখা দিতে পারে। মানুষ যেহেতু নিজস্ব প্রয়োজনে সমাজ সৃষ্টি করেছে, তাই সমাজের বিধি-নিষেধ ও আচার-আচরণের পরিপন্থী কাজ থেকে তারা বিরত থাকতে চায়। তার অর্থ এই নয় যে সমাজে সব সময় রীতি-নীতি অনুযায়ী কাজ হয়। সমাজ বহির্ভূত বা সভ্যতা বিবর্জিত কাজও সমাজে ঘটে থাকে। মানুষ পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে যা করে তার নিজের জন্য তার পরিবারের জন্য, দেশের জন্য, সবই সমাজের অন্তর্ভুক্ত। 'প্রত্যেক সমাজেরই নিজস্ব স্বতন্ত্র সমাজ-কাঠামো থাকে, একাধিক সমাজে একই ধরনের কাঠামো থাকাও বিচিত্র নয়।' [২৪]

প্রথাবদ্ধ আচার-আচরণ যা স্থায়ী ভাবে সমাজে অবস্থান করে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে, সেগুলো সামাজিক কাঠামোর প্রাণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। সামাজিক কাঠামোর কেন্দ্রস্থলে যেগুলো অবস্থান করে, সেগুলোকে সংজ্ঞায়িত না করলেও সে সম্পর্কে একটি ধারনা অতি সহজেই আমরা পেতে পারি। সামাজিক কাঠামোতে কিছু বিষয় থাকে, যা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। সমাজের অপরিহার্য কিছু বিষয়ের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো '(১) একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা; (২) একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা দ্রব্যাদির উৎপাদন ও বন্টনে রত; (৩) নতুন প্রজন্মের সামাজিকীকরণের মাধ্যম গুলি (পরীক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থা সমেত); (৪) কর্তৃত্ব-ব্যবস্থা ও ক্ষমতা বন্টন-ব্যবস্থা এবং সম্ভত (৫) একটি আচার অনুষ্ঠানের প্রচলিত ব্যবস্থা, যা সমাজ জীবনকে অব্যাহত রাখতে, অথবা সংহতি বজায় রাখতে এবং জন্ম, যৌবন-প্রাপ্তি, প্রণয়, বিবাহ বা মৃত্যুর মতো উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগত ঘটনাকে সামাজিক স্বীকৃতি দিতে সহায়ক।' [২৫]

সমাজে বাস করতে হলে অবশ্যম্ভাবী ভাবে তাকে কিছু মূল্যবোধ আদর্শ ও নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। মূল্যবোধগুলি সে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে আয়ত্ব করে; আদর্শ ও নিয়ম-কানুনগুলি সে মেনে চলে। সমাজে জন্মগ্রহণ করে মানুষ সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাপনের জন্য সচেষ্ট থাকে। এ জন্য এমন কতকগুলি রীতি-নীতি ও আদর্শ মেনে চলতে হয়, যার ফলে সৃষ্টি হয় সহযোগিতামূলক সামাজিক সম্পর্ক আর এর প্রেক্ষিতে গড়ে উঠে সমাজ। সমাজগঠনের প্রক্রিয়া হলো :

নির্ভরশীলতা ——→ মিথষ্ক্রিয়া ——→ সামাজিক সম্পর্ক ——→ সমাজ।

সামাজিক স্তর বিন্যাস

সামাজিক স্তরবিন্যাস মূলত: ভূতত্ত্বের একটি প্রত্যয় 'Strata' যা মাটি বা শিলার বিভিন্ন স্তর বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সে ধারনা থেকেই সমাজবিজ্ঞানে সামাজিক স্তরবিন্যাস বিষয়টি গৃহীত হয়েছে। এ প্রত্যয়টির মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী বা মর্যাদার মানুষকে বোঝানো হয়ে থাকে। স্তর বিন্যাস প্রক্রিয়াটি মূলত: সামাজিক। মানুষের ব্যক্তিগত অসমতার পাশাপাশি সামাজিক অসাম্যতা রয়েছে। মানুষের জৈবিক উপাদান সামাজিক স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জৈবিক উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে বয়স, লিঙ্গ, উচ্চতা, শক্তি, বংশ ইত্যাদি। সামাজিক স্তর বিন্যাস প্রায় সব সমাজেই কমবেশি দেখা যায়। বিষয়টি সার্বজনীন ও সর্বকালীন। সামাজিক স্তর বিন্যাস মূলত: সমাজের প্রকৃতিগত অসাম্যের ফল। ব্যক্তিগত অসাম্য গোষ্ঠীগত অসাম্যে পরিণত হয়। যদিও কিছু কিছু বিষয়ে

Dhaka University Institutional Repository

অসমতা প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়, তবুও অসমতার প্রকৃতি ও মাত্রার মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। সামাজিক স্তর বিন্যাস বিষয়টি কিছুটা জন্মগত, পুরুষানুক্রমিক, কিছুটা সমাজ আরোপিত, কিছুটা অর্জিত। সামাজিক স্তর বিন্যাস অসাম্যের এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধার অসম-ব্যবহারের ফল। স্তর বিন্যাস সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সমাজ কাঠামোর মূল কথা।

'সামাজিক স্তর বিন্যাস একটি সমাজতাত্ত্বিক প্রত্যয়। এটি হচ্ছে এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে মর্যাদা, শ্রেণী ও অন্যান্য কতক বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত করা হয়।' [২৬]

সমাজের প্রতিটি মানুষ যে একই কাজ করে, একই রকম পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে, একই রকম গৃহে বসবাস করে তা কিন্তু নয়। মানুষ ক্ষমতার বলে, অর্থের বলে, নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে। সুদৃঢ় অবস্থান করতে গিয়ে মানুষের মধ্যে নানা রকম ভেদাভেদের সৃষ্টি হয়েছে। 'বিভিন্ন শ্রেণীতে এবং স্তরে সমাজের ভাগ-বিভাগ এবং তার ভিত্তিতে মর্যাদা ও ক্ষমতার ক্রমোচ্চ বিন্যাস সব সমাজ-কাঠামোতেই দেখা যায়। সমাজ ইতিহাসের শুরু থেকেই এই ঘটনা দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ..... সমাজ তাত্ত্বিকেরা চারটি প্রধান সামাজিক স্তরবিন্যাস ব্যবস্থা- যথা, দাস-ব্যবস্থা, জমিদারি-ব্যবস্থা, জাত-পাত এবং সামাজিক শ্রেণীভেদ- এবং এর প্রত্যেকটির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মর্যাদা ও প্রবর গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য করে থাকেন।' [২৭]

সমাজতাত্ত্বিকদের নজরে সামাজিক স্তর বিন্যাসের শ্রেণী সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো এসেছে তা বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এসেছে। মানুষের অবস্থা, কর্ম, মর্যাদা ও অন্যান্য বিষয় সমাজকে শ্রেণীতন্ত্রে পরিণত করেছে। শ্রেণী ছাড়া কোন সমাজ আছে, এমন কথা সহজে কেউ বলতে পারেন না। দাস ব্যবস্থা, জমিদারি ব্যবস্থা, জাত-পাত এবং সামাজিক শ্রেণীভেদ এই চারটি স্তরে সমাজ শ্রেণী বিভক্ত হয়ে অবস্থান করছে। 'দাসপ্রথা কৃষি ও সামন্ত সমাজের বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্য সমাজে এর পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। এ প্রথা সমাজকে প্রধানত দাস মালিক এবং দাসশ্রেণীতে বিভক্ত করেছিল ... । মধ্যযুগে ইউরোপীয় সমাজ তিনটি এস্টেটে বিভক্ত ছিল। এ গুলোকে বলা হত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এস্টেট। ভূম্যাধিকারী শ্রেণীকে প্রথম, যাজক শ্রেণীকে দ্বিতীয় এবং সাধারণ মানুষকে তৃতীয় এস্টেট বলে গণ্য করা হত। ... প্রথম দুটি এস্টেট সমাজের সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করত, আর তৃতীয় এস্টেট ছিল শোষিত সুযোগ সুবিধা থেকে ছিল বঞ্চিত... ।

জাতিবর্ণ প্রথা ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য । এ ধরণের স্তরবিন্যাস প্রধানত ভারত উপমহাদেশেই দেখা গেছে। হিন্দু সমাজ মর্যাদার ভিত্তিতে চার বর্ণে বিভক্ত। যথা– ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র। এই চার বর্ণের বহির্ভূত জনগনকে অস্পৃশ্য (Untouchables) বলা হয়। প্রতিটি বর্ণ অনেকগুলি জাতি(Castes) ও উপজাতিতে (Sub castes) বিভক্ত। হিন্দু জাতি বর্ণের বিভক্তি করণের মূলে রয়েছে ধর্মীয় (শাস্ত্রীয়) পবিত্রতা ও অপবিত্রতার ধারণা (Concept of ritual pollution and purity)। উচ্চ বর্ণের সদস্যরা বেশী পবিত্র এবং নিচু বর্ণের সদস্য কম পবিত্র। অস্পৃশ্য গোষ্ঠীর সদস্যরা অপবিত্র।' [২৮]

কিছু বিষয় আছে যা প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতির উপর যে বিষয়গুলো নির্ভর করে সে বিষয়গুলোকে মানুষের মেনে নেয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। কিন্তু প্রকৃতি যা নির্ধারণ করে থাকে, যা মানুষের কর্মের উপর নির্ভর করে না, এমন বিষয়ে যে সামাজিক স্তরীকরণ দেখা যায় তা 'মানবতা' নামক শব্দটিকে কিছুটা পাশ কাটিয়ে যে চলে না তা নয়। যেমন মানুষের জন্ম তার কর্মের উপর নির্ভর করে না। যে শিশুটি পৃথিবীতে আসলো, সে পূর্ব হতে কোন মহৎ কর্ম করে তার ভাগ্য

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তন করে এসেছে তা বলা যায় না। এই বলা না বলার মূলে অবস্থান করছে জন্মগত পরিচয়। জন্মগত পরিচয় কোন কোন সমাজে বড় রকমের স্তরবিন্যাসের সৃষ্টি করে থাকে। জন্মগতভাবে প্রাপ্য উচ্চ মর্যাদা অথবা উচ্চ বর্ণের যে সামাজিক স্তর বিন্যাস দেখা যায় তা সামাজিক মর্যাদার অসম বন্টন হিসেবে পরিগণিত হয়।

সামাজিক স্তর বিন্যাসের আরেকটি মূল কারণ রয়েছে তা হলো অর্থনৈতিক কারণ। অর্থনৈতিক ভাবে যারা স্বচ্ছল সমাজে তাদের মান্য করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। আবার গরীব শ্রেণীর লোকদের অন্য দৃষ্টিতে দেখা হয়। কখনও বা গরীব শ্রেণীর লোকদের হেয় দৃষ্টিতে দেখা হয়। বংশগত বা বর্ণগত যে মর্যাদা তা হিন্দু সামাজে বড় রকমে দেখা গেলেও বর্তমানের শিল্প সমৃদ্ধ ও শিক্ষার অভূতপূর্ব অগ্রযাত্রার যুগে বর্ণ থেকে অর্থনৈতিক কাঠামো সামাজিক স্তরীকরণের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে জন্মগতভাবে অবশ্যই কারো কারো মর্যাদা সমাজে উচ্চ, মধ্যম অথবা নিম্নস্তরে অবস্থান করে। ধরা যাক একটি শিশু বস্তিতে বা দিন মজুরের ঘরে জন্ম নিল। একই সময়ে অন্য একটি শিশু উচ্চশিক্ষিত ধনী পরিবারে জন্ম নিল। এই দুটি শিশুর মধ্যে পার্থক্য কিন্তু জন্মগত কারণেই পূর্ব নির্ধারিত হয়ে আছে বলা যায়, ব্যক্তিক চেষ্টা ও কর্মের দ্বারা বস্তির শিশু যে বড় হয়ে সমাজে উচ্চ আসন পায় না, তা নয়। তবে সংখ্যার দিক থেকে তার পরিমাণ নিতান্তই নগণ্য। 'সামাজিক শ্রেণী এবং মর্যাদা গোষ্ঠী সামাজিক স্তর বিন্যাসের আধুনিক প্রকরণ। বিশেষ করে আধুনিক শিল্প সমাজকে শ্রেণী বা মর্যাদা গোষ্ঠীতে বিভক্ত করণের মাধ্যমে সে সমাজের স্তরবিন্যাস বোঝবার চেষ্টা করা হয়। অর্থনৈতিক উপাদানের ভিত্তিতে সমাজকে শ্রেণীতে ভাগ করা যায় আর মর্যাদার অসম বন্টনের ভিত্তিতে সমাজকে মর্যাদা গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়।' [২৯] 'বাংলাদেশের মতো ঐতিহ্যবাহী ও উন্নয়নশীল দেশে সামাজিক শ্রেণী ও মর্যাদা অনুসারী গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।' [৩০]

এক একটা দেশে এক এক রকম সামাজিক ব্যবস্থা ও স্তরবিন্যাস পরিলক্ষিত হয়। সমাজের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় কোন দেশের সভ্যতা ও কৃষ্টি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একটি প্রাচীন সামাজিক অবস্থা রয়েছে। উল্লেখ্য যে 'প্রাচীন' শব্দটি এখানে এজন্য ব্যবহৃত হচ্ছে যে কালের প্রবহমানতার নিরিখে কোন না কোন সময়কে এই প্রাচীনের আওতায় ফেলা হয়। প্রাচীন বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ শুরুর বা মূলের বিষয়ের কথা বলা হচ্ছে। ভাষা বা সামাজিকতার ক্ষেত্রে ঠিক করে বলা যায় না যে কোন মূহুর্ত থেকে এর উৎপত্তি। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সামাজিক অবস্থা ও স্তরীকরণের যে নমুনা পাওয়া যায় তা হলো, 'বাঙালির আদিম সমাজ বিভিন্ন 'টোটেম' নির্ভর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুলে (ক্লানে) বিভক্ত ছিলো। 'টোটেম' হচ্ছে কোনো কুলের অভিন্ন জীবজন্তু ও বৃক্ষলতা। যাকে কুলভুক্ত সকলই টোটেম পিতা কিংবা টোটেম মাতা হিসাবে শ্রদ্ধা করতো। ট্রাইবের ভাঙ্গন থেকে বংশ ও কুলের জন্ম হয়। কুলস্থ পিতৃ পর্যায়ের সকলই পিতা ও মাতৃপর্যায়ের সকলই মাতা হিসেবে সম্মান পেতো। এটি নৃবিজ্ঞানী মতানুসারে শ্রেণীমূলক জাতিসম্পর্ক বৈ অন্য কিছু নয়। বাংলাদেশের আদিম পর্যায়ে শিকারের প্রয়োজনে কুলবৃদ্ধ তার অভিজ্ঞতার কারণে সংশ্লিষ্ট টোটেমের নেতা নির্বাচিত হতো এবং এসব অভিজ্ঞ কুলপতিদের নিয়েই সেখানে পঞ্চায়েত গঠিত হয়। আর এভাবেই বাংলাদেশের আদিম সমাজের অভ্যন্তরে এক ধরণের স্তরবিন্যাসের সৃষ্টি হয়।' [৩১]

শিল্প বিপ্লবের পূর্বে মানুষ খাদ্যান্বেষনে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাড়ি জমাতো। মূলত: উর্বর ভূমির দিকেই তাদের লক্ষ্য ছিল। উর্বর ভূমি চাষাবাদের সহায়ক। নদিমাতৃক বাংলাদেশের পলিযুক্ত মাটি চাষাবাদের উপযোগী থাকায়, এখানে নানা রকম লোকের আবির্ভাব ঘটে। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান। বাঙালীর প্রধান ও প্রিয় খাবার হলো ভাত ও মাছ। নদী প্রধান

Dhaka University Institutional Repository

দেশে অতি সহজেই মানুষ মাছ ধরতে পারতো এবং যেহেতু বাংলাদেশের ভূমি পললযুক্ত উর্বর, তাই চাষাবাদ করতে তেমন কোন অসুবিধা হতো না। 'বর্তমান বাংলাদেশের কৃষিকার্যের প্রধান উপকরণ যে 'লাঙ্গল' সে 'লাঙ্গল' শব্দটি অস্ট্রিকদের ভাষা থেকে গৃহীত হয়েছে। 'লাঙ্গল' শব্দটি চাষ করা ও 'চাষ যন্ত্র'-এই উভয় অর্থেই ব্যবহৃত। ... বাঙালীর আদিপুরুষ অস্ট্রিকরা কৃষিপ্রধান ও গ্রামীন সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। ... আদিম যুগের শেষ পর্যায়ে যখন কৃষিভিত্তিক গ্রামীন সমাজ গড়ে ওঠে তখনই প্রকৃত অর্থে সামাজিক অসাম্য তথা সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিকাশ ঘটে।' [৩১]

বাংলার গ্রামীন সমাজে এখনও ধানের প্রাপ্তির উপর সামাজিক স্তর বিন্যাস দেখা যায়। ধানের প্রসঙ্গ আসছে এজন্য যে ধান বাঙালির প্রধান খাদ্য। তাছাড়া ধান জন্মে ভূমিতে, যার বেশী ভূমি আছে, তারই বেশী ধান প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে। ধান চাষ অস্ট্রিকদের কাছ থেকেই এসেছে। 'অস্ট্রিক-ভাষী লোকেরা প্রথমে বাংলাদেশের পলিমাটি সমৃদ্ধ সমতল ভূমিতে এবং পরে পর্যায়ক্রমে পাহাড় কেটে চাষের ব্যবস্থা করে বনজ ধানকে লোকালয়ের বস্তুতে রূপান্তরিত করে। ধান ছাড়া অস্ট্রিক-ভাষী লোকেরা কলা, বেগুন, লাউ, লেবু, পান, নারকেল, জাম্বুরা, কামরাঙ্গা,হলুদ,সুপারী, ডালিম ইত্যাদিরও চাষ করতো। এসব ফসল আজও বাংলাদেশের প্রধান কৃষি দ্রব্য ও বাঙালির প্রিয় খাদ্য। অস্ট্রিক-ভাষী লোকজন কৃষি উৎপাদনের কলাকৌশল আবিষ্কার করতে পারলেও গো-পালন জানতো না। এটি তারা পিতৃতান্ত্রিক পশুচারক আর্যদের নিকট থেকে আয়ত্ব করে।' [৩২]

সামাজিক স্তর বিন্যাসের ধরণ এবং প্রাচীন অবস্থায় বাংলাদেশের সামাজিক স্তর বিন্যাস কোন পদ্ধতিতে শুরু হয়েছিল তার যে ধারনা পাওয়া গেল তা ভাষার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সমাজে অবস্থান করে মানুষ। মানুষ সমাজ গঠন করেছে ভাষার মাধ্যমে। পারস্পরিক সম্পর্ক সূচিত হয়েছে ভাষার দ্বারা। প্রাচীন অবস্থার পর বাংলাদেশের নানান স্তরে সমাজের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হলো হাজার হাজার বছর ধরে বাংলাদেশ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। বাংলায় যারা শাসক হিসেবে অবস্থান করেছে তাদের মধ্যে রয়েছে, গুপ্ত, পাল ও সেন বংশের রাজত্বকাল। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত এদের অধীনে বাংলাদেশ ছিল। পরবর্তীকালে বৃটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ মুসলমানদের শাসনাধীনে ছিল। উল্লেখ্য যে বলা হয়ে থাকে পলাশীর যুদ্ধের পর 'বাংলার সুর্য অস্তমিত হয়' অর্থাৎ বাংলার স্বাধীনতা খর্ব হয়। কিন্তু একটু ভাবলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে যে আসলে ১৯৭১ সালের পূর্বে বাংলাদেশের মানুষ কখনও প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতার স্বাদ পায় নি। এ জন্য যে তৎকালীন কেন্দ্রীয় শাসক যাঁরা ছিলেন তাঁরা কেউই বাঙালি ছিলেন না। বাংলাদেশ পূর্ব হতে স্বাধীন না থাকলেও বাঙালিরা তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি যত্নবান ও সংরক্ষণশীল ছিল বলেই হয়তো বাংলা সাহিত্য ভান্ডার ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সামাজিক স্তর বিন্যাসের বিষয়ে বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক স্তরেয় অবস্থার দিকে একটু নজর দেয়ার আবশ্যকতা রয়েছে, 'বর্তমানে বাংলাদেশের সমাজে নিম্নলিখিত শ্রেণীগুলি চিহ্নিত করা যায় : (ক) শিল্প-শ্রমিক শ্রেণী, যাদের সংখ্যা পঞ্চাশের দশক থেকে বাড়লেও তারা দেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় এখনও নগণ্য (খ) বিরাট সংখ্যক গ্রামীণ সর্বহারা এরা আসলে ক্ষেত মজুর শ্রেণী, (গ) কৃষক-এরা ধনী, মাঝারী, গরীব ও ভূমিহীন শ্রেণীতে বিভক্ত, (ঘ) শহরের বস্তিবাসী গরীব জনগোষ্ঠী এদেরকে শহরের আধু সর্বহারা শ্রেণী বলা যেতে পারে, (ঙ) মধ্যবিত্ত বা মধ্য স্তরের জনসমষ্টি-এঁরা সমাজের এক বড়ো অংশ, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে। এদের ভেতর ছোটো ছোটো উৎপাদক, ব্যবসায়ী, পেটী বুর্জোয়া, অফিসের চাকুরীজীবী ও বিভিন্ন পেশাজীবী গোষ্ঠীর লোকজন রয়েছে। সাম্প্রতিককালে জীবন যাত্রার ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এদের এক বিরাট অংশ নিম্নশ্রেণীতে পর্যবসিত হচ্ছে। এদের ভেতর খুব অল্পসংখ্যক লোকই এখন

Dhaka University Institutional Repository

সদুপায়ে অর্জিত অর্থের উপর নির্ভর করে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারছে। (চ) বুর্জোয়া-এরা এখন আকারে ক্ষুদ্র, দুর্বল ও পরনির্ভরশীল। জোতদার-এরা বাংলাদেশের সামন্ত শ্রেণীর অবশিষ্টাংশ। এদের অধিকাংশ এখন মহাজনী কারবার, ব্যবসা, শিল্প ও পুঁজিবাদী কৃষিতে নিয়োজিত। ..... বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৭ জন নিম্নস্তরে, শতকরা ৮ জন মধ্যস্তরে এবং শতকরা ৫ জন উচ্চ স্তরে অবস্থান করছে।' [৩৪]

সামাজিক স্তরবিন্যাসের যে চিত্র দেখা যাচ্ছে তাতে অর্থনৈতিক বিষয়টি মূখ্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। পূর্বে দাসপ্রথার যে রূপ ছিল তা মানবতা বর্জিত ও ভয়াবহ। কালের পরিবর্তনে তার অবসান ঘটেছে। তবে দাসপ্রথার অবসান যে সম্পূর্ণরূপে ঘটেছে তা বলা যায় না। হয়তো এর ধরণ কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। শহরে বাসার কাজের বুয়া অথবা গ্রামের ছিন্নমূল মানুষ যারা দিন মজুর তাদের দিকে একটু নজর দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। বর্ণ তথা বংশীয় পরিচয় পূর্বে বড় ধরনের ঐতিহ্য বহন করলেও বর্তমানে ঠিক তেমন দেখা যায় না। জমিদার ব্যবস্থা নেই। তবে গ্রামাঞ্চলে এখনও গ্রাম্য মোড়ল বা মাতবর আছে যারা অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল ও লোকবলে বলিয়ান। এরা গ্রামের গরীব শ্রেণীর লোকদের উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে আছে। তাছাড়া একশ্রেণীর লোক আছে যারা গ্রাম্য সাধারণ মানুষের মধ্যে টাকা লগ্নি করে। চড়াসুদের এ টাকা গ্রামের গরীব মানুষ বাধ্য হয়ে সরল মনে গ্রহণ করলেও পরবর্তীতে দিতে না পারার জন্য নিজের ভিটে-মাটি পর্যন্ত হারায়। অর্থাৎ অর্থনৈতিক বিষয়টি সামাজিক স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইদানিং উচ্চ শিক্ষা ও চাকরিজীবী গ্রামের উচ্চ মর্যাদা প্রাপ্তদের তালিকায় চলে এসেছে। এখানেও অর্থের বিষয়টি জড়িত। ভাষার সামাজিক স্তরে বিন্যাসের জন্য মানুষের সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

সামাজিক স্তর বিন্যাস মূলত: সমাজের ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর অবস্থান বা বিন্যাস ব্যবস্থা। সমাজ কাঠামোর অভ্যন্তরে বিদ্যমান বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সামাজিক শ্রেণীর ক্রমোচ্চ অবস্থানকে সামাজিক স্তর বিন্যাস হিসেবে পরিগণিত করা যেতে পারে। বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং শ্রেণীসমূহের কোনটা হয়তো অন্য কোনটির তুলনায় সমাজে আপেক্ষিক অর্থে উঁচু, নীচু বা উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট মর্যাদার অধিকারী বলে বিবেচিত। তাই সামাজিক স্তর বিন্যাস বলতে সমাজে অবস্থানকারী ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর অসম অবস্থান বা অসম মর্যাদার বিন্যাসকে বোঝায়।

ভাষা ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক

ভাষা ও সামজ এ দু'টি বিষয় একটি অপরটির সহায়ক। ভাষা দিয়ে মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করে। এই মনের ভাব প্রকাশিত হয়ে সমাজে মানুষের মধ্যে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সৃষ্টি করে। মানুষ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা ব্যবহার করে না। অথবা ভাষা নিয়ে সে জন্ম গ্রহণ করে না। মানব শিশু যে সমাজে জন্মগ্রহণ করে বেড়ে ওঠে সেই সমাজের ভাষা আয়ত্ব করে থাকে। শিশু একটি বিশেষ সমাজে জন্ম নিলেই যে সে সমাজের ভাষা আয়ত্ব করবে বা শিখবে তা কিন্তু নয়। শিশু যে সমাজে বড় হয় সে সমাজের ভাষা শিখে থাকে। ধরা যাক, কোন একটি শিশুর জন্ম হলো বাংলাদেশের কুমারখালীর বাঙালি মুসলিম পরিবারে। কিন্তু শিশুটির বাবা-মা কোন এক ইংরেজকে শিশুটিকে দান করলো। ইংরেজ ভদ্রলোক শিশুটিকে বাংলাদেশ থেকে নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে নিজের সন্তানরূপে বড় করলো। এই শিশু বাঙালির সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সে বাংলা ভাষা শিখতে পারবে না, সামাজিক অবস্থার কারণে। অর্থাৎ ভাষা সমাজের ব্যবহৃত সংজ্ঞাপন। 'ভাষা এক ধরণের ছক বাঁধা সামাজিক ব্যবহার। এ ছকবাঁধা

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক ব্যবহারের পূর্বজ্ঞান ব্যতিত এ ব্যবহারের যথার্থ প্রয়োগ সম্ভবপর নয়। সুতরাং শিশুর ভাষাজ্ঞান পরিবেশ-নির্ভর, জন্মগত নয়। ইংরেজ শিশুরা যে ইংরেজী শেখে সেটা পরিবেশগত, জন্মগত নয়। কিন্তু যে কোনো সমাজের যে কোনো মানুষ যে একটি ভাষা শেখে সে শেখার ক্ষমতা তার সহজাত।' [০৫]

ভাষার সাথে সমাজের যে সম্পর্ক তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ জন্য যে, ভাষার মাধ্যমে সমাজের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বক্তা যা বলতে চায় তা ভাষার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। PETER TRUDGILL তাঁর Sociolinginistics : An Introductions to Language and Society গ্রন্থে ভাষা ও সমাজের বিষয়ে বলেছেন, 'These two aspects of language behaviour very important from a social point of view : first, the fuction of language in establishing social relationship; and, second, the role played by language in conveying information about the speaker. We shall concentrate for the moment on the second 'Clue-bearing' role, but it is clear that both these aspects of linguistic behaviour are reflections of the fact that there is a close inter-relationship between language and society.' [০৬]

সমাজ যে ভাবে, যে ধারায় পরিবর্তিত হয়, ভাষাও তার সাথে কিছুটা হলেও তাল মিলিয়ে চলে থাকে। একই বস্তুর নাম অথবা একই পোষাকের নাম ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন হতে পার। শহরের যে সামাজিকতা তার সাথে গ্রামের সমাজ ব্যবস্থার পার্থক্য রয়েছে। শিক্ষা, পেশা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক অবস্থাসহ নানাবিধ কারণে সমাজের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। যেমন, 'ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ব্যাকরণগত পরিবর্তনের জন্যে ভাষায় সামাজিক পার্থক্য সূচিত হয় এবং রূপমূল ও উচ্চারণের পার্থাক্যগত দিকটি আঞ্চলিকতা নির্দেশ করে। যেমন, নগর বা শহরে 'সুট' রূপমূলটি প্রচলিত হলেও গ্রামে তা 'প্যান্ট' ও 'কোট' রূপে পরিচিত। 'প্যান্ট' ও 'ট্রাউজার' ব্যবহারে সামাজিক বৈষম্যও নির্দেশিত হতে পারে। ভাষা ব্যবহারে অধিকতর সচেতন ভাষাভাষী 'প্যান্টের পরিবর্তে 'ট্রাউজার' ব্যবহার করবেন।' [০৭]

বাংলার গ্রামীন সমাজ ব্যবস্থায় বিবাহের সাথে একটি পরিবহনের নাম চলে আসতো। বিবাহ ছাড়াও গ্রাম্য সমাজে পরিবহনের মাধ্যম হিসেবে যানবাহনটির প্রচলন ছিল। 'যানবাহনটির প্রচলন ছিল' খন্ড বাক্যটি ব্যবহৃত হচ্ছে এ জন্য যে বর্তমানে যানবাহনটির প্রচলন নেই বললেই চলে। আর গ্রামীন সমাজে পানি পথ ছাড়া নতুন বউ ও জামাইয়ের জন্য যে বাহনের কথা বলা হচ্ছে, তা শুধু যে তাদেরকেই বহন করা হতো তা নয়। জমিদার অথবা সম্মানীত কোন ব্যক্তি কিংবা অন্য কোন লোকও যানবাহনের উপযোগীতা নিতে পারত। যানবাহনটির নাম হলো 'পাল্‌কী'।

বর্তমানে পাল্‌কীর ব্যবহার নেই বললেই চলে। সেখানে রিক্সা, ভ্যানের প্রচলন দেখা যায়। তাছাড়া ঘোড়ার-গাড়ী, গরুর-গাড়ী, মহিষের গাড়ীর প্রচলনও কমে যেতে চলেছে। যানবাহনের এই যে পরিবর্তন এটা কিন্তু সামাজিক পরিবর্তন। সামাজিক পরিবর্তনের সাথে ভাষারও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। তা হলে বলা যায় ভাষার অবস্থান সমাজে ঠিক সে রকম, যে রকম মানুষের অবস্থান বাতাসের মধ্যে। মানুষ বাতাসের সমুদ্রে ঘুরে বেড়ানো প্রাণী। বাতাস ছাড়া জীবন কল্পনা করা যায় না। কিন্তু প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত বাতাসের বিষয়ে সাধারণত: মানুষের মধ্যে তেমন কোন উৎকণ্ঠা বা ভাবনার কোন বিষয় আছে তা পরিলক্ষিত হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের চালিকা শক্তি হলো ভাষা। ভাষা ছাড়া সমাজ অবাস্তবতার রাজ্যে অবস্থান করে। মানুষ তার প্রাণের কথা বলে ভাষার মাধ্যমে। সমাজ হলো সেই প্রাণের বিকশিত পাপড়ির হাসোজ্জ্বল রূপের মিলন ক্ষেত্র। সামাজিক বন্ধন ছাড়া ভাষার জগৎ হলো প্রাণহীন হৃদপিন্ডের চঞ্চলতার মত। রবীন্দ্রনাথ ভাষা ও সমাজের মধ্যে যে মিলন ক্ষেত্র দেখেছিলেন তা তিনি ব্যক্ত করেছেন এভাবে, 'এই যে বহুকালক্রমাগত ব্যবস্থা যাকে আমরা সমাজ নাম দিয়ে থাকি, যা মনুষ্যত্বের প্রেরয়িতা, তাকেও সৃষ্টি করে চলেছে মানুষ প্রতিনিয়ত প্রাণ দিয়ে,ত্যাগ দিয়ে, চিন্তা দিয়ে, নব নব অভিজ্ঞতা দিয়ে, কালে কালে তার সংস্কার ক'রে। এই অবিশ্রাম দেওয়া-নেওয়ার দ্বারাই সে প্রাণবান হয়ে ওঠে, নইলে সে জড়যন্ত্র হয়ে থাকত এবং তার দ্বারা পালিত এবং চালিত মানুষ হত কলের পুতুলের মতো; সেই সব যান্ত্রিক নিয়মে বাঁধা মানুষের মধ্যে নতুন উদ্ভাবনা থাকত না, তাদের মধ্যে অগ্রসর গতি হত অবরুদ্ধ।

সমাজ এবং সমাজের লোকদের মধ্যে এই প্রাণগত মনোগত মিলনের ও আদান প্রদানের উপায়স্বরূপে মানুষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে সৃষ্টি সে হচ্ছে তার ভাষা। এই ভাষার নিরন্তর ক্রিয়ায় সমস্ত জাতকে এক করে তুলেছে; নইলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে মানবধর্ম থেকে বঞ্চিত হত।' [৩৮]

অভূতপূর্ব যোগাযোগ মাধ্যমের উন্নতির জন্য পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ যেন একটি সমাজের অন্তর্গত। এই যোগাযোগের মাধ্যমে একই পরিবারের সদস্য হতে পেরেছে মানুষ তার ভাষার দ্বারা। ভাষার বিস্ময়কর সূত্রের প্রায়োগিক উপকরণের সত্যায়িত রূপ যেন সমাজ। মানব ধর্মের মূল সূত্রে অবস্থান করছে ভাষা নামক বিধাটি। গোত্র, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে পৃথিবীর সকল মানুষের সাথে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে তা ভাষার জন্য সম্ভব হয়েছে। ভাষা সমাজের বিস্তৃতি ঘটিয়েছে। সমাজ ভাষার মধুরতায় উদ্ভাসিত হয়ে একজন মানুষের সাথে অপর মানুষের সংযোগ ঘটিয়েছে।

মানুষের প্রতিটি কর্ম যেমন সামাজিক শৃঙ্খলার মাধ্যমে সংঘটিত হয়, তেমনি প্রতিটি কর্মের জন্য ভাষার আবশ্যতা অনস্বীকার্য। 'মানুষ সমাজে বাস করে – ভাষার মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে সজ্ঞাপন করে থাকে। ভাষাই মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে আলাদা করে রেখেছে। [ডেভিড ক্রিস্টাল (১৯৭১:৮) মানুষকে শুধুমাত্র "প্রজ্ঞাবান মানুষ" (homo sapiens)।] বলে আখ্যাত করেই সন্তুষ্ট নন, তিনি মনে করেন মানুষের অন্য একটি অভিধা হতে পারে, "বাঙ্ময় মানুষ" (homo loquens)। ভাষা যেমন মানুষের প্রতিস্বিক (individual) অধিকার, তেমনি তা সমাজেরও সম্পত্তি।' [৩৯]

ভাষাকে সমাজের সম্পত্তি হিসেবে না দেখে বলা যেতে পারে যে, ভাষা ও সমাজ দুটি বিষয়েরই মৌলিকগুণ বিদ্যমান এবং ভাষা ও সমাজ একে অপরের সহায়ক। মানুষকে কেন্দ্র করে সমাজ অবস্থান করে থাকে। আবার মানুষ ভাষার মাধ্যমে একে অপরের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ।

আদিকাল থেকেই মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে অবস্থান করে আসছে। মানুষের সব আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় সামাজিক রীতি-নীতিতে। মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনে সমাজের সৃষ্টি করেছে। সমাজ কিন্তু মানুষকে সৃষ্টি করে নি। একজন মানুষের সাথে অন্য একজন মানুষের ভাব বিনিময় করার জন্য ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ভাষা ছাড়া পারস্পরিক ভাব বিনিময়তার বিষয়টি অকল্পনীয়। ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে সামাজিক ভাষা ও অসামাজিক ভাষার বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। সমাজে কিছু বিষয় থাকে, কিছু রীতি-নীতি থাকে। সমাজের রীতি-নীতি মেনে নিয়েই ভাষার ব্যবহার করতে হয়। সমাজের রীতি-নীতি বহির্ভূত ভাষাকে অসামাজিক ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে সমাজ ও ভাষা দুটো বিষয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের সাথে ভাষার কিংবা ভাষার সাথে সমাজের

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। সমাজ ও ভাষা দু'টি বিষয়ই স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিক সত্তা হিসেবে একে অপরের সহায়করূপে অবস্থান করে থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। মুহম্মদ এনামুল হক (প্রধা. সম্পা.), শিব প্রসন্ন লাহিরী (সম্পা.), ১৯৮৪, বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা; পৃ. ৮৫৭

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষড়বিংশখন্ড, পুনরমুদ্রণ পৌষ ১৩৮৪, বিশ্বভারতী কলিকাতা, পৃ. ৩৭৮

৩। প্রাগুক্ত; পৃ.৩৭৭

৪। রফিকুল ইসলাম, ১৯৯৮, ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা; পৃ. ৬

৫। প্রগুপ্ত; পৃ. ৬-৭

৬। রাজশেখর বসু (সংকলিত), চলন্তিকা আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান, ত্রয়োদশ সংস্করণ; ১৩৮৯, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স (প্রা: লি.) কলিকাতা; পৃ. ৫৫৭

৭। আহমদ শরীফ (সম্পা.), ১৯৯২, বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা; পৃ. ৪৯২

৮। রফিকুল ইসলাম, প্রাগুপ্ত; পৃ. ১

৯। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা; পৃ. ১

১০। রফিকুল ইসলাম, ভাষাতত্ত্ব, চতুর্থ সংস্করণ: ১৯৯২, বুকভিউ, ঢাকা; পৃ. ১-২

১১। প্রাগুক্ত; উদ্ধৃতি (জন বি ক্যারল), পৃ.২

১২। CHARLES F. HOCKETT, 1958. A COURSE IN MODERN LINGUISTICS, THE MACMILLAN COMPANY, NEW YORK; Page-1.

১৩। LEONARD BLOOM FIELD, LANGUAGE, Reprinted 1967, GEORGE ALLEN & UNWIN LTD, LONDON; Page-3.

১৪। CAMBRIDGE INTERNATIONAL DICTIONARY *of* ENGLISH, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, Reprinted 1997, New York, Page-795.

১৫। THE NEW SHORTER OXFORD ENGLISH DICTIONARY,(Ed.) LESLEY BROWN, Volume-1, Oxford University Press, Reprinted 1993, Page-1528.

১৬। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৬, রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, কলিকাতা;পৃ.২

১৭। Harold F. Schiffman, 1998, Linguistic Culture and Language Policy, ROUTLEDGE, London; Page-55.

১৮। আশুতোষ দেব, নূতন বাঙ্গালা অভিধান, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৭৬, দেব সাহিত্য কুটীর (প্রা: লি:) কলিকাতা; পৃ.৮৯২

Dhaka University Institutional Repository

১৯। রামেশ্বর শ', সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, ১৯৮৪, পুস্তক বিপণি, কলকাতা; পৃ.৯

২০। আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, ইশরাত শামীম, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, মোহাম্মদ ইমদাদুল হক, সমাজবিজ্ঞান শব্দকোষ, ১৯৮৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা; পৃ.৪০৬-৪০৭

২১। প্রাগুক্ত; পৃ.৪০৭

২২। টম বটোমোর ; সমাজবিদ্যা তত্ত্ব ও সমস্যার রূপরেখা; হিমাচল চক্রবর্তী (অনুদিত), ১৯৯২, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা; পৃ.১২৩।

২৩। প্রাগুক্ত; উদ্ধৃতি (সিমেল); পৃ.৩৭

২৪। টমবটোমোর, প্রাগুক্ত; পৃ.১২৬

২৫। প্রাগুক্ত; পৃ. ১২৬

২৬। রংগলাল সেন, ১৯৮৫, বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা; পৃ.৯

২৭। টমবটোমোর, প্রাগুক্ত; পৃ.২০৩

২৮। আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, ইশরাত শামীম, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, মোহাম্মদ ইমদাদুল হক, প্রাগুক্ত; পৃ.৪০২

২৯। প্রাগুক্ত; পৃ.৪০২

৩০। রংগলাল সেন, প্রাগুক্ত; পৃ.১৮

৩১। প্রাগুক্ত; পৃ.২৮

৩২। প্রাগুক্ত; পৃ.২৯

৩৩। প্রাগুক্ত; পৃ.৩০

৩৪। প্রাগুক্ত; পৃ. ৯২-৯৩

৩৫। মনসুর মুসা, ১৯৮৪, ভাষা পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, মুক্তধারা, ঢাকা; পৃ. ৩

৩৬। Peter Trudgill, Sociolinguistics: An Introduction to language and Society; Reprinted1988, Penguin Books, London, England; Page-14.

৩৭। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, প্রাগুক্ত; পৃ.১৫৩

৩৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত; পৃ.৩৭৪

৩৯। মৃণাল নাথ, ১৯৯৯, ভাষা ও সমাজ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা; পৃ.২৫

Dhaka University Institutional Repository

নারী ও পুরুষের ভাষা

নারী ও পুরুষের ভাষার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করে সামাজিক বিভাগ করা হয়ে থাকে। নারী ও পুরুষের ভাষার মধ্যে পার্থক্যের কারণ উভয়ের জীবনাচরণের ধারা ও সামাজিক জীবন প্রণালী সমশ্রেণীর নয়। কোন কোন জাতির সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের জন্য নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীনকালে পুরুষরা শিকারীর পেশায় নিয়োজিত থাকতেন, আর নারীরা কৃষিকাজে নিয়োজিত থাকতেন। তার ফলে উভয় শ্রেণীর কথোপকথনের ক্ষেত্রে বিষয়গত পার্থক্য লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। এমন এক সময় ছিল যখন নারীদের পক্ষে বিশেষ কতকগুলো শব্দ উচ্চারণ নিষিদ্ধ ছিল এবং পুরুষরাও নারীদের মধ্যে প্রচলিত অনেক শব্দ ব্যবহার করতেন না। যেমন, হিন্দু সমাজে আগে বিবাহিতা নারীরা শ্বশুর, স্বামী বা গুরুজনদের নাম উচ্চারণ না করে অন্য শব্দের প্রয়োগে তা বুঝিয়ে দিতেন। মেয়েরা দিব্বি কাটতে থুরি, মাইরি শব্দ ব্যবহার করলেও তা পুরুষ সমাজে অব্যবহৃত। অন্যদিকে, পুরুষ সমাজে নিন্দাসূচক বা গালিগালাজ নারী-সমাজে অপ্রচলিত। নারীরা নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় সাংকেতিক ভাষাও ব্যবহার করে থাকেন ।[১]

'প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে আজ অবধি সব সমাজেই নারী ও পুরুষের মধ্যে যথেষ্ট সামাজিক ব্যবধান আছে। অবশ্য এই ব্যবধান সর্ব্বত্র সমান নয়। পুরুষ ও নারীর কর্ম্মক্ষেত্র আর শিক্ষা-দীক্ষা সম্পূর্ণরূপে আলাদা ব'লেই এই পার্থক্যের উদ্ভব। আর এই জন্যে সকল দেশেই নারী ও পুরুষের ভাষায় কমবেশী পার্থক্য র'য়ে গিয়েছে। কোথাও কম, আর কোথাও বেশী। সভ্য জগতে, যেখানে নারী ও পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র প্রায় এক হ'য়ে এসেছে বা আস্‌ছে, সেখানে এই পার্থক্য খুবই কম দেখা যায়। কিন্তু অসভ্য সমাজে যেমন প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের মধ্যে—এই পার্থক্য খুবই সুস্পষ্ট ...'[২]

জন্মগত ভাবেই লিঙ্গগত কারণে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য শুধু লিঙ্গে নয় প্রতিটি ভাষায় নারী ও পুরুষের স্বতন্ত্র উপস্থিতি বর্তমান। শারীরিক, পারিবারিক, সামাজিক, মানসিক, ব্যবহারিক ও অন্যান্য নানা কারণে নারী ও পুরুষের ভাষায় বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। কুমারখালীর নারী-পুরুষের ভাষা কেমন তা বিশ্লেষণ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। কুমারখালীর যে সমাজ ব্যবস্থা তাতে পুরুষ শাসিত সমাজ বলে প্রতীয়মান হয়। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর অধিকার কিংবা নারীর ভাষা ব্যবহারের স্বাধীনতা যেন কোন এক অপলোক ছায়ার দ্বারা শৃঙ্খলিত হতে দেখা যায়। এই অপলোক ছায়ার আধার হিসেবে কাজ করে পুরুষেরা। সামাজিক বিধি নিষেধ, সামাজিক কুসংস্কারের বেড়াজাল অনেকাংশে নারীর পথ চলাকে শ্লথ যে করে না তা নয়। কুমারখালীর অধিকাংশ পরিবারেই দেখা যায় পুরুষের কথার উপর কিংবা পুরুষের কথার বিপরীতে নারীরা কথা বলতে পারেন না। এটা এক ধরনের শাসনের ভাষা। যেমন,

- চুপ কর
- অত কথা বল কেন?
- তুমি তো বেশী বোঝ?
- তোমার সাহস বেড়ে গেছে।
- কি বললে?

Dhaka University Institutional Repository

- যা বললাম মনে থাকে যেন।
- আর একটা কথাও বলবে না।

উপরের উদাহরণের খন্ডবাক্য অথবা বাক্যগুলো পুরুষেরা ব্যবহার করে থাকেন। মহিলাদের সাথে কথা বলার সময় না পেরে উঠলে কিংবা কিছুটা কথা কাটা-কাটির সময় পুরুষেরা এ সব বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ভুল করেন না। সাধারণত শিক্ষিত পুরুষেরা এ রকম ভাষা ব্যবহার করে থাকেন।

- চুপ করলি নে?
- বেশী কথা কোস্/কইস নে?
- অত ভগর ভগর করিস ক্যা?
- বাপের বাড়ি চলে গেলিই পারিস।
- তুই তো বেশী বুজিস।
- দ্যাক এট্টা কথাও কবি নে বলে দিলাম।
- এ্যাক দম চুপ

উপরের উদাহরণে অশিক্ষিত পুরুষেরা মেয়েদের সাথে যেভাবে কথা বলেন অর্থাৎ নিজের আধিপত্যের দিক প্রতিষ্ঠিত করেন তা দেখানো হয়েছে। পুরুষেরা নারীকে শাসনের ভঙ্গিতে এ সব বাক্য বা খন্ডবাক্য ব্যবহার করে থাকেন। বিশেষ করে নিজের স্ত্রী'র সঙ্গে কথোপকথনে এ সব ভাষা ব্যবহার করতে দেখা যায়।

নারীরা যে শাসনের ভঙ্গিতে কথা বলেন না তা কিন্তু নয়। এই শাসনের ভাষা অবশ্য পুরুষের ভাষার মত নয়। তাছাড়া নারীর গ্রহণযোগ্যতা কোন এক বিশেষ পরিবারে কেমন তার উপর নির্ভর করে তার কথা বলা না বলা। এমনকি কোন বিষয়ে কথা বলবেন কোন বিষয়ে কথা বলবেন না, কেমনভাবে কথা বলবেন তাও গ্রহণযোগ্যতা দ্বারা নির্ণিত হয়ে থাকে। নারীদের গ্রহণযোগ্যতা পরিবারে মায়া, মমতা, আদর, ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। অবশ্য অর্থনৈতিক কারণ ও শিক্ষার বিষয়টিও কোন কোন ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। শিক্ষিত নারী যে চাকরি করেন পরিবারে তাঁর বেশ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে নারীরা পুরুষের মত ধমকের সুরে কথা বলেন না। তাঁদের কথা বার্তায় এক ধরনের সহনশীলতা ও সমঝোতার ভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন,

- চুপ কর না
- অত কথা কেন
- তুমি নিজেকে বড় মনে কর
- তুমি এমন করো না
- যা খুশি বল
- আমি তো খারাপ কথা বলি
- অত কথা ভাল লাগে না

Dhaka University Institutional Repository

উপরের উদাহরণের বাক্য অথবা খন্ডবাক্যগুলি কুমারখালীর নারীরা ব্যবহার করে থাকেন। পুরুষেরা উত্তেজিত হলে অথবা পুরুষদের সাথে কোন কথা বলতে বলতে ঝগড়া বাধার উপক্রম হলে নারীরা এ সব খন্ডবাক্য অথবা বাক্য বলে পুরুষদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। এ সব বাক্য অথবা খন্ডবাক্য কর্তৃত্ব দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয় না, বরং সহনশীলতা ও সমঝোতার প্রকাশ থাকে প্রতিটি বাক্য অথবা খন্ডবাক্যে। শিক্ষিত নারীরা এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। আবার,

- বেশী কথা কয়া না।
- তোমার সাথে অ্যাহন ঝগড়া কত্তি চাচ্ছিনে।
- চুপ করে থাহো।
- তোমার মত বুদ্দি যিন কারুর নি।
- কি কলে।
- বাপের বাড়ি যাব কি সস্তা?
- ক্যা কতা কলি কি হবি নি।

উপরের উদাহরণে অশিক্ষিত মহিলারা পুরুষের সাথে বিশেষ করে স্বামীর সাথে রাগত অবস্থায় যে ভাষায় কথা বলেন তা দেখানো হয়েছে। কুমারখালীর অশিক্ষিত পুরুষ ও মহিলাদের ভাষায় শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা অসচেতনা দেখা যায় অর্থাৎ আঞ্চলিকতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন,

কুমারখালীর আঞ্চলিক শব্দ	অর্থ
কতা	কথা
কলি	বললে
হবি নি	হবে
বাপের	বাবার
যিন	যেন
ক্যা	কেন
অ্যাহন	এখন
কয়া	বলে/বলা
কত্তি	করতি/করতে

কতা, কলি, বাপের, অ্যাহন, কয়া, কত্তি, যিন, ক্যা, হবি নি, ইত্যাদি শব্দগুলো যে শুধুমাত্র অশিক্ষিতি পুরুষ ও মহিলা ব্যবহার করেন তা নয়। ভাষায় শব্দ ব্যবহারের প্রতি সর্তকতা ও অসর্তকতার বিষয়টি এর সাথে জড়িত বলে বিবেচিত। তবে অশিক্ষিত ও সামাজিকভাবে নিম্নশ্রেণীর নারী পুরুষদের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অধিকতর অসচেতনার ভাবটি লক্ষ্য করা যায়।

নারী ও পুরুষের ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হলো নারীরা পুরুষদের সাথে আদেশের সুরে কথা বলেন না। কিন্তু পুরুষেরা কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আদেশের ভাষায় কথা বলে থাকেন। ব্যতিক্রমের বিষয়টি শিক্ষা, অর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। অশিক্ষিত ও ধনী পরিবারে শিক্ষিত গরীব ঘরের মেয়ে বিয়ে হলে অথবা বউ হয়ে এলে তাঁকে প্রায় সবাই ভাল চোখে

Dhaka University Institutional Repository

দেখে থাকেন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা অর্থিক অবস্থাকে ছাড়িয়ে যায়। শিক্ষিত ও ধনী পরিবারে, শিক্ষিত গরীব ঘরের মেয়ে বউ হয়ে এলে তাঁর ঠিক ততটুকু মূল্যায়ন করা হয় না, যতটা করা হয় শিক্ষিত ও ধনী ঘরের মেয়েকে কিংবা শিক্ষিত ও চাকরিজীবী নারীকে। এখানে শিক্ষার পাশা-পাশি অর্থ কিংবা চাকরির বিষয়টি জড়িত। তাছাড়া কেউ কেউ চাকরিকে সামাজিকভাবে উচ্চতার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন।

আবার কুমারখালীতে এমনও পরিবার আছে যে পরিবারের মেয়েকে চাকরি করতে দেয়া হয় না। এক সময় মেয়েরা খুব একটা চাকরি করতো না অর্থাৎ সামাজিক কুসংস্কারের জন্য মেয়েরা পিছিয়ে ছিল। কিন্তু বর্তমানে মেয়েদের চাকরির বিষয়ে আপত্তি করেন এমন পরিবারের সংখ্যা নিতান্তই নগন্য। চাকরি বা অন্যান্য ক্ষেত্রে মতামত দেয়া না দেয়ার বিষয়টি পরিবারের সকল সদস্যের উপর নির্ভর করে না। কারণ পরিবারের সবার মতামত এক রকম হয় না। পরিবার না বলে পরিবারের প্রধান কর্তাব্যক্তি বলাই শ্রেয় এ জন্য যে কুমারখালীতে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া পরিবারের প্রধানকে বেশ মূল্যায়ন করা হয় এবং তাঁর মতামতের গুরুত্বও দেয়া হয়।

গ্রামের মহিলাদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে তাঁরা অনেক পুরনো কথা বলতে পারেন। 'নারীর ভাষা পুরুষের ভাষার চেয়ে অনেক বেশী রক্ষণশীল। অর্থাৎ পুরুষ যত শীঘ্র পুরানো কথা ত্যাগ করতে বা নোতুন কথা গ্রহণ করতে পারে, নারী তত শীঘ্র পারে না। এই জন্যে নারীর ভাষাতে আমরা এমন অনেক পুরানো শব্দ পাই, যা' অন্যত্র লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে। এই রক্ষণশীলতার কারণ অবশ্য এই যে, নারীকে তার ঘরের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে ব্যাপৃত থাকতে হয়, সুতরাং ভিন্ন ভাষা বা উপভাষা-ভাষী লোকের সংস্পর্শে তার আসবার সুযোগ হয় না। বিখ্যাত রোমান বাগ্মী সিসেরো (Cicero) একস্থানে ব'লে গিয়েছেন যে, যখন তিনি তাঁর শাশুড়ীর কথা শোনেন, তখন তাঁর মনে হয়, যে তিনি প্রাচীন ল্যাটিন কবি 'প্লাউতুস' (Plautus) বা 'নায়-ভিউস্' (Naevious) এর কথা শুন্‌ছেন।'[৩]

নারী ও পুরুষের ভাষায় ভিন্নতার জন্য টাবু বিশেষ ভূমিকা রাখে। 'Jespersen Suggests that sex differentiation, in some cases, may be the result of the phenomenon of taboo ...'[৪]

'টা'বু (Taboo) ... (কোনো কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে) ধর্ম বা লোকাচারে অনুচ্চার্য, অস্পৃশ্য ইত্যাদি বলে বিবেচিত হয় এমন কিছু; নিষিদ্ধ; টাবু: ... কোনো কিছু না করা বা আলোচনা না করার ব্যাপারে সাধারণ সম্মতি। ... নিষিদ্ধ: ..... যে সব লোকাচার অনুযায়ী পরিহার্য বা প্রতিষিদ্ধ; নিষিদ্ধ শব্দাবলী। ... বিশেষত ধর্মীয় বা নৈতিক কারণে নিষিদ্ধ/প্রতিষিদ্ধ করা।'[৫]

সামাজিক ধর্মীয় ও অন্যান্য কারণে ভাষায় এমন কিছু শব্দ অথবা খন্ডবাক্য কিংবা বাক্য থাকে যা সাধারণত সভ্য সমাজে অনুচ্চার্য। যেমন, যৌন সম্পর্কিত শব্দ বা শব্দমালা। কুমারখালীর মুসলমানরা নামাজ পড়তে যাওয়ার পূর্বে অজু করার পর কোন বাজে কথা অর্থাৎ গালি জাতীয় ভাষা ব্যবহার করেন না। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মেয়েরা তাঁদের স্বামীর নাম ধরে ডাকেন না। স্বামীর নাম ধরে ডাকলে পাপ হয়, এ জাতীয় ধারনাই মূলত এ ক্ষেত্রে কাজ করে। মুসলমান অশিক্ষিত মেয়েরাও স্বামীর নাম ধরে ডাকেন না। কিন্তু শিক্ষিত মেয়েদের স্বামীর নাম ধরে ডাকতে দেখা যায়। তবে সামাজিক কারণে ও লোক নিন্দার ভয়ে স্বামীর নাম ধরে ডাকা হতে তাঁরা বিরত থাকেন। অশিক্ষিত মহিলারা গুরুজনদের নামও উচ্চারণ করতে চান না। এ ক্ষেত্রেও পাপের ধারনা কাজ করে। 'নিরক্ষর এমনকি অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন মেয়েরা স্বামী, শ্বশুর, ভাশুর ইত্যাদির নাম মুখে আনে না। সে ক্ষেত্রে দৈনন্দিন কাজের সময় যদি স্বামী

Dhaka University Institutional Repository

বা গুরুজনের কারও নাম কোন বস্তুর নামের সাথে অভিন্ন হয়, তাহলে তারা সে বস্তুর নাম না করে প্রতীকী কোন রূপমূল ব্যবহার করে।
যথা- কোন মেয়ের স্বামীর নাম-চাঁদ,
সে ক্ষেত্রে মেয়েটি আকাশের চাঁদ বা চান ইত্যাদির নাম করে না। পরিবর্তে বলে জুস্না (জোৎস্না)।
স্বামীর নাম সূর্য হলে, মেয়েরা আকাশের সূর্যকে বলে–বেলা। স্বামী, শ্বশুর বা ভাশুর কারো নাম যদি হয়–তারা, তাহলে আকাশের তারাগুলোকে মেয়েরা বলে–জুস্না বা চান।
কোন ব্যক্তির নাম যদি হয় ফজর আলী, তাহলে তার স্ত্রী বা ছেলের স্ত্রী অথবা ভাইয়ের স্ত্রী ফজরের নামাজকে বলে–ফরজের নামাজ।
স্বামীর নাম যদি হয়–রহমত আলী, তাহলে নামাজ শেষে সালাম ফিরানোর সময় বলে– /আচ্ছালামু আলাইকুম ইয়া সালামের বাপ/অর্থাৎ রহমতের ছেলের নাম সালাম।[৬]

কুমারখালীতে নারী পুরুষের ভাষায় চাঁদ ও চাঁদের আলো সংক্রান্ত যে বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় তা হলো চাঁদকে কেউ 'চান' বলেন না। তবে 'চাদ' বলে থাকেন। 'চ' ধ্বনিটি অঘোষ স্বল্পপ্রাণ তালব্য ধ্বনি। চাঁদ শব্দটি (চ+আ+দ) এবং (ঁ) সমন্বয়ে গঠিত। কিন্তু 'চ' ধ্বনির পরের স্বরধ্বনির উপরে চন্দ্রবিন্দু (ঁ) থাকায় 'চ' ধ্বনির উচ্চারণ পূর্বের অবস্থায় না থেকে অনুনাসিক হয়ে যায়। এই অনুনাসিক উচ্চারণ কুমারখালীতে খুব একটা দেখা যায় না।

কুমারখালীর নারী-পুরুষের ভাষায় যা দেখা যায় তা হলো প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই চন্দ্রবিন্দু (ঁ) অনুচ্চারিত থেকে যায়। বাংলা চলিত রীতির সর্বনামে চন্দ্রবিন্দু (ঁ) বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কারণ 'তার' সর্বনাম বললে বা লিখলে সাধারণ অথবা নিম্ন মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে বোঝায়। কিন্তু চন্দ্রবিন্দু (ঁ) যুক্ত অর্থাৎ 'তাঁর' বললে বা লিখলে সম্মানীত বা উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়। ভাষার সহজীকরণের ও উচ্চারণের সরলীকরণের ধারায় চন্দ্রবিন্দু (ঁ)-র প্রয়োগ ও অবস্থান ধীরে ধীরে যে কিছুটা কমে যেতে পারে না তা নয়। চন্দ্রবিন্দু (ঁ) আছে এমন কয়েকটি শব্দ/খন্ডবাক্যের দিকে নজর দেয়া যেতে পারে, যার উচ্চারণে চন্দ্রবিন্দু (ঁ)-র অবস্থান অধিকাংশক্ষেত্রেই রক্ষিত থাকে না। যেমন,

চন্দ্রবিন্দু (ঁ) সহ শব্দ/খন্ডবাক্য	কুমারখালীর অধিকাংশ নারী-পুরুষের উচ্চারণ
ঝাঁটা	ঝাটা
পেঁপে	পেপে
কাঁঠাল	কাঠাল
হ্যাঁ	হ্যা
বাঁকানো	বাকানো

কুমারখালীতে 'সূর্য'কে বোঝাতে 'বেলা' শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নারী ও পুরুষ উভয়ের ভাষাতেই 'বেলা' ব্যবহৃত হয়। যেমন,

ক. কত বেলা হয়ে গেছে।
খ. কতো ব্যালা হয়া গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ. বেলা কয়টা বাজে।
ঘ. ব্যালা কয়ডা বাজে।

'ক' এবং 'গ' নম্বর উদাহরণে শিক্ষিত নারী-পুরুষের ভাষা ব্যবহারের রীতি দেখানো হয়েছে। 'খ' এবং 'ঘ' নম্বর উদাহরণে অশিক্ষিত নারী-পুরুষের ভাষার ব্যবহার দেখানো হয়েছে।

ধর্মীয় কারণে পাপের বিষয়টির ধারনা মানুষের মনে স্থান পেয়েছে। স্বামীকে শ্রদ্ধা, ভক্তি করতে হবে ধর্মীয় রীতিতে তাই বলে। সে জন্যই মূলত: স্বামীকে মান্য করার প্রবণতা অশিক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত নিম্ন সমাজে অধিকভাবে দেখা যায়। স্বামীর কথার উপর কথা বলা পাপ। তাছাড়া গুরুজনদের মান্য করা পুণ্যের কাজ। এ সব কথার উপর বিশ্বাসই মূলত: নাম ধরে ডাকা না ডাকার জন্য দায়ী বলে প্রতীয়মান হয়। কুমারখালীর নারী-পুরুষের কয়েকটি নামের দিকে নজর দেয়া যেতে পারে। যেমন,

- মুকুল ——→ পুরুষের নাম
- সোনা ——→ পুরুষের নাম
- করবী ——→ মেয়ের নাম
- লতা ——→ মেয়ের নাম

কুমারখালীর মেয়েরা স্বামীর নাম না বললেও স্বামীর নামের শব্দ উচ্চারণ করে থাকেন। এ বিষয়টি ভাষা বোধের বিষয়। ভাষার শব্দ প্রয়োগের উপর নির্ভর করে তার গ্রহণযোগ্যতা অগ্রহণযোগ্যতা। 'আমের মুকুল' আর একজন মহিলার স্বামীর নাম 'মুকুল' এক জিনিস নয়। 'সোনার গহনা'কে কুমারখালীর কোন মহিলা তার শাশুড়িকে উদ্দেশ্য করে বলেন না যে, 'আপনার ছেলের নামের গহনা'। 'করবী' এবং 'লতা' শাশুড়ির নাম হওয়া সত্ত্বেও 'করবী ফুল'কে কোন মহিলা বলেন না যে, আমার শাশুড়ির নামের 'ফুল' কিংবা আমার শাশুড়ির নামের আগাছায় পেয়ারা গাছটিকে জাপটে ধরেছে।

ভাষা ব্যবহারের প্রয়োগিক যে দিক বিদ্যমান তাতে সচেতনতা ও অসচেতনার বিষয়টি মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। ভাষার এই সচেতনতা ও অসচেতনতার প্রয়োগ না থাকলে ভাষা আর ভাষা থাকে না। যেখানে যে শব্দের ব্যবহারের প্রয়োজন সেখানে সেই শব্দ ব্যবহৃত না হলে ভাষার প্রয়োগ অর্থহীন হয়ে যায়। বিশৃঙ্খল ও এলোমেলো শব্দ সমন্বয়ে বাক্য গঠিত হয় না। কারণ সে বাক্য দ্বারা কোন অর্থ প্রকাশিত হয় না। কুমারখালীর নারী-পুরুষের মধ্যে ভাষার শব্দ প্রয়োগের দিকটি খুব একটা বিশৃঙ্খল নয়। ভাষায় উচ্চারণগত ও শব্দ ব্যবহারের কিছুটা ভিন্নতা থাকে বলেই উপভাষা সংক্রান্ত শব্দের উদ্ভব হয়েছে। প্রত্যেকটি ভাষা হলো এক ধরনের উপভাষা। চলিত ভাষা যা শিষ্ট ভাষা হিসেবে স্বীকৃত সে ভাষাও উপভাষা ছাড়া অন্য কিছু নয়। রাষ্ট্রীয় কাজ চালানোর জন্য একটি উপভাষাকে শিষ্ট ভাষার মর্যাদা দেয়া হয়ে থাকে।

কুমারখালীতে ফজরের নামাজকে অধিকাংশ অশিক্ষিত ও শব্দ উচ্চারণের ক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়ে থাকা লোকেরা 'ফরজের' নামাজ বলে থাকেন। যেমন,

- ফজরের নামাজ
- ফরজের নামাজ

Dhaka University Institutional Repository

অর্থগত দিক থেকে ফজরের নামাজ বলতে ভোর বেলার নামাজকে বোঝায়। কিন্তু 'ফরজের নামাজ' হলো প্রতিটি ওয়াক্তের নামাজের মধ্যে কয়েক রাকাত নামাজ যা অবশ্যই পালনীয়। উচ্চারণের ত্রুটির কারণে 'ফরজ' কখনও বা 'ফজর' হয়ে যায়। এটা এক ধরনের উচ্চারণগত সমস্যা বা উচ্চারণগত অসচেতনা। মূলত বর্ণ বিপর্যয়ের কারণে ভাষায় শব্দ প্রয়োগের বিষটির হের-ফের লক্ষ্য করা যায়। যেমন, রিকসা'র উচ্চারণ কখনো হয়ে থাকে :

- রিকসা ——————→ রিসকা

ফজরের বিষয়টিও একই রকম। যেমন,

- ফজর ——————→ ফরজ

কুমারখালীতে কোন নারীর স্বামীর নাম 'ফজর আলী' হলে নামাজের ক্ষেত্রে ইচ্ছে করে 'ফরজ' বলেন তা দেখা যায় না। কোন মহিলার স্বামীর নাম 'রহমত আলী' কিংবা 'রহমত মিয়া' অথবা 'রহমত হোসেন' হলে নামাজের সালাম ফেরানোর সময় কুমারখালীর মেয়েরা কখনও 'আচ্ছালামু আলাইকুম রিপার বাপ' বলেন না। এখানে 'রিপা' মহিলার মেয়ের নাম। এ ক্ষেত্রে যদি ছেলে-মেয়ের অন্য নাম হয়, সে সব নাম বসতে পারে। এ রকম ধরনের ভাষিক প্রয়োগ কুমারখালীতে দেখা যায় না। ধর্মীয় কারণ কিংবা সামাজিক কুসংস্কারের জন্য ভাষার শব্দ পরিবর্তনের যে রীতি সে রীতিতে ধর্মীয় বিষয়টির বিজয় লক্ষ্য করা যায় ধর্ম প্রাণ মুসলমান নারীদের মধ্যে। পুরুষেরা কোন কোন ক্ষেত্রে নামাজ মনে মনে না পড়ে জোরে জোরে পড়েন। পুরুষের ক্ষেত্রে জোরে জোরে নামাজ পড়া ধর্ম মতে সঠিক। বাংলাদেশের কোন মহিলা মসজিদে গিয়ে আজান দেন না। বাড়ীতেও কোন মহিলাকে আজান দিতে দেখা যায় না। মহিলারা উন্মুক্ত স্থানে কিংবা বড় কোন লোকালয়ে ওয়াজ নসিহত করেন না। এ সব পুরুষের কাজ। পুরুষের ক্ষেত্রে জোরে জোরে নামাজ পড়ার বিধান থাকলেও মহিলাদের ক্ষেত্রে আছে বলে মনে হয় না। কারণ কোন মহিলাকেই জোরে জোরে নামাজের নিয়ত, সূরা কিংবা মোনাজাত করতে শোনা যায় না।

অশিক্ষিত মহিলারা যেমন স্বামীর নাম বলেন না, ঠিক তেমনি পুরুষেরাও স্ত্রীর নাম খুব একটা বলেন না। অশিক্ষিত ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা কোন কোন মহিলা তার স্বামীর নাম বললেও নামের পূর্বে 'লজ্জা' শব্দটি জুড়ে দিয়ে বলেন। কুমারখালীর অশিক্ষিত ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটা বিষয় প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় তা হলো 'ল' ধ্বনিটি কখনও কখনও 'ন' ধ্বনিতে পরিণত হয়ে যায়। অশিক্ষিত মহিলা কোন কোন ক্ষেত্রে তার স্বামীর নাম অন্যের কাছে যে ভাবে বলেন তা হলো, 'নজ্জা/লজ্জা করে কিরামদি'।

এখানে 'কিরামদি' হলো মহিলার স্বামীর নাম। কিন্তু সরাসরি স্বামীর নাম বলা যায় না। স্বামীর নাম বলতে তার লজ্জা করছে, এ জন্য 'লজ্জা' শব্দটি বলে স্বামীর নাম বলছেন। 'লজ্জা' শব্দের প্রথম ধ্বনি 'ল' উচ্চারণগত কারণে কিংবা আঞ্চলিকতার কারণে 'ন' ধ্বনিতে পরিণত হয়ে যায়। আবার স্বামীর নাম 'কিরামদি ' কিন্তু আঞ্চলিকতার কারণে উচ্চারণ হয়ে থাকে 'কেরামদি'।

Dhaka University Institutional Repository

কুমারখালীর মুসলমান মেয়েদের মধ্যে স্বামীর নাম বলতে দেখা গেলেও শ্বশুর শাশুড়ি কিংবা স্বামীর বড় ভায়ের নাম বলতে খুব একটা দেখা যায় না। কিন্তু মেয়েরা নিজের বাবা, মা কিংবা বড় ভায়ের নাম বলে থাকেন। নারীদের ক্ষেত্রে সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা কিছু বিধি নিষেধ লক্ষ্য করা যায়, সে কারণে তাঁরা পুরুষদের মত চলতে পারেন না, কথা বলতে পারেন না। পুরুষের মত চলতে বা কথা বলতে না পারার কারণে নারী ও পুরষের ভাষার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পুরুষেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রায় সব কথা বলে থাকেন। কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে সব কথা বলতে দেখা যায় না। অনেক কথা তাঁরা এড়িয়ে যান বা গোপন করে থাকেন। 'নারী স্বভাবতই লজ্জাশীলা ও কোমল-হৃদয়া ব'লে কতকগুলি শব্দ ও বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ তা'র পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সেই কারণে তা'কে হয় অন্য শব্দ ব্যবহার করতে হয়, অথবা সেই বিষয়কে ঘুরিয়ে প্রকাশ করতে হয়।'[৭]

এখানে উল্লেখ থাকে যে কোন কোন পরিবারের মেয়েরা জন্ম থেকেই বিশেষ আবদ্ধতার মাঝে বড় হয়ে থাকে। এই আবদ্ধতার মূলে যা রয়েছে তা হলো মেয়েদের প্রতি পরিবারের সদস্যদের উদাসীনতা। বাবা-মায়ের সন্তানের প্রতি কর্তব্যবোধ ও দায়িত্ববোধের যে বিষয়টি রয়েছে তার মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বাবা-মা মুখে স্বীকার না করলেও এই পার্থক্যের কারণেই ছেলে সন্তানের প্রতি তাদের বেশ দুর্বলতা রয়েছে লক্ষ্য করা যায়। কুমারখালীতে এমন অনেক পরিবার আছে, যে পরিবারের বাবা-মা একটা ছেলে সন্তান প্রাপ্তির আশায় ছয়/সাত জন মেয়ের বাবা-মা হয়েছেন। ছেলে ও মেয়ের প্রতি বাবা-মায়ের মায়া, মমতা ও আদর স্নেহের সমতা ও অসমতার জন্য ভাষা ব্যবহারে প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

মেয়েরা বাবা-মা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে ভাষার দ্বারা ও মিষ্টি ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের দিকে আকর্ষিত করতে শেখে ছোট বেলা থেকেই। মাছকে যেমন সাঁতার শেখাতে হয় না, মেয়েদেরও তেমনি এ রকম অভিনব আচরণ শিখিয়ে দিতে হয় না। ব্যবহার ও আচরণের পূর্ব শর্ত হলো ভালভাবে কিংবা ভাল ভাষায় কথা বলা। মেয়েরা ছোটবেলা থেকেই কিছুটা সঙ্কুচিত পরিবেশে বেড়ে ওঠে বলে তাদের ভাষার শুদ্ধতা ও প্রায়োগিক সচেতনতা ছেলেদের থেকে বেশী হয়ে থাকে।

গ্রামে এখনও এমন কথা প্রচলিত আছে বংশকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে ছেলের প্রয়োজন। যেহেতু মেয়ে বড় হয়ে পরের বাড়ী চলে যাবে। তাই মেয়েকে লেখা-পড়া শিখিয়ে লাভ নেই। অভিভাবকেরা মেয়েদের খুব একটা বাড়ির বাইরে যেতে দিতে চায় না। বাড়ির বাইরে বা নিজের পরিবারের গন্ডির বাইরে যে সব মেয়েরা যেতে পারেন না তাঁরা সংগত কারণেই পরিবারের বড়দের কথা শুনে থাকেন এবং ঐ সব ভাষায় কথা বলে থাকেন। তাঁদের বুলি ভান্ডারে নতুন নতুন শব্দ মালার উপস্থিতি বাইরের পরিবেশের সাথে না মেশার কারণে কিছুটা কম থাকে, এ জন্য যে বাইরের পরিবেশের সাথে তাঁরা খুব একটা মেশার সুযোগ পায় না। তবে উচ্চ শিক্ষিত আধুনিক মেয়েদের ক্ষেত্রে বিষয়টি সমভাবে প্রযোজ্য নয়। মহিলারা অনেক কথা বলতে চেয়েও বলেন না। কথা চেপে যায় বা গোপন করে যায়। 'মানুষের ভাষার সবচেয়ে বড় কাজ জ্ঞাপন করা, গোপন করা নয়। ..... তবে সমস্ত কথা তো আমরা সকলকে শোনানোর জন্য বলি না, সকলকে জানাতেও চাই না। যে-কথা শোনাতে চাই না, তা নির্দিষ্ট মানুষের কানে একান্তে বলি বা কয়েকজনের কাছে নিচু গলায় বলি। এখানে অন্যদের সঙ্গে যে দূরত্ব তৈরি হয় তা শ্রুতির দূরত্ব, বোধের দূরত্ব নয়। জোরে বললেই সে কথা অন্যেরা বুঝে ফেলবে। ..... আমি যাদের বোঝাতে চাই তারা ছাড়া অন্য লোক শোনে তা শুনুক—তারা আমার কথা বুঝতে যেন না পারে

Dhaka University Institutional Repository

এই লক্ষ্য থেকে উদ্ভব হয়েছে গোপন ভাষার। মনে রাখতে হবে, গোপন ভাষাও ভাষা, তাও মনের কথা অন্যকে জানাতে চায়।' [৮]

ভাষা গোপন করা কিংবা কথা না বলে চেপে যাওয়ার বিষয়টি পুরুষের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। তবে মহিলারা কোন শব্দ উচ্চারণ না করে অর্থাৎ বাগযন্ত্রের সাহায্যে কোন ধ্বনি সৃষ্টি না করে মুখের ভাব-ভঙ্গি এমন ভাবে করতে পারেন যা দ্বারা অর্থবহ কোন কিছু বোঝায়। এ রকম ভাব-ভঙ্গি বা ইঙ্গিত কিন্তু পুরুষেরা খুব একটা করেন না।

মহিলা অশিক্ষিত হোক কিংবা শিক্ষিত হোক ঐ পর্যায়ের পুরুষের থেকে ভাষা ব্যবহারে তারা সচেতন বলে প্রতীয়মান হয়। 'ট্রাডগিল নরিজের ভাষায় ঘটমান বর্তমানের (ng) ভেদরূপ নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি সেই গবেষণায় এই সমাজভাষিক ভেদরূপের দুটো রূপভেদ পেয়েছেন, একটি মান্যরূপ, [iŋ], এবং অপরটি [ɪ~n] অর্থাৎ অপরটিতে কণ্ঠনাসিক্য ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে না সেখানে হচ্ছে জিহ্বামূলীয় দন্ত্য ধ্বনি। লেবোভের মতো সূচক অঙ্কের দ্বারা তিনি বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর গড় মান (average mean) নির্দেশ করেছেন। মান্য রূপের জন্য তিনি ধরেছেন ১, অর্থাৎ যতোবার একজন মান্যরূপ [iŋ] বলবে, সে পাবে ১, অ-মান্য রূপ [n] -এর জন্য ২, যতোবার এই রূপটা বলবে সে পাবে ২। তারপর যতোবার সে এরকম উচ্চারণ করছে তার যোগফল, মোট উচ্চারণের (শব্দের) সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হচ্ছে। এখন যে গড় হল তার থেকে ১ বাদ দিয়ে ১০০ দিয়ে গুণ করা হলে, সূচক অঙ্ক পাওয়া যায়। এই হিশেবে যদি ০০০ আসে, তার মানে সেই ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণী সকল ক্ষেত্রে মান্যরূপ ব্যবহার করেছে। যদি ১০০ হয়, তাহলে অ-মান্য রূপ ব্যবহার করেছে প্রতিটি দৃষ্টান্তে বা শব্দে। নিচে পাঁচটি সামাজিক শ্রেণী এবং চারটি বিভিন্ন রীতিতে নারী-পুরুষের মান্য/অ-মান্য (ng)-ভেদরূপের সূচক অঙ্ক দেওয়া হল।

শ্রেণী	লিঙ্গ	রীতি			
		শব্দ গঠন রীতি	অনুচ্ছেদ গঠন রীতি	বিধিগত রীতি	বিধিবাধ্য রীতি
মধ্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী	পুং	০০০	০০০	০০৪	০৩১
	স্ত্রী	০০০	০০০	০০০	০০০
নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী	পুং	০০০	০২০	০২৭	০১৭
	স্ত্রী	০০০	০০০	০০৩	০৬৭
উচ্চ শ্রমিক শ্রেণী	পুং	০০০	০১৮	০৮১	০৯৫
	স্ত্রী	০১১	০১৩	০৬৮	০৭৭
মধ্য শ্রমিক শ্রেণী	পুং	০২৪	০৪৩	০৯১	০৯৭
	স্ত্রী	০২০	০৪৬	০৮১	০৮৮
নিম্ন শ্রমিক শ্রেণী	পুং	০৬০	১০০	১০০	১০০
	স্ত্রী	০১৭	০৫৪	০৯৭	১০০

... শ্রেণী, রীতি এবং লিঙ্গ অনুসারে (ng)-এর সূচক অঙ্ক।

এই তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই নারীদের ক্ষেত্রে সূচক অঙ্ক কম, সূচক অঙ্ক কম মানেই মান্যরূপ উচ্চারণের দিকে প্রবণতা বেশি। পুরুষেরা সর্বক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে বেশি নম্বর পাচ্ছে। তার মানে তারা অ-মান্য রূপ বেশি ব্যবহার করছে।' [৯]

Dhaka University Institutional Repository

'লেবোভ মনে করেন ভাষা ব্যবহারে, যেখানে রীতি ও শ্রেণীর স্তরবিন্যাস আছে, সেখানে নারী-পুরুষে ভাষার তফাত হবেই – মহিলারা মর্যাদাসূচক চিহ্ন ব্যবহার করবেই, এবং পুরুষদের চেয়ে বেশি পরিমাণে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সতর্ক করে দেন, সেই সমস্ত সমাজেই মহিলাদের উচ্চ মর্যাদাসূচক রূপের প্রতি প্রবণতা দেখা যায়, যেখানে মহিলাদের বহির্জীবনে (Public life) কোনো ভূমিকা পালন করতে হয়। তিনি ভারতবর্ষের উদাহরণ দিয়ে বিপরীত কথাও বলতে চেয়েছেন কারণ এখানকার পরিস্থিতি একেবারে আলাদা। কারণ লেবোভ ... মনে করেন না যে গ্রামীণ জীবনে বা শহরের উপকণ্ঠে নিম্ন নারী-পুরুষের ভাষায় তেমন ভেদাভেদ হয়। এসব অঞ্চলে, নারীরা যেমনি পুরুষেরাও তেমনি অমান্য উপভাষার জন্য ভাষা-তথ্য প্রতিবেদকের কাজ করতে পারে। এবং মর্যাদাসূচক রূপ সম্বন্ধে তাদের খুবই কম ধারণা থাকে যদি তারা নিজেদের নিভৃত (isolated) জীবনে আবদ্ধ থাকে।'[১৮]

কুমারখালীতে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলা ভাষার শিষ্ট রূপই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে মর্যাদা সংক্রান্ত যে বিষয়টি ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ধরা হয় সেটি কুমারখালীর জন্য অনেকাংশেই আপেক্ষিকতার উপর নির্ভর করে থাকে। মর্যাদার বিষয়টি সমাজ দ্বারা নির্ণিত হয়ে থাকে। মানুষের অবস্থান সমাজের বাইরে নয়। সমাজের নিয়ম-কানুন, একটি বিশেষ সমাজের আভ্যন্তরীন মান্য-অমান্যের বিষয়। সামাজিকভাবে উচ্চ, মধ্য কিংবা নিম্ন শ্রেণীর যে ধারনা ও গ্রহণযোগ্যতা তা বিশেষ সমাজে বসবাসকারী ভাষাগোষ্ঠীর লোকেরা জানেন না তা নয়। এ ছাড়া মান্য ভাষার প্রয়োগ নিশ্চিত হয়ে থাকে পরিবার তথা সমাজের অপরাপর ভাষা-ভাষীদের ভাষা ব্যবহারের উপর। শুধুমাত্র একজন মানুষের প্রচেষ্টায় মান্য ভাষা জীবন্ত থাকতে পারে না। মান্য ভাষা একটি এলাকার বা দেশের গ্রহণযোগ্য মৌখিক ও লিখিত ভাষা। নারী ও পুরুষের ভাষায় ক্ষেত্র বিশেষে পার্থক্য বিদ্যমান। কুমারখালীর গ্রামের মহিলারা কিছু শব্দ ব্যবহার করেন তা পুরুষেরা ব্যবহার করেন না। যেমন,

- লো
- অ্যালো
- কি লো
- নে লো
- রে লো
- কি ছ্যাড়া রে

অধিকাংশ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মহিলারা উপরের শব্দ গুলো ব্যবহার করেন। আবার পুরুষেরা কিছু শব্দ ব্যবহার করেন যেমন, শালা, শালী ইত্যাদি। মহিলারা এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করেন না। অশিক্ষিত পুরুষের ক্ষেত্রে শালা, শালী জাতীয় শব্দ ব্যবহার করতে দেখা যায়। কিন্তু শিক্ষিত পুরুষেরা এ জাতীয় শব্দ খুব কম ব্যবহার করেন।

কুমারখালীর অধিকাংশ পরিবারে দেখা যায়, মেয়েদের কিছুটা অন্যরকম দৃষ্টিতে দেখা হয়। অন্যরকম দৃষ্টি বলতে ভাই-বোনদের মধ্যে সমতা ও অসমতার বিষয়ে বলা হচ্ছে। এই বিষয়টি পরিবার ও সমাজের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। মেয়ে বড় হয়ে অন্যের ঘরে চলে যাবে, তার আর লেখা-পড়া শিখিয়ে কি হবে। এমন ধারনা অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত পরিবারে বর্তমান। কিছু কিছু শিক্ষিত পরিবার যারা কুসংস্কার মুক্ত নয় তারাও এর আওতায় চলে আসে। ফলে মেয়েদের যতটুকু শিক্ষার প্রয়োজন বা

Dhaka University Institutional Repository

উন্নত জীবন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার ঠিক ততটুকু তাদের ভাগ্যে জোটে না। এই না জোটার কারণে ভাষার উপর তার প্রভাব পড়ে। ভাষার উপর প্রভাব এ জন্য পড়ে যে ভাষা পরিবর্তনশীল। সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে ভাষায় প্রতি নিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। যেমন কম্পিউটারের কথা আজকের পৃথিবীর প্রায় সবাই জানেন, কথাটি কিন্তু গ্রামীণ সমাজের কথা ভেবে বলা যায় না। 'কম্পিউটার' শব্দটি শোনেন নি বা শুনলেও 'কম্পিউটার' দিয়ে কি করতে হয় তা এখনও গ্রামের সিংহভাগ অশিক্ষিত লোকেরা জানেন না। এমন কি অনেক শিক্ষিত লোকও কম্পিউটারের উপযোগীতা নিতে ব্যর্থ। যাঁরা 'কম্পিউটার' শব্দটি শোনেন নি বা এখনও জানেন না 'কম্পিউটার' কি, তাঁদের ভাষিক ভান্ডারে এখনও 'কম্পিউটার' শব্দের সংযোজন ঘটে নি। এ রকম অনেক শব্দের প্রয়োগ থেকে অশিক্ষিত গ্রাম্য নারী-পুরুষেরা যে পিছিয়ে থাকছেন না তা নয়। এ ক্ষেত্রে, গ্রাম্য-নারীদের কথা বলাই শ্রেয়। গ্রাম্য মেয়েদের বোকা ভাবা হয়ে থাকে। তাঁদের সিদ্ধান্ত নেয়ার মত কোন জ্ঞান নেই। তাঁদের কোন পছন্দ-অপছন্দ নেই। বাড়ির গুরুজনদের পছন্দই হলো তাঁদের পছন্দ। কুমারখালীর অধিকাংশ পরিবারে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পুরুষের মতামতকেই অধিকতর মূল্য দিতে দেখা যায়। পরিবারে নারীর যে কোন ভূমিকা থাকে না বা নেই তা নয়। তবে কোন বিষয়ে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিলে সেখানে নারীর কিছু বলার থাকে না। কারণ বাড়ির প্রধান বা বাড়ির কর্তা হিসেবে পুরুষের অবস্থান। কোন কোন পরিবারে বড় ভায়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে গৃহীত হয়। এ ক্ষেত্রে পিতার অনুস্থিতি কিংবা পিতার দুর্বলতা অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। পিতার অনুপস্থিতিতে মায়ের স্থান কোন কোন পরিবারে প্রধান হিসেবে দেখা যায়। কিন্তু তার সংখ্যা নিতান্তই নগন্য। কুমারখালীতে সিদ্ধান্ত নেয়ার বা সিদ্ধান্ত দেয়ার যে ভাষা প্রচলন আছে, তা হলো:

ক. অত কথার দরকার নেই, আমি যা বললাম তাই হবে।
খ. যা বললাম তাই কর।
গ. আমি তো বলেছি।
ঘ. ও কাজ করা যাবে না, ব্যস।

র্ক. অত কতা কস/কইস্ ক্যা, যা কইছি তাই কর।
র্খ. তোর কথা না, আমার কথা।
র্গ. আমি তো কইছি।
র্ঘ. যা কইছি তাই হবি।

উপরের উদাহরণের ক, খ, গ এবং ঘ নম্বর উদাহরণে শিক্ষিত এবং ভাষা ব্যবহারের প্রতি সচেতন পুরুষদের সিদ্ধান্ত সূচক বাক্যের প্রয়োগ রীতি দেখানো হয়েছে। র্ক, র্খ, র্গ এবং র্ঘ নম্বর উদাহরণে অশিক্ষিত পুরুষের সিদ্ধান্ত সূচক খন্ড বাক্য/বাক্যের প্রয়োগ রীতি দেখানো হয়েছে। সাধারণত নারীরা এ রকম ভাষায় খুব কম কথা বলে থাকেন।

কুমারখালীতে বিয়ের যে রীতি প্রচলিত তা এখনও ছেলেদের মতামতের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। ছেলে বা ছেলের পক্ষ মেয়েকে দেখতে যায়। পছন্দ হলে বিয়ে হয় না হলে হয় না। এ দেখার বিষয়ে যে বিয়ে করবে অর্থাৎ যার বিয়ে হবে তার মতামতের তেমন কোন মূল্য থাকে না। কুমারখালীর মেয়েরা এখনও বিয়ে করে না, বিয়ে পোষে। 'বিয়ে পোষা' অর্থ বিয়েতে বসে বা বিয়ে করতে সম্মত হয়ে বিয়ের কার্যাদি সম্পন্ন করা। অন্যদিকে ছেলেরা বিয়ে করে। তারা 'বিয়ে পোষে' না বা 'বিয়েতে বসে' না।

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য কুমারখালীতে বিয়েতে বসা, খড়বাক্যটির প্রয়োগ নেই বললেই চলে। কুমারখালীতে বিয়ে করা না করায় যা প্রচলিত তা হলো :

ক. বিয়ে করবো।
খ. বিয়ে পুষবো।
গ. বিয়ে করছিস নাকেন? (ছেলের ক্ষেত্রে)
ঘ. বিয়ে পুষছিস না কেন? (মেয়ের ক্ষেত্রে)
ঙ. মেয়ে দেখতে যাব। (ছেলের ক্ষেত্রে)
চ. আমাকে দেখতে আসবে। (মেয়েরক্ষেত্রে)

উপরের উদাহরণের ক, গ এবং ঙ নম্বর উদাহরণগুলি ছেলেদের জন্য এবং খ, ঘ এবং চ নম্বর উদাহরণগুলি মেয়েদের জন্য প্রযোজ্য।

একই স্তরের শিক্ষিত কিংবা একই স্তরের অশিক্ষিত নারী-পুরুষের ভাষা ব্যবহারের প্রতি নজর দিলে দেখা যায় পুরুষ অপেক্ষা নারী ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বেশি সতর্ক ও সচেতন। 'পাশ্চাত্য সমাজে মহিলারা পুরুষদের চেয়ে বেশি পরিমাণে মর্যাদা-সচেতন (Status conscious), তাই তারা ভাষিক ভেদরূপ সম্বন্ধে বেশিমাত্রায় সতর্ক ... ট্রাডগিল এর মূলে তিনটি কারণ রয়েছে বলে নির্দেশ করেছেন ...। প্রথম কারণ হল মহিলারা সন্তান প্রতিপালন করে থাকে এবং সন্তানের মধ্যে সংস্কৃতির সঞ্চারণ (transmission) করে থাকে। তাই তারা সন্তানদের জন্য ভাষার মর্যাদাসূচক অনুশাসনরূপের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন। দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্য সমাজে মহিলাদের অবস্থা পুরুষদের তুলনায় অনেক কম নিশ্চিত বা নিরাপদ। তাই মহিলাদের পক্ষে ভাষাগতভাবে এবং অন্যভাবে তাদের সামাজিক মর্যাদা আদায় করে নেওয়া বা প্রকাশ করা জরুরী হয়ে পড়ে, এবং এই কারণেই তারা এই ধরনের সংকেত (signal) সম্পর্কে খুবই বেশি পরিমাণে সচেতন। তৃতীয়ত, পাশ্চাত্য সমাজে পুরুষদের সামাজিকভাবে বিচার করা হয় তাদের পেশার দিকে, তাদের কতো আয় তার দিকে তাকিয়ে এবং বোধহয় তাদের অন্য ক্ষমতার জন্য–তারা কী করছে (by What they do) তা দিয়ে। সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত মহিলাদের পক্ষে এ ব্যাপারটা দুরূহ ছিল, অনেক পেশায়ই মহিলাদের সামাজিক বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে। ফলে তারা কী, তা বিচার করতে হয় তারা নিজেদের কী করে প্রতিপন্ন করতে পারে (on how they appear)। পুরুষদের মতো পেশা বা পেশাগত সাফল্য বা মর্যাদার অন্যান্য প্রকাশ দিয়ে মহিলাদের বিচার করা হয় না। এই কারণেই তাদের বাক ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে।'[১১]

কুমারখালীতে অধিকাংশ মহিলাদের ক্ষেত্রেই ভাবা হয় তাঁদের জন্ম হয়েছে বাড়িতে থাকবার জন্য, বাড়ির কাজ করবার জন্য, ভাত রান্না করবার জন্য, পুরুষদের সেবা যত্ন করবার জন্য এবং শিশু জন্ম দেয়ার জন্য। এ সব কারণে শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক কার্যাদিতে অংশগ্রহণের বিষয়ে তাঁদের অভিভাবকদের তেমন কোন উৎসাহ পায় না। বরং কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অভিভাবকেরা তাঁদের সৃজনশীল কোন কাজের বিষয়ে নিরুৎসাহিতও করে থাকেন।

একজন মেয়ের সাথে অন্য এক জন মেয়ের দেখা সাক্ষাৎ হলে তাঁরা অনেক কথা বলতে চায়। এই কথা বলতে চাওয়ার কারণ হলো তাঁরা বাড়ির মধ্যে প্রায় বন্দি অবস্থায় অবস্থান করে থাকেন। সে জন্য অনেক দিনের জমানো কথা এক সাথে বলতে চায়। কোন কোন মেয়ের স্বামী কিংবা শ্বশুর-শাশুড়ির

Dhaka University Institutional Repository

ইচ্ছে অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে স্বামীর বাড়ি হতে তাঁর বাবা-মায়ের বাড়িতে যাওয়া না যাওয়া। যে সব মেয়েরা শিক্ষিত এবং চাকরি করে তাঁদেরও ব্যক্তিস্বাধীনতা ঠিক পুরুষের মত লক্ষ্য করা যায় না।

মহিলারা সাজ-গোজ করার জন্য কিছু শব্দ ব্যবহার করে থাকেন তা পুরুষেরা করেন না। যেমন, টিপপরা, লিপিস্টিক দেয়া, আলতাপরা, চুল বাঁধা ইত্যাদি। একটা কথা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য তা হলো মহিলারা পুরুষ অপেক্ষা বেশি কথা বলা পছন্দ করেন এবং গল্প গুজবে তাঁরা বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। একই কথা তাঁরা বার বারও বলে থাকেন, পুরুষেরা সাধারণত একই কথা বার বার বলা পছন্দ করেন না। মেয়েরা প্রায় সময়ই কিছু খন্ডবাক্য ব্যবহার করেন যা সাধারণত পুরুষেরা করেন না। যেমন,

- হায় আল্লাহ
- হায় ভগবান
- কি সর্বনাশ!
- পোড়া কপাল আমার !
- ছিঃ ছিঃ লজ্জার কতা/কথা
- আল্লার কিরে
- কথার/কতার ছিরি দেখ/দ্যাখ
- ও হরি!
- ভাল হবে না কিন্তু
- শোনা না ভাল
- ভগবানের দিব্যি
- মুনি না ভাল।

উল্লেখ্য যে অশিক্ষিত ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা মহিলারা 'ছিঃ ছিঃ নজ্জার কতা' এবং 'কতার ছিরি দ্যাখ' খন্ডবাক্যই বেশি ব্যবহার করেন। অন্যদিকে শিক্ষিত মেয়েরা 'ছিঃ ছিঃ লজ্জার কথা' এবং 'কথার ছিরি দেখ' ব্যবহার করে থাকেন। কুমারখালীতে উঠতি বয়সি পুরুষদের মধ্যে 'আল্লার কিরে' বলতে শোনা যায়। তবে সংখ্যার দিক থেকে তা বেশ কম।

মহিলারা সাধারণত তাঁদের কণ্ঠস্বর কিছুটা নিচু করে কথা বলেন। বিশেষ করে ধর্মীয় কারণে এই কণ্ঠস্বর নিচুর কারণ বলে বিবেচিত হতে পারে। 'বাংলাদেশের কোন কোন গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের জোরে কথা বলা নিষেধ। গোঁড়া ধর্মাবলম্বীদের বক্তব্য অনুসারে মেয়েদের কণ্ঠস্বর পর-পুরুষের কানে যাওয়া 'গোনাহ্ ব'লে পর-পুরুষের উপস্থিতিতে মেয়েরা কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকে। এর ফলে সন্ধীপসহ কোন কোন গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে এক ধরনের ফিসফিসিয়ে কথা বলার স্টাইল জন্মলাভ করেছে।'[১২]

মহিলাদের কণ্ঠস্বর ও পুরুষদের কণ্ঠস্বরের মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। কণ্ঠস্বরের বিষয়টি স্বরযন্ত্র (Vocal cord) এর উপর নির্ভর করে থাকে। মেয়েদের কণ্ঠস্বর পুরুষদের কণ্ঠস্বর থেকে বেশ চিকন অর্থাৎ পুরুষদের কণ্ঠস্বর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেমন ভরাট বা মোটা, মেয়েদের ক্ষেত্রে তা নয়। স্বরযন্ত্রের কারণে ভাষার উচ্চারণগত এবং শ্রুতিগত পার্থক্য নারী ও পুরুষের ভাষাকে জন্মগত ও প্রকৃতিগত

Dhaka University Institutional Repository

ভাবেই স্বতন্ত্রতা দান করেছে। কুমারখালীতে মেয়েদের ফিসফিসিয়ে কথা বলতে খুব একটা দেখা যায় না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন জামাইয়ের সামনে কিংবা নতুন আত্মীয়দের সাথে মেয়েরা কিছুটা সাবধানে ও নিম্নস্বরে কথা বলে থাকেন। অবশ্য নতুন বউ ও জামাইয়ের মধ্যে ফিসফিসিয়ে কথা বলতে দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলা উভয়ই ফিসফিসিয়ে কথা বলে থাকেন।

অশিক্ষিত ও দরিদ্র পরিবারের নারী-পুরুষের মধ্যে কখনও কখনও কথা কাটাকাটি লক্ষ্য করা যায়। কুমারখালীতে এ ধরনের কথা কাটা-কাটিকে 'ঝগড়া' বা কোন কোন ক্ষেত্রে 'ঝগড়া-ঝাটি' বলা হয়ে থাকে। নারী ও পুরুষের মধ্যে 'ঝগড়া-ঝাটি' হলে পুরুষের থেকে মহিলাদের জোরে জোরে অথবা চিৎকার করে কথা বলতে শোনা যায়। উল্লেখ্য যে শিক্ষিত নারী-পুরুষের মধ্যেও 'ঝগড়া-ঝাটি' হয়ে থাকে · তবে শিক্ষিত নারী-পুরুষ অশিক্ষিতদের মত চিৎকার করে কথা বলেন না।

কথা কাটা-কাটি কিংবা ঝগড়ার সময় যখন নারী ও পুরুষ দু'জনই উত্তেজিত থাকেন, তখনও মেয়েরা খুব একটা গালি জাতীয় ভাষা ব্যবহার করেন না। কিন্তু পুরুষেরা গালির ভাষা ব্যবহার করেন। বাঙালি সমাজে বউয়ের ছোট বোন সম্পর্কে 'শালী' এবং বউয়ের ছোট ভাই সম্পর্কে 'শালা'। কিন্তু এই 'শালা' ও 'শালী' সম্পর্কসূচক শব্দ দু'টি প্রায় ক্ষেত্রেই কুমারখালীতে গালির ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। শব্দ সৃষ্টি করেছে মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনে। শব্দের সৃষ্টি ও ভাষায় তার প্রায়োগিক নিশ্চয়তাই দান করেছে এক একটি শব্দের এক এক অর্থবোধক সম্পর্ক কিংবা অন্য বস্তু বা বিষয় বোঝাবার মত বিস্ময়কর ক্ষমতা। কুমারখালীতে নারী-পুরুষদের মধ্যে ঝগড়ার সময় 'শালা' ও 'শালী' শব্দ দুটো অশিক্ষিত পুরুষদের মধ্যে অধিকভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন:

ক. শালার মাগীর কতা শোন

খ. শালীস ছাও কি বলে রে

গ. দ্যাক দি শালীস ছার কতা

ঘ. দ্যাগ দো কি কয়

ঙ. দেবেন মুচি কোন কার

চ. আমার মার আর কাজ নেই ওর শালী হবি নি।

উপরের উদাহরণের ক, খ ও গ নম্বরে ঝগড়ার সময় পুরুষের ভাষা ব্যবহার দেখানো হয়েছে এবং ঘ, ঙ ও চ নম্বরে ঝগড়ার সময় নারীর ভাষা ব্যবহার দেখানো হয়েছে। কুমারখালীর কৃষ্ণপুর গ্রামের এক বাড়ীতে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার সময় উদাহরণের উক্তিগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে ঝগড়ার ভাষা কিন্তু এক এক পরিবারে এক এক রকম হতে পারে। এগুলো নির্ভর করে বক্তার ভাষা ব্যবহারের শালীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার উপর। ভাষা ব্যবহারের শালীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা হলো, প্রতিটি সমাজে ভাষা ব্যবহারের কিছু নিয়ম থাকে। ভাষায় এমন কিছু শব্দ বা খন্ডবাক্য কিংবা বাক্য থাকে যা ব্যবহারের মাধ্যমে কাউকে উত্যক্ত কিংবা আঘাত দেয়া যেতে পারে। এ সব শব্দ বা খন্ডবাক্য কিংবা বাক্য কথা বলার সময় এড়িয়ে যাওয়া হলো ভাষার শালীনতা বোধ। আবার কাউকে উত্যক্ত কিংবা আঘাত দেয়ার জন্য ব্যবহৃত শব্দ বা খন্ডবাক্য কিংবা বাক্য ব্যবহার করা হলো উচ্ছৃঙ্খলতাবোধ। অশিক্ষিত কিংবা

Dhaka University Institutional Repository

অল্পশিক্ষিত, কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষিত বদমেজাজী পুরুষদের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খলভাব পরিলক্ষিত হয়। নারীদের মধ্যে এমন স্বভাব নিতান্তই নগন্য।

উদাহরণে নির্দেশিত ঝগড়ার সময় ব্যবহৃত গালির ভাষা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ঝগড়ার সময় পুরুষ প্রতিক্ষেত্রেই গালি জাতীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন, 'শালার মাগীর কতা শোন' বাক্যে 'শালার মাগী' কুমারখালীতে গালি দেয়ার মাধ্যমে উত্যক্ত করার জন্য ব্যবহৃত খন্ড বাক্য; 'শালীস ছাও কি বলে রে' বাক্যে 'শালীস ছাও' বেশি উত্যক্ত জাতীয় খন্ড বাক্য; এবং 'দ্যাক দি শালীস ছার কতা' বাক্যে 'শালীস ছার' খুব বেশী উত্যক্ত জাতীয় খন্ড বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে 'শালীস ছাও/শালীস ছার' অর্থ হলো 'শালীর মেয়ে'। বউকে শালীর মেয়ে বলা যায় না। তাই বাক্যগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। তাহলে বলা যায় পুরুষ প্রতিক্ষেত্রে গালি দেয়ার ভাষা ব্যবহার করেছেন।

কিন্তু মহিলার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, 'দ্যাগ দো কি কয়' এর অর্থ হলো 'দেখ তো কি বলে', 'দেবেন মুচি কোন কার', এর অর্থ হলো, 'দেবেন মুচির মত ব্যবহার', এবং আমার মা'র আর কাজ নেই ও শালী হবি নি, এর অর্থ হলো, 'মহিলার মা ঐ পুরুষের শালী হবে না'। মহিলা শুধু মাত্র একবার 'দেবেন মুচি' অর্থাৎ যে জুতা সেলাই করে তার সাথে তার স্বামীকে তুলনা করে বিদ্রূপ করেছেন। তাছাড়া প্রতিটি খন্ডবাক্য কিংবা বাক্যই গ্রহণযোগ্য। এ থেকে ধরে নেয়া যায় যে অস্বাভাবিক বা উত্তেজিত অবস্থায়ও মহিলারা পুরুষ থেকে শালীন বা ভদ্র ভাষায় কথা বলে থাকেন। তবে ঝগড়ার সময় কিংবা উত্তেজিত অবস্থায় ভাষায় প্রায়োগিক মাধুর্যতা খুব একটা পরিলক্ষিত হয় না। বরং ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঝাঁঝালো তীক্ষ্ণ উচ্চারণ ও রূঢ়তা লক্ষ্য করা যায়।

বাংলা ভাষায় লিঙ্গান্তরের যে বিষয়টি দেখতে পাওয়া যায় তা হলো প্রাণীবাচকে দু'ধরনের লিঙ্গ রয়েছে। যথা, পুংলিঙ্গ যা দ্বারা পুরুষ প্রাণীদের বোঝায় এবং স্ত্রীলিঙ্গ, যা দ্বারা মহিলা প্রাণীদের বোঝানো হয়। পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ ছাড়াও আরও এক ধরনের লিঙ্গ বাংলা ভাষায় রয়েছে, তা হলো ক্লীবলিঙ্গ। ক্লীবলিঙ্গ দ্বারা প্রাণহীন বস্তু অর্থাৎ পদার্থকে বোঝানো হয়। পুংলিঙ্গ যেমন, মামা, চাচা, বাঘ, বালক ইত্যাদি। স্ত্রী লিঙ্গ যেমন, বালিকা, মামী, চাচী, বাঘিনি ইত্যাদি। ক্লীবলিঙ্গ যেমন, গাছ, বই, কলম, বাতাস ইত্যাদি। বাংলা ভাষার মত ইংরেজিতেও লিঙ্গান্তরে বিষয়টি একই রকম দেখা যায়। তবে কোন কোন ভাষায় পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ আছে কিন্তু ক্লিবলিঙ্গ নেই। 'হিন্দুস্থানী ও ফারসীতে ক্লীবলিঙ্গ নাই বিশেষ্য-পদ, হয় পুংলিঙ্গ, নয় স্ত্রীলিঙ্গ; হিন্দুস্থানীতে "ভাত, কাগজ, আদমী (=মানুষ), লড়কা, কাম (=কাজ), গুণ, কাঁটা, পোড়া(= ক্ষীরের মিষ্টান্ন)"– পুংলিঙ্গ শব্দ, কিন্তু "দাল (=ডাইল), কিতাব (=বই), ঔরৎ (=স্ত্রীলোক), লড়কী (=কন্যা), কচৌরী (=কচুরী), মিঠাঈ (মিষ্টান্ন), ছুরী, বাত (=কথা), নীদ (=নিদ্রা), লাজ (=লজ্জা)" – এগুলি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ; ফরাসীতে couteau (কুতো=ছুরি) পুংলিঙ্গ শব্দ, fourchette (ফুর্শেৎ=কাঁটা) স্ত্রীলিঙ্গ, Liver (লিভ্র=বই), পুংলিঙ্গ, Plume (প্ল্যুম=কলম) স্ত্রীলিঙ্গ।[১৩]

বাংলা ভাষার পুংলিঙ্গ বিষয়ক শব্দের সাথে কিছু প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা যায়। পুংলিঙ্গের সাথে যে সব প্রত্যয় যুক্ত হয়ে পুংলিঙ্গকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিণত করে সে সব প্রত্যয়কে স্ত্রীপ্রত্যয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আ, ই, ঈ, ইনী, নী, আনী, ইকা ইত্যাদি স্ত্রীপ্রত্যয় যুক্ত হয়ে পুংলিঙ্গকে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরিত করে। যেমন,

Dhaka University Institutional Repository

পুলিংঙ্গ সূচক শব্দ	(+)স্ত্রীপ্রত্যয়	(=)স্ত্রীলিঙ্গ সূচক শব্দ
মামা	নী	মামানী
চাচা	ই	চাচি
ছাত্র	ঈ	ছাত্রী
হতভাগা	ইনী	হতভাগিনী
প্রিয়	আ	প্রিয়া
বালক	ইকা	বালিকা
চাকর	আনী	চাকরানী

বাংলা ভাষায় যেমন স্ত্রীপ্রত্যয় রয়েছে যা পুরুষসূচক শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে নারীসূচক শব্দ গঠন করে, তেমন কিন্তু পুরুষপ্রত্যয় দেখা যায় না, যা স্ত্রীসূচক শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে পুরুষসূচক শব্দ গঠন করতে পারে।

সামাজিক অবস্থান, সমাজে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি ভাষার জগতকে যে নিয়ন্ত্রণ করে না তা নয়। নারীর ভাষা ব্যবহার ও ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে নিয়ম সাবধানতা বা ভীরুতা কিংবা ভিন্নতা দেখা যায়, তার মূলে রয়েছে, পুরুষশাসিত ও পুরুষকেন্দ্রিক সমাজের ছায়া রূপ বিধি বদ্ধতা। কুসংস্কার মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা ও শিক্ষার আলোর অপূর্ব স্পর্শে নারী-পুরুষের ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা কমে আসতে পারে বলে মনে করা যেতে পারে। ইদানিং কুমারখালীতে শিক্ষিত মহিলাদের ভাষায় পুরুষকেন্দ্রিকতা ও নারীকেন্দ্রিকতার কিছুটা হের-ফের লক্ষ্য করা যাচ্ছে। লজ্জাশীলা নারীর কথা-বার্তায় পুরুষ থেকে যে বড় রকমের পার্থক্য পূর্বে লক্ষ্য করা যেত, তা বর্তমানে ততটা দেখা যায় না। এমন কি অশিক্ষিত ও গ্রাম্য মহিলাদের কথা-বার্তায়ও লজ্জা নামক ব্যাধির উপস্থিতি খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না। তবে ভাষা ব্যবহারের প্রতি নারীরা পুরুষ থেকে বেশ সচেতন এ কথা বলা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী

১। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৭, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা; পৃ. ১৪৯।

২। সুকুমার সেন, বাঙালায় নারীর ভাষা, (উদ্ধৃতি, Jespersen, Language), বাঙলা ভাষা (২য় খন্ড), হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত ১৯৮৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা. পৃ. ৬৭২।

৩। সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত; পৃ.৬৭২।

৪। Peter Trudgill, Sociolinguistics, Reprinted 1988, Penguin Books, P. 80.

৫। English Bengali Dictionary, 1993, Bangla Academy, Dhaka. P. 809.

৬। পি, এম,সফিকুল ইসলাম, ১৯৯২, রাজশাহীর উপভাষা, বাংলা একাডেমী,ঢাকা; পৃ. ৫০-৫১।

৭। সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত; পৃ.৬৭২।

৮। পবিত্র সরকার; ভাষা, দেশ, কাল; ১৯৮৫ জি. এ. ই. পাবলিশার্স, কলিকাতা, পৃ. ৫৯-৬০।

Dhaka University Institutional Repository

৯। মৃণাল নাথ, ১৯৯৯, সামজ ও ভাষা, (ট্রাডগিল গবেষণা তথ্য) নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, পৃ. ১০৩-১০৪।

১০। প্রাগুক্ত; (লেবোভ মতামত), পৃ. ১০৭।

১১। প্রাগুক্ত; (ট্রাডগিল গবেষণা তথ্য) পৃ. ১০৭।

১২। রাজীব হুমায়ুন, ১৯৯৩, সমাজভাষাবিজ্ঞান, দ্বীপ প্রকাশন, ঢাকা; পৃ. ৪০।

১৩। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৬, রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, কলিকাতা;পৃ.২০১।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষিতদের ভাষা

ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একই ভাষা একই সমাজে নানা ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই নানা ভাবে ব্যবহৃত হওয়ার অবশ্যই কিছু না, কিছু কারণ থাকে। ভাষাবিজ্ঞানীরা কোন এলাকার ভাষা সংগ্রহের ব্যাপারে কিছু বিষয়ের প্রতি নজর রাখেন। এর মধ্যে অন্যতম হলো সমাজে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর বয়স, শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ইত্যাদি। ভাষা সংগ্রহের এই যে বিশেষ দিক এটাকে এক ধরনের ভাষার সামাজিক স্তর বিন্যাস বললে ভুল বলা হয় না।

কুমারখালীর শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ভাষা আলোচনার পূর্বে কুমারখালীর শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন তা জানার আবশ্যকতা রয়েছে। তাছাড়া কুমারখালীতে কখন এবং কোন সময় থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার প্রচলন হয়েছিল তাও জানা প্রয়োজন। বিশেষ করে ইংরেজ শাসনামল থেকে কুমারখালীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি উজ্জ্বল চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পর্ক থাকে। শিক্ষা দেয়ার জন্যই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয়। বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থার যেমন শৃঙ্খলা দেখা যায় তা পূর্বে ছিল না, না থাকার কারণ হলো শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা ছিল না। কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ বলতে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশক্রমে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হতো না অথবা একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন হবে তার জন্য কিছু নিয়ম রীতি থাকে যার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে শিক্ষা ব্যবস্থা, তা পূর্বে ছিল না। পূর্বেকার সঠিক ইতিহাস না জানা গেলেও কুমারখালীতে পারিবারিক পরিমন্ডলে মক্তব, টোল, গুরুরগৃহের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ- এরকম পদ্ধতি চালু ছিল। 'সিপাহী বিদ্রোহের একশত বৎসর পূর্বে পলাশী যুদ্ধ খ্যাত ১৭৫৭ সালে মিশনারী ম্যাকসমুলার এর জরীপ থেকে কুমারখালীর তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। তিনি এলেন সে সময় কুমারখালীতে কয়েকটি স্থানীয় বিদ্যালয় ছিল এগুলো টোল এবং পারিবারিক স্কুল। ...

বর্তমানে কুমারখালী তহশীল অফিসের প্রায় ৮০০ গজ দক্ষিণে ক্ষুদিরাম চক্রবর্তীর পিতা যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তীর একটি টোলের সন্ধান মেলে। যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী অতিশয় পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে এই টোলটি বৃটিশ আমলে খুবই নামকরা টোল ছিল। তবে পড়ুয়াদের PUBLIC EXAMINATION দিতে হত নবদ্বীপ যেয়ে।'[১] কুমারখালীতে যে একটি শিক্ষার পরিমন্ডল গড়ে উঠেছিল তা অতি সহজেই বোঝা যায়। '১৮৫৪ সালে স্বর্গীয় কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার মহাশয় নিজ বাস ভবনে একটি বালক বিদ্যালয় চালু করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সেখানে অতিশয় যত্নের সাথে শিক্ষা দেওয়া হতো। এটি ছিল একটি বাংলা স্কুল। তিনি যে বাংলা স্কুল খুলেছিলেন, সে সম্বন্ধে ১৮৬৯ সালের ২৭শে ডিসেম্বর সংবাদ প্রভাকরে দ্বারিকানাথ প্রমাণিক লিখেন, কতিপয় সজ্জনের বিশেষ উৎসাহে এই কুমারখালীতে একটি বঙ্গ বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। পরে ছাত্রবৃন্দের ও আয়ের ক্রমশ উন্নতি হওয়াতে পূর্বভাগের ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত হেনরী উড্রু' সাহেব মহাশয় হরিনাথ মজুমদারের অনুরোধক্রমে অত্রস্থলে আগমন করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা করেন এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী উত্তমরূপে দেখিয়া গভর্ণমেন্টের সাহায্যাধীন করাইয়াছিলেন।'[২]

প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে কুমারখালীর এম.এন. হাই স্কুলকে প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধরা যেতে পারে। এ বিদ্যালয়টি ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে নীল কুঠিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা হলেন শ্রীযুক্ত মথুরানাথ। মথুরানাথ বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষা না জানলেও ইংরেজি

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার প্রসারের জন্য বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। ঐ বিদ্যালয়টি কুষ্টিয়া জেলার প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম। 'রায় বাহাদুর, জলধর সেন, অক্ষয় কুমার মৈত্র, রমেশ চন্দ্র মুজমদার এ সমস্ত কীর্তিমান ব্যক্তি এ স্কুলে লেখাপড়া করেছেন।'[৩] মথুরানাথ বাবু বিদ্যালয় স্থাপন করেই চুপচাপ বসে থাকেন নি। বিদ্যালয়টির সরকারী মঞ্জুরি পাওয়ার বিষয়টিও তিনি নিশ্চিত করেছিলেন। যা ছিল অনেকটা কল্প কাহিনীর মতো।

'বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করাটা তখনকার দিনে খুবই কষ্টদায়ক ছিল। লর্ড হার্ডিঞ্জ কলকাতা থেকে ঢাকা যাবেন। তাকে জাহাজে চেপে গঙ্গা, পদ্মা, গড়াই হয়ে ঢাকা যেতে হবে। সে সময়ে প্রমত্তা গড়াই বছরের সব সময়ই খুব ব্যস্ত ছিল। নদীর অবস্থা ছিল এম.এন. স্কুল থেকে দু' মাইল দক্ষিণে। তবে নদী থেকে ছোট্ট একটি খাল এম.এন. স্কুলের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিল। হার্ডিঞ্জ সাহেব কুমারখালীর পাশ দিয়ে ঢাকা যাবেন এমন একটি সুযোগ হাত ছাড়া করা যায় না। মথুরানাথ বাবু একজন লোককে ঘোড়ায় করে গড়াই নদীর উজানে পাঠালেন। বলে দিলেন সাহেবের ধোঁয়াকল জাহাজ দেখা গেলেই যেন সে চলে আসে। দু'দিন পর লোকটি ঘোড়া ছুটিয়ে এসে সংবাদ দিল যে ধোঁয়াকল দেখা দিয়েছে। মথুরানাথ বাবু কয়েকটি বজরা নৌকা সাজিয়ে নদীর মাঝে অবরোধ সৃষ্টি করে রাখলেন। তিনি নিজে লাল পতাকা হাতে মাঝের নৌকার উপরে দাঁড়িয়ে জাহাজের নাবিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জাহাজ থেমে গেল এবং সিটি বাজতে লাগলো। মথুরানাথ বাবুর নৌকা ধীরে জাহাজের দিকে এগুলো। জাহাজ থেকে একজন দেশী সাহেব কেবিনের বাইরে এসে ইংরেজিতে বললেন WHO ARE YOU? মথুরানাথ ইংরেজী বুঝতেন না। আবার তাকে জিজ্ঞেস করা হল "তুম কো কেয়া হুয়া"? যদিও মথুরানাথ হিন্দি জানতেন না তবুও জানালেন যে তিনি মথুরানাথ। ইঙ্গিত করে দেখালেন যে তিনি হাত কাটা সাহেবের সাথে দেখা করতে চান। উল্লেখ্য যে, হার্ডিঞ্জ সাহেবের একটা হাত কাটা ছিল। জাহাজ থেকে দড়ির সিঁড়ি নামিয়ে দেয়া হল। মথুরানাথ জাহাজে উঠলেন, দো-ভাষীর মাধ্যমে হার্ডিঞ্জ সাহেবকে জানানো হল যে, ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি এখানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। সাহেবকে দয়া করে দর্শন করতে হবে। সাহেব রাজি হলেন এবং দলবলসহ বজরায় নেমে এলেন। জাহাজ নদীতে রেখে বজরা খাল বেয়ে এম.এন. স্কুলের নিকট এলে সাহেব পায়ে হেঁটেই খাল থেকে স্কুলে এলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ইংল্যান্ডের রাজা ও রাণীর জয় গান গেয়ে ও হার্ডিঞ্জ সাহেবের দীর্ঘায়ু কামনার মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানালো। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন বাবু কৃষ্ণ ধন মজুমদার। তিনি অতি পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। খুব সুন্দর ইংরেজি বলতে পারতেন। লর্ড সাহেব শ্রেণী কক্ষে যেয়ে ছাত্রদের সাথে কথাবার্তা বলে খুব খুশি হলেন। সাহেবের জন্য সব দেশীয় খাবার তৈরি করা হয়েছিল। পিঠার সংখ্যাই ছিল প্রায় বিশ রকমের। সাহেব অনেক খাবারই খেলেন তবে বেশী খেয়েছিলেন গোস্ত দিয়ে বকফুলের বড়া ভাজা। এটা খেয়ে সাহেব খুব খুশি হয়েছিলেন। কথা দিয়েছিলেন বাংলার মধ্যে কোন বিদ্যালয়কে যদি মঞ্জুরী দিতে হয় তবে এই স্কুলকেই প্রথম দেয়া হবে। তেজস্বী পুরুষ মথুরানাথ বাবুকে অনেক সাধুবাদ জানিয়ে সাহেব বিদায় নিলেন। এর আচ্ছা কিছুদিন পরেই এম.এন. স্কুল মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয় এবং অতি দ্রুত জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে থাকে।'[৪]

কুমারখালীতে যে শুধু বালকদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা নয়। কুমারখালীর মধ্যে যতগুলো বিদ্যালয় আছে তার মধ্যে দুটি বিদ্যালয় সর্বগুণে গুণান্বিত। একটি হলো এম.এন. বিদ্যালয়, অপরটি কুমারখালী বালিকা বিদ্যালয়। কুমারখালী বালিকা বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা হলেন কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি ছিলেন এ বিদ্যালয়ের অবৈতনিক শিক্ষক। শিক্ষার বিকল্প কোন কিছু নেই। এ বিষয়টি কুমারখালীর মানুষেরা জেনেছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

বহুকাল পূর্বেই। নারীকে গৃহে বন্দি করে রেখে সামাজিক উন্নতি সম্ভব নয়, সে বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছিল। নারী শিক্ষার যে অগ্রগতি প্রয়োজন তা সে এলাকার লোক যে অনুধাবন করেছিল, বিষয়টি অতি সহজেই বোঝা যায়, কুমারখালীতে বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। মূলত কুমারখালীর শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ভাষা কেমন তা বিশ্লেষণ করাই হলো মুখ্য উদ্দেশ্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা দেয়া মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গোড়ার কথা জানা থাকলে শিক্ষিতদের ভাষার বিষয়ে কিছুটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে আবার শ্রেণীবিভাগ আছে। শ্রেণী বিভাগের প্রথমেই এসে যায় যৌনগত শ্রেণী বিভাগ। যৌনগত শ্রেণীবিভাগ হলো:

- পুরুষ এবং
- নারী।

যৌনগত দিক ছাড়া আছে ধর্ম ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ। কুমারখালীর জনগোষ্ঠীর মধ্যে দুটি ধর্মের জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বসবাস করতে দেখা যায়। তা হচ্ছে-

- মুসলমান এবং
- হিন্দু।

এছাড়াও আছে শিক্ষিতের নানা স্তর। যেমন- উচ্চশিক্ষিত, শিক্ষিত, মোটামুটি শিক্ষিত ইত্যাদি। শিক্ষিত লোকদের মধ্যে আছে পেশাভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ।

শিক্ষিত লোক বলতে যে তার নিজের নাম স্বাক্ষর করতে পারে, তাকেও বোঝানো হয়। কিন্তু শুধুমাত্র নাম স্বাক্ষর করাকে শিক্ষিতদের তালিকায় ফেলা কতটুকু বাস্তবতা সমর্থিত তা ভাববার অবকাশ আছে। নাম স্বাক্ষর করতে লেখাপড়া করার খুব একটা দরকার হয় না। কোন একজন লোকের নিকট থেকে শুধুমাত্র নাম স্বাক্ষরের জন্য যে অক্ষর বা প্রতীকগুলি প্রয়োজন সেগুলি শিখে নিলেই চলে। গ্রামে এরকম প্রবণতা দেখা যায়। যারা শুধুমাত্র নাম স্বাক্ষর করতে পারে তাদের কথাবার্তা অনেকটা অশিক্ষিতদের মতো।

কুমারখালীতে ব্যবহৃত একটি বাক্যের দিকে নজর দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। নাম স্বাক্ষর করতে পারে অথবা মোটামুটি শিক্ষিত লোক একটি ছেলেকে বলছে, 'পানি ঢালতিছির ক্যা?' অর্থাৎ তার নিজের ছেলে অথবা নিকট আত্মীয়ের ছেলে পানি ফেলছিল এমন জায়গায় যেখানে পানি ফেলা ততটা ঠিক না। তাই এ ধরনের বাক্য বলে তাকে পানি ফেলতে নিষেধ করা হচ্ছে।

বাক্যটি শিক্ষিত লোক যারা কিছুটা বাইরে যাতায়াত করেন এবং প্রচলিত ভাষার প্রতি সচেতন তাঁরা বলেন, 'পানি ঢালছো ক্যান?' যাঁরা উচ্চশিক্ষিত এবং ভাষার বিশুদ্ধতার প্রতি বেশ সচেতন তাঁরা বলেন, 'পানি ফেলছো কেন?' তাহলে বাক্যটির যে প্রায়োগিক রূপ তা হলো:

		অর্থ
মোটামুটি শিক্ষিত →	পানি ঢালতিছির ক্যা?	পানি ফেলার কারণ/
শিক্ষিত →	পানি ঢালছো ক্যান?	পানি ফেলতে নিষেধ করা হচ্ছে
উচ্চশিক্ষিত →	পানি ফেলছো কেন?	

কুমারখালীর মুসলমান পরিবারে জল বলার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় না। সবাই জল না বলে পানি বলে থাকেন। কিন্তু হিন্দু পরিবারের লোকেরা পানি না বলে জল বলে থাকেন। তবে ইদানিং সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থার পরিবর্তনের কারণে অনেক হিন্দু বাঙালী জল-এর পরিবর্তে মাঝে-মধ্যে পানি বলে থাকেন। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন বলতে এখানে বলা হচ্ছে যে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় বসবাস করার জন্য মুসলমানদের সাথে কথার মাধ্যমে আরও নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্যই ভাষার শব্দ ব্যবহারের এ পরিবর্তনের কারণ। জল বাংলা শব্দ কিন্তু মুসলমান সমাজে এর ব্যবহার এতই কম যে জল শব্দটি দ্বারা হিন্দুয়ানী ভাব পরিলক্ষিত হয়।

'ঢালতিছির' শব্দের দ্বারা বর্তমান সময়ে তরল পদার্থ ফেলা সংক্রান্ত অর্থ বোঝায় এবং 'ক্যা' শব্দের অর্থ হলো 'কেন'। 'ঢালতিছির' শব্দের কিছুটা মার্জিতরূপ বা আধুনিক রূপ হলো 'ঢালছো'। 'ক্যা' শব্দটি দ্বারা প্রশ্নবোধক অর্থ বোঝানোর সাথে সাথে কখনও বা 'নিষেধ' করা বোঝানো হয়ে থাকে।

যাদের জন্ম কুমারখালীতে এবং চাকুরী বা ব্যবসায়িক কারণে কুমারখালীতে বাস করছেন, তাদের কথা-বার্তার মধ্যে কুমারখালীর এলাকার ভাষার প্রয়োগ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কুমারখালীর কৃষ্ণপুর গ্রামে বাড়ি এবং একই গ্রামের মেয়েকে বিয়ে করে গ্রামের বাড়িতে অবস্থান করছেন একজন এম.কম. পাশ ভদ্রলোক। তিনি কুমারখালীর পাশের থানা খোকসা কলেজের শিক্ষক। তিনি ধনী ও গ্রাম্য প্রধানের সন্তান এবং তার স্ত্রীও মোটামুটি শিক্ষিত, দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। ভদ্রলোক বাড়িতে সব সময়ই নিজের এলাকার ভাষায় কথা বলেন। যেমন, সে তার ছোট মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, "ছ্যামায় ছ্যামায় থাহে, গায় জ্বর আসে গেছে মনে হয়।"

উপরের বাক্যটির যা অর্থ তা হলো: 'ছায়ায় ছায়ায় থাকে, সম্ভবত গায়ে জ্বর।' এখানে 'গা' অর্থ শরীর এবং যাকে বলা হচ্ছে অর্থাৎ বক্তার মেয়ের নাম অনুপস্থিত রয়েছে। বাক্যটিকে সম্ভাব্য তিনটি স্তরে দেখানো যেতে পারে।

- প্রমিত ভাষার প্রতি সচেতন (শিক্ষিত ব্যক্তি): ছ্যামায় ছ্যামায় থাকে, গায়ে সম্ভবত জ্বর।
- প্রমিত ভাষার প্রতি অতি সচেতন (শিক্ষিত ব্যক্তি): ছায়ায় ছায়ায় থাকে, শরীরে সম্ভবত জ্বর।
- প্রমিত ভাষার প্রতি অসচেতন (শিক্ষিত ব্যক্তি):ছ্যামায় ছ্যামায় থাহে, গায় জ্বর আসে গেছে মনে হয়।

উপরের বাক্য দ্বারা উচ্চশিক্ষিত, শিক্ষিত, মোটামুটি শিক্ষিতদের ভাষা ব্যবহারের পার্থক্যের যে ধারণা তা কিছুটা ভুলের ফসলে ভরে উঠেছে। তার কারণ উপরের বাক্যটি প্রতিটি ক্ষেত্রেই উচ্চশিক্ষিতদের দ্বারা ব্যবহৃত প্রায়োগিক রীতি দেখানো হয়েছে। ভাষার ক্ষেত্রে একটি বড় দিক হলো সামাজিক অবস্থার দিক। বাড়িতে যে ভাষায় একজন শিক্ষিত অথবা উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি কথা বলেন, কর্মক্ষেত্রে কিন্তু সে তা করেন না। 'যে ব্যক্তি উপভাষা অঞ্চল থেকে আগত, তিনি সাধরণভাবে তাঁর কর্মক্ষেত্রে তিনটি ভাষারূপ ব্যবহার করে থাকেন: ক. বাড়িতে আঞ্চলিক ভাষা; খ. সর্ব সাধারণের সঙ্গে প্রচলিত রূপ; গ. শিক্ষার প্রয়োজনে সাধু বাংলা। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, বর্তমানে তৃতীয় ধারার ব্যতিক্রম বিদ্যমান। সাম্প্রতিককালে সাহিত্যে ও পাঠ্য পুস্তকে চলিত ভাষা বহুলভাবে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে সাধুভাষা ক্রমশ বর্জিত হচ্ছে।'[৫]

একটি কথার প্রচলন আছে যে, কুষ্টিয়া জেলার ভাষা ভাল। কুমারখালী কুষ্টিয়া জেলাতে অবস্থিত এবং এক সময় কুমারখালী নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। নদীয়া জেলার ভাষা ভাল। কেউ কেউ বলে থাকেন যে কুমারখালীতে খুব একটা আঞ্চলিক ভাষা নেই। অর্থাৎ কুমারখালীর লোক প্রমিত ভাষায় কথা বলেন। কুমারখালীতে যে আঞ্চলিক ভাষা নেই তার সাথে একমত হওয়া যায় না। আবার কুমারখালীতে এমন লোকও আছেন যাঁরা সত্যিকার অর্থেই চলিত বাংলায় কথা বলেন। উদাহরণস্বরূপ, এমন একটি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামের উদাহরণ দেয়া যায় যে গ্রামের লোকেরা প্রায় প্রচলিত রীতিতে কথা বলেন, গ্রামটির নাম হলো ধর্মপাড়া। এ গ্রামের অধিকাংশ লোক হিন্দু এবং পেশায় 'কুমার'। কুমার অর্থাৎ মাটির পাত্র তৈরির মাধ্যমে এঁরা জীবিকা নির্বাহ করেন। পেশায় কুমার হলেও অনেক উচ্চ বর্ণের হিন্দু অথবা শিক্ষিত মুসলমান থেকে এঁরা ভাল ভাষায় কথা বলেন এবং কথা বলার ধরণ দেখে শিক্ষিত অশিক্ষিত বোঝা যায় না। এবার একটি শব্দের উদাহরণ দেয়া হলো যা শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর স্তরানুযায়ী ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। 'বৃষ্টি' শব্দটির উচ্চারণ কুমারখালীতে নানা ভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন:

মোটামুটি শিক্ষিত লোকেরা বলেন: বিরিষ্টি
শিক্ষিতরা বলেন: বিষ্টি
উচ্চশিক্ষিতরা বলেন: বৃষ্টি

উল্লেখ্য যে, ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভাষার প্রতি সচেতনার দিকটি অবশ্যই বিবেচনায় রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কুমারখালীর শিক্ষিত লোক যারা বাইরে অবস্থান করেন; যেমন, চাকুরি অথবা লেখাপড়ার জন্য কিংবা বৈবাহিক কারণে মেয়েরা অন্যত্র গমন করেন, তাদের মধ্যে ভাষার উচ্চারণ সচেতনতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কুমারখালীতে অনেকেই প্রমিত ভাষায় কথা বলেন। প্রমিত ভাষা বলতে বোঝানো হচ্ছে রেডিও, টেলিভিশন অথবা পত্র-পত্রিকায় যে চলিত ভাষার প্রচলন আছে- সেই ভাষা অর্থাৎ বাংলাদেশে সরকারীভাবে ভাষার যে রকম প্রচলন আছে ঠিক সে রকমভাবে ব্যবহৃত ভাষা। সরকারীভাবে ব্যবহৃত ভাষা যে সবক্ষেত্রে প্রমিতরূপে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ উচ্চারণ ঠিক থাকে তা কিন্তু নয়। বাংলাদেশের টেলিভিশন কিংবা রেডিওতে বাংলা সংবাদ পাঠের সময় যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যেতে পারে। 'গেছে' শব্দটি কোন কোন সংবাদ পাঠক অথবা পাঠিকা পড়ে থাকেন বা বলে থাকেন 'গ্যাছে'। তবে কুমারখালীর শিক্ষিত লোকেরা 'গেছে' শব্দটি 'গেছে' অথবা 'গিয়েছে' বলে থাকেন; 'গ্যাছে' বলেন না। 'গেছে' শব্দটির প্রায়োগিক দিকের একটা উদাহরণ দিলে দেখা যায়:

ক. আবের মারা গেছে।
খ. আবের মারা গ্যাছে।
ক'. আবের মারা গেছে।
খ'. আবের মারা গিয়েছে।

উপরের উদাহরণের ক নং-এ 'আবের মারা গেছে' ভাষার প্রচলিত রূপ। 'গেছে' শব্দটি নাটক, সিনেমা অথবা রেডিও, টেলিভিশনে কখনও কখনও 'গ্যাছে' বলার প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। তবে কুমারখালীতে ক' নং-এ 'গেছে' এবং খ' নং-এ 'গিয়েছে' বলা হয়ে থাকে। মারা যাওয়া অর্থে কখনও বা একাধিক শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কোন সম্মানীত ব্যক্তি মারা গেলে তার নামের পূর্বে 'জনাব' বলা হয় এবং 'মারা' যাওয়া না বলে 'ইন্তেকাল' করেছেন কিংবা 'ইহলোক ত্যাগ' করেছেন বলা হয়। যেমন, 'আবের মারা গেছে' বাক্যে আবের যদি সামাজিকভাবে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয় তাহলে বলা হয়:

- জনাব মোঃ আবের উদ্দিন শেখ ইন্তেকাল করেছেন।
- জনাব মোঃ আবের উদ্দিন শেখ ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

কিন্তু আবের যদি গরীব ও দিনমজুর হয় তাহলে আবেরের সম্পূর্ণ নাম অর্থাৎ মোঃ আবের উদ্দিন শেখ এটাও রক্ষিত থাকে না। তবে শেখ না হয়ে আবের সৈয়দ, মিয়া ইত্যাদিও হতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষিত লোকেরা সাধারণত অশিক্ষিত গরীব লোকদের খুব একটা মর্যাদা দিয়ে কথা বলেন না। বাবার বয়সী কোন লোকের সাথেও 'তুমি' সম্বোধন করে থাকেন। যেমন, 'কামাল চাচা কেমন আছো; তুমি নাকি একটা মুরগী বেচবা?

অর্থাৎ কামালকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে, সে একটা মুরগী বিক্রি করবে কি না? তবে ভাষার ক্ষেত্রে সার্বজনীনতা খুব একটা দেখা যায় না। কোন কোন শিক্ষিত লোক সবাইকেই 'আপনে' বলে সম্বোধন করেন।

আপনে বললে বাক্যটি হবে, 'কামাল চাচা কেমন আছেন; আপনি নাকি একটা মুরগী বিক্রি করবেন? 'আপনি' সর্বনামের সাথে ক্রিয়ার একটা যোগসূত্র দেখা যায়। আপনি বললে বিক্রি করবেন অথবা 'বেচবেন' বলা হয়। বিক্রি করবা কিংবা বেচবা বলা হয় না।

কুমারখালীতে কিছু শব্দ আছে যা ধর্ম,বর্ণ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সবার মধ্যে একই ভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন:
মুনি .....ছেলে/মেয়েকে আদর করে ডাকা হয় অথবা ছোট শিশুকে বলা হয়।
গ্যাদা মুনি.....শুধুমাত্র ছোট শিশুদের বলা হয়।
ছ্যাপ.....থুতু।

'গ্যাদা মুনি'কে কেউ কেউ 'ছোট বাচ্চা' অথবা 'ছোট শিশু' বলে থাকেন। 'ছ্যাপ' শব্দটির ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় গ্রামের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে। তবে কুমারখালী পৌরসভা এলাকা অথবা গ্রামে উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে 'ছ্যাপ' না বলে থুতু বলার প্রবণতা লক্ষণীয়। কখনও বা কাউকে দিয়ে কাজ করানোর উদ্দেশ্যে তাকে বলা হয়, 'মুনি না ভাল, তুমি অবশ্যই কালকে আমার সঙ্গে দেখা করবে।' 'মুনি না ভাল' এমন বাক্য মহিলাদের বলতে শোনা যায়। তবে পুরুষরা যে 'মুনি' বলে না তা নয়। পুরুষদের কথা বলার ধরণ মহিলাদের থেকে কিছুটা অন্যরকম। পুরুষরা সাধারণত ছোটদের সাথে আদেশের সুরে কথা বলেন। 'মুনি না ভাল, তুমি অবশ্যই আগামী কাল আমার সঙ্গে দেখা করবে' বাক্যটি পুরুষেরা বলেন এভাবে, 'মুনি আমার সাথে তুমি কালকে একটু দেখা করো।' তাহলে বাক্য দুটি হলো:

- মুনি না ভাল, তুমি অবশ্যই আগামীকাল আমার সঙ্গে দেখা করবে। (শিক্ষিত মহিলাদের ব্যবহৃত বাক্য)।
- মুনি আমার সাথে তুমি কালকে দেখা করো। (শিক্ষিত পুরুষদের ব্যবহৃত বাক্য)।

আপনে/আপনি, তুমি, তুই, আপনারা, আপনিরা, তোরা, তোমরা ইত্যাদি সর্বনাম কুমারখালীতে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তবে 'তুই' এবং 'আপনি' সর্বনামই বেশি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ইংরেজিতে আপনি, তুমি, তুই-এর ব্যবহার বাংলার মত নেই। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। যেমন: 'Where did you stay in Dhaka?' বাংলায় বাক্যটির অর্থ যা দাঁড়ায় তা হলো:

ক. আপনি ঢাকায় কোথায় ছিলেন?
খ. তুমি ঢাকায় কোথায় ছিলে?
গ. তুই ঢাকায় কোথায় ছিলি?

উপরের উদাহরণে আপনি, তুমি এবং তুই সর্বনাম তিনটি ব্যবহৃত হয়েছে। আপনি, তুমি এবং তুই ব্যবহৃত হওয়ার জন্য ক্রিয়া ব্যবহারের যে বিষয়টি দেখা যাচ্ছে তা হলো, 'ছিলেন', 'ছিলে' এবং

Dhaka University Institutional Repository

'ছিলি'। অর্থাৎ '-এন', '-এ' এবং '-ই' প্রত্যয়ের যোগসূত্র রয়েছে। বাংলায় মর্যাদাসূচক সম্বোধন আছে। সেই মর্যাদার বিষয়টি ভাষার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। সর্বনামের ব্যবহারের ক্ষেত্রে মর্যাদার কিন্তু মাপকাঠি নেই। মাপকাঠি বলতে বোঝানো হচ্ছে যে 'আপনি', 'তুমি' কিংবা 'তুই' কোথায় ব্যবহৃত হবে তা ঠিক করে বলা যায় না। সামাজিকভাবে ভাষার ব্যবহারের তারতম্যের উপর আপনি, তুমি, তুই নির্ভরশীল। তবে একটা বিষয় নিশ্চিত করে বলা যায় তা হলো 'আপনি', 'তুমি' ও 'তুই'-এর ক্ষেত্রে ক্রিয়া ব্যবহারের বিষয়টি সুস্পষ্ট। কুমারখালীর শিক্ষিত সমাজে 'আপনি', 'তুমি' এবং 'তুই'-এর ব্যবহার রয়েছে।

'আপনি, তুমি, তুই/আপনারা, তোমরা, তোরা; তিনি, সে/তাঁরা, তারা, এগুলো নিলে দেখা যায়, আপনি, আপনারা, তিনি/তাঁরা ব্যবহৃত হয় ধনী (এবং বয়স্ক) প্রসঙ্গে, তুমি/তোমরা ব্যবহৃত হয় মধ্যবিত্ত (এবং সমবয়সী) প্রসঙ্গে এবং তুই/তোরা, সে/তারা ব্যবহৃত হয় নিম্নবিত্ত (এবং কমবয়সী) প্রসঙ্গে। ব্যক্তির বুলিভান্ডারে বিভিন্ন প্রকারভেদ নামে, ব্যক্তি অনুসারে একেকটি ব্যবহৃত হয়। সর্বনামের এ ব্যবহার থেকে বোঝা যায় সমাজে কমপক্ষে তিনটি শ্রেণী আছে এবং এতগুলো সর্বনাম থাকার মূলে সমাজের শ্রেণী বিভক্তি। ভাষা সংগঠনে এর প্রভাব আরো কতদূর গড়িয়েছে তা বোঝা যায় সর্বনামের সাথে ক্রিয়ার অন্বয়সূচক বিভক্তি যথাক্রমে সম্মানসূচক, সাধারণ এবং তুচ্ছ বিভক্তি 'উন' '-ও' 'ইস' ইত্যাদি থেকে। উচ্চবিত্তের সাথে শুধু 'আপনি' ব্যবহার করলে হবে না, ক্রিয়া ব্যবহারেও সচেতন হতে হবে। 'আপনি কর' বললে হবে না, বলতে হবে 'আপনি করুন' অর্থাৎ ক্রিয়া ব্যবহারের সময় ব্যক্তির শ্রেণীর কথা মনে রাখতে হয়। সুতরাং বাঙলায় শ্রেণীনিরপেক্ষ কোন ক্রিয়ার ব্যবহার নেই বলা চলে।'[৬]

কুমারখালীতে শিক্ষিত লোকদের ভাষা ব্যবহার ও সম্বোধনসূচক সর্বনাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে বয়স ও অর্থের বিষয়টি সব সময়ই যে বড় রকমের বিষয় হয়ে অবস্থান করে তা কিন্তু নয়। কুমারখালীতে আপনি এবং তুই সর্বনামটি ব্যক্তিক অর্থে বহুলভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। 'আপনি'-এর বহুবচন 'আপনারা' এবং 'তুই'-এর বহুবচন 'তোরা' ব্যবহৃত হয়। 'তুমি' যে ব্যবহৃত হয় না, তা নয়। তবে স্বামী-স্ত্রী অথবা প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে তুমি সর্বনামটি বেশি ব্যবহৃত হয়। 'তুমি' সর্বনামটি কখনো তিরস্কার অথবা বেয়াদবী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, একজন কলেজের বয়স্ক শিক্ষকের সাথে তার একজন ছাত্রের ভাষা ব্যবহার লক্ষ্য করা যেতে পারে।

ক. স্যার, আপনার কাছে আমার একটু দরকার আছে।
খ. মোতাহার স্যার আপনার কাছে আমার একটু দরকার আছে।
গ. স্যার তোমার কাছে আমার একটু দরকার আছে।
ঘ. মোতাহার স্যার তোমার কাছে আমার একটু দরকার আছে।

উপরের 'ক'-নং বাক্যটি কুমারখালীতে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু 'খ', 'গ' এবং 'ঘ'-নং বাক্য তিনটি গ্রহণযোগ্য নয়। শিক্ষকের নাম মোতাহার। কিন্তু ছাত্র শিক্ষকের সামনে শিক্ষকের নাম সরাসরি বলাতে কিছুটা বেয়াদবী হয়েছে। কুমারখালীতে গুরুজনের নাম তার সামনে বলাটা বেয়াদবী। 'গ'-নং বাক্যে শিক্ষকের নাম বলা হয় নি, তবে 'তুমি'র দ্বিতীয় পুরুষ অর্থাৎ 'তোমার' ব্যবহার করায় সম্মান রক্ষিত হয় নি। 'ঘ'-নং বাক্যে নাম এবং 'তোমার' ব্যবহৃত হওয়ায় বাক্যটি গ্রহণযোগ্য হয় নি। অর্থাৎ শিক্ষকের সাথে যে রকম ভাবে কথা বলা উচিত, তা হয় নি। এই না হওয়ার জন্য শিক্ষকের মর্যাদা রক্ষিত হয় নি।

মা-বাবা, চাচা-চাচী, মামা-মামী, বড়ভাই-বড়বোন অথবা পরিচিত গুরুজনেরা ছোটদের যে 'তুমি' বলে সম্বোধন করে না, তা নয়। বরং শিক্ষিত সমাজে 'তুমি' সর্বনামের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। তবে বড়রা কখনও কখনও 'তুমি' সম্বন্ধসূচক সর্বনাম দিয়ে গঠিত বাক্য দ্বারা কাউকে তিরস্কারও করে

Dhaka University Institutional Repository

থাকেন। যেমন, একজন শিক্ষিত বয়স্ক ভদ্রলোক তার ভাই, ভাগ্নে ও ছেলের সাথে কথা বলছেন, কথা বলার সময় বয়স্ক শিক্ষিত ভদ্রলোক কোন একটি বিষয়ের প্রতি তার মতামত ব্যক্ত করলেন, কিন্তু তার ভাই, ছেলে, কিংবা ভাগ্নে তার মতের প্রতি সমর্থন না জানিয়ে তাদের যুক্তি তুলে ধরলো। শিক্ষিত ভদ্রলোক তার ভাই কিংবা ছেলেকে কিছু না বলে ভাগ্নেকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'তুমি বড় প্রবক্তা হয়ে গেছ!' এই বাক্যটি সাধারণ বাক্য নয়, এজন্য যে ভদ্রলোকের ভাগ্নে উচ্চ শিক্ষিত। তাছাড়া ভদ্রলোক আর কাউকে উদ্দেশ্য করে কিছু না বলে একজনের উদ্দেশ্যেই বাক্যটি ব্যবহার করেছেন। এটি একটি তিরস্কারমূলক বাক্য। বাক্যটির কয়েকটি রূপ দেয়া যেতে পারে। যেমন:

ক. তুমি বড় প্রবক্তা হয়ে গেছ!
খ তোমার কথা ঠিক না।
গ. তুমি না জেনে কথাটি বললে।
ঘ. তুমি আন্দাজে কথাটি বললে।
ঙ. তোমার কথা একদম ভুল।
চ. তোমার যুক্তিটা একদম অবাস্তব।
ইত্যাদি।

উপরের উদাহরণে খ, গ, ঘ, ঙ এবং চ-নম্বরের বাক্যগুলি কুমারখালীর শিক্ষিত ভাষাভাষীদের কাছে গ্রহণযোগ্য এজন্য যে বড়রা এরকম ভাষায় ছোটদের সাথে কথা বলতে পারেন। কিন্তু ক-নং বাক্যটি অগ্রহণযোগ্য এজন্য যে বাক্যটি যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে তার মান রক্ষিত হয় নি। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব ব্যক্তিত্ববোধ থাকে, যা তার একান্তই নিজের। ভাষা ব্যবহৃত হয় মানুষের মধ্যে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষার জন্য। ভাষা ব্যবহৃত হতে হতে সামাজিক ভাবে তার ব্যবহার রীতি গড়ে উঠে। এই রীতির সঠিক প্রয়োগই ভাষার সাথে মানুষের গড়ে ওঠা আত্মীক ও প্রায়োগিক সম্পর্ক। যার দ্বারা রক্ষিত হয় 'ব্যক্তিত্ববোধ'। এই ব্যক্তিত্ববোধ রক্ষিত না হলে ভাষার ব্যবহার রীতির গড়ে ওঠা শৃঙ্খলা ঠিক থাকে না। ভাষার ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহার রীতি ঠিক না থাকাই হলো ভাষা প্রয়োগের অগ্রহণযোগ্যতা।

ধনী ও বয়স্ক লোকদের সাথে কথা বলার জন্য কুমারখালীতে বিশেষ কোন সর্বনাম ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না। যেমন, ধনী এবং বয়স্ক লোক কিন্তু সামাজিকভাবে মর্যাদা সম্পন্ন নয়, এমন লোকও কুমারখালীতে বসবাস করেন। এ রকম লোকের সাথে যে সবাই 'আপনি' সর্বনাম ব্যবহার করেন তা কিন্তু নয়। কুমারখালীতে উচ্চশিক্ষিত এবং একই সাথে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের মর্যাদাসম্পন্ন বলে মনে করা হয়। তাই এরকম ভাষাভাষীদের সাথে কথা বলার সময় তুমি/তোমরা ব্যবহৃত হতে খুব একটা দেখা যায় না। বয়সের বিষয়টি সর্বনাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে কুমারখালীতে কোন কোন ক্ষেত্রে অমূলক বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ পিতা-মাতা অথবা অন্য কোন বয়স্ক ব্যক্তি ছোটদের তুমি/তোমরা সম্বোধন করে থাকেন। একই সাথে ছেলেমেয়ে তার বাবা-মাকে অথবা অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে তুমি বলে সম্বোধন করে। এক্ষেত্রে সর্বনাম ব্যবহারের প্রসঙ্গটি বয়স কিংবা সামাজিক শ্রেণীকরণের মানদন্ডে তুল্য হতে পারে না। তবে কুমারখালীতে শিক্ষিত পরিবারে বাবা-মা অথবা অন্যান্য আত্মীয় স্বজন ছোটদের 'তুই' বলে সম্বোধন করেন। কিন্তু ছোটরা বাবা-মা কিংবা আত্মীয়-স্বজনকে কখনও 'তুই' বলে সম্বোধন করেন না। ব্যতিক্রম হলো ছোট শিশুরা যারা ভাষার ব্যবহার জানে না। অর্থাৎ শিক্ষিতরা বড়দের 'তুই' বলে সম্বোধন করে না। কিন্তু আপনি/আপনারা, তুমি/তোমরা সর্বনাম ব্যবহৃত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক শ্রেণীকরণ ভাষার উপর যে প্রভাব ফেলে না, তা নয়। কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে কাকে কোন অবস্থায় কোন পরিবেশে বলা হচ্ছে তাই বড় ব্যাপার। ছকে বাধা নিয়ম অথবা গাণিতিক সূত্র ভাষার ক্ষেত্রে অবাস্তব।

কুমারখালীতে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে 'আপনি করুন' ব্যবহৃত হতে খুব একটা দেখা যায় না। বরং ব্যবহৃত হয় 'আপনি করেন'। 'তুই করিস', 'তুই' সর্বনামের ক্ষেত্রে 'ইস' বিভক্তি সব সময় প্রযোজ্য নয়। কারণ 'তুই কর' বাক্যের ব্যবহার অহরহ হতে দেখা যায়। কুমারখালীতে অতি কাছের বন্ধু যারা, তারা একে অপরকে 'তুই' বলে সম্বোধন করেন। 'বাঙলা সর্বনামের ব্যবহারে সম্ভাষিতের ক্ষমতা-প্রতিপত্তি, সম্পদ বা সম্পদহীনতার ভূমিকা অবশ্যই আছে- একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সর্বনামের ব্যবহার শ্রেণী নির্ভর কখনোই হতে পারে না। একই শ্রেণীর সম্ভাষক-সম্ভাষিতের মধ্যে তিন ধরনের সর্বনাম ব্যবহার অনায়াসেই চলতে পারে। সন্তানের পিতা-মাতাকে ('আপনি' বা) 'তুমি' বলে সম্বোধন করা কোনো শ্রেণীর দ্যোতক নয়, আবার পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে 'তুমি' বা 'তুই' বলে সম্বোধন করলেই তারা মধ্যবর্তী বা নিম্নবর্তী শ্রেণীতে পর্যবসিত হবে না। পিতামাতার শ্রেণীই সন্তানের শ্রেণী। সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের সাধারণ সূত্রে তাই বলে।'[৭]

কুমারখালীর শিক্ষিত লোকদের সামাজিক স্তর বিন্যাসের দিকে নজর দিলে দেখা যায় কুমারখালীতে সামাজিকভাবে যারা পূর্বাবস্থা থেকেই মর্যাদা সম্পন্ন তাদের বেশি সম্মানের চোখে দেখা হয়। সামাজিকভাবে মর্যাদা সম্পন্ন বলতে বংশীয় ও অর্থনৈতিকভাবে সুদৃঢ় ব্যক্তিদের বোঝানো হচ্ছে। অর্থনৈতিকভাবে শ্রেণীবিন্যাস অনেক রকমের হতে পারে। যেমন:

ক. 'ধারেও না ধারায়ও না'। সংসার মোটামুটিভাবে চলে যায় অর্থাৎ আয়-ব্যয় সমান থাকে।

খ. 'ভাল অবস্থা'। সংসারের খরচ বাদে কিছু অর্থ জমা থাকে অর্থাৎ ব্যয় অপেক্ষা আয় কিছু বেশি।

গ. 'অবস্থা বেশ ভাল'। সংসারের খরচ বাদেও প্রতি বছর অনেক অর্থ জমা থাকে অর্থাৎ ব্যয় অপেক্ষা আয় অনেক বেশি।

ঘ. 'কোন রকম চলে যায়'। কিছুটা কষ্টসহকারে সংসারের খরচ চলে কিন্তু ধার করতে হয় না। অর্থাৎ ব্যয় বেশি কিন্তু আয় কম হওয়াতে ব্যয় সংকোচন করে চলতে হয়।

ঙ. 'ধার দিনা করে চলে'। সংসারের খরচের জন্য কিছু টাকা ধার অথবা ঋণ নিতে হয়।

চ. 'কষ্টের সংসার'। ধার অথবা ঋণ নেয়ারও সঙ্গতি থাকে না। অর্থনৈতিকভাবে বেশ দুরাবস্থায় থাকে যে পরিবারের লোকেরা। অর্থাৎ ধার বা ঋণ নিলে শোধ দেয়ার জন্য যে সম্পদের প্রয়োজন তা থাকে না।

ছ. 'খেটে খাওয়া মানুষ'। দিন মজুর অথবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যারা প্রতিদিনের আয়ের উপর নির্ভর করে। প্রতিদিন কিছু আয়-রোজগার না করতে পারলে ঠিকমত খাবারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

জ. 'ফকির শ্রেণী'। ভিক্ষে করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং পারলে মাঝে মধ্যে পরের বাড়িতে কাজ করে।

অর্থনৈতিক বিষয়টি সামাজিক স্তর বিন্যাসের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত না হয়ে পারে না। ভাষার সাথে অর্থের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কুমারখালীর কিছু শিক্ষিত লোক যাঁরা দেশে ভাল চাকরি পায় নি তাঁদের কেউ কেউ মধ্যপ্রাচ্যে চাকরির সন্ধানে গিয়েছেন। মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়ার কারণে তাঁরা কিছুটা আরবি শেখার চেষ্টা করেছেন অর্থাৎ টাকা রোজগার করার জন্য তাঁরা বাধ্য হয়েছেন আরবি শিখতে। ইংরেজির বিষয়টিও একই রকম। ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা হওয়ার জন্য সবাই ইংরেজি

Dhaka University Institutional Repository

শিখতে চায়। ইংরেজি ভাষায় কথা বললে নিজের মর্যাদা কিছুটা বেড়ে যাবে তাও কেউ কেউ মনে করেন। ইংরেজি ভাল জানলে একটা ভাল চাকরি পাওয়া যাবে, এমন কথাও কেউ কেউ বলেন। তবে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অফিস-আদালতে বাংলা ভাষার প্রচলন হওয়ায় বাংলাদেশে বিদেশী ভাষার অবস্থান দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে।

কুমারখালীতে কোন গরীব ঘরের সন্তান শিক্ষিত হওয়ার পরেও ততটা মূল্যায়িত হয় না, যতটা মূল্যায়িত হয় একজন ধনী ঘরের শিক্ষিত সন্তান। এই মূল্যায়িত হওয়া না হওয়ার জন্য ভাষার উপর তার কিছুটা প্রভাব পড়ে। বি.এ. পাশ করে গ্রামে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন এমন একজন শিক্ষিত লোকের সাথে অল্পশিক্ষিত গ্রামের লোকের কথা বলার ধরণ নিম্নরূপ:

ক নং-এর অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে সম্বোধনের ভাষা : মাষ্টার সাহেব ভাল আছেন? (মর্যাদা ভালভাবে রক্ষিত হয়েছে)

খ নং-এর অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে সম্বোধনের ভাষা : স্যার ভাল আছেন? (সম্মানজনক সম্বোধন)

গ নং-এর অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে সম্বোধনের ভাষা : স্যার কেমন আছেন? (অতি সম্মানজনক সম্মোধন)

ঘ নং-এর অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে সম্বোধনের ভাষা : মাষ্টের সাহেব, ভাল আছেন? (মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে)

ঙ নং-এর অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে সম্বোধনের ভাষা : মাষ্টের ভাল তো? (স্বাভাবিক অর্থে, মর্যাদা কিছুটা রক্ষিত হয়েছে)

চ নং-এর অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে সম্বোধনের ভাষা : মাষ্টের কেমন আছ? (স্বাভাবিক অর্থে কিন্তু মর্যাদা রক্ষিত হয় নি)

ছ নং-এর অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে সম্বোধনের ভাষা : কি মাষ্টের কেমন আছ? (তুচ্ছের কাছাকাছি)

জ নং-এর অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে সম্বোধনের ভাষা : কি মাষ্টের নাকি? (তুচ্ছ অর্থে)

সম্বোধনের ক্ষেত্রে ক্রমিক নম্বরের যে বিষয়টি দেখানো হয়েছে তার ব্যতিক্রমও হতে পারে। নিজের ব্যক্তিত্ব ও পরিশ্রমের কারণে ক্রমিক নং জ, ছ কিংবা চ, ক্রমিক নম্বর 'গ' নং-এ পৌঁছলে ধীরে ধীরে তার সাথে কথা বলার ধরণ পরিবর্তন হতে পারে। অর্থাৎ সমাজে তিনি অধিক মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হতে পারেন। আবার ক্রমিক নং 'গ'-এর সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির অবস্থা ক্রমিক নং 'ক', 'ছ' কিংবা 'জ'-এর স্তরে পৌঁছালে তার সাথে কথা বলার ধরনেরও পরিবর্তন হতে পারে।

কখনও দেখা যায় একই পরিবারের আপন ভাই-বোনদের মধ্যেও কথা বলার ধরন রক্ষিত হয় না। চাকরি কিংবা ব্যবসার কারণে ভাই-বোনদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ পরিলক্ষিত হতে পারে। বাড়ির বড় সন্তান কিন্তু ছোট চাকরি করেন অথবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ছোট ভাই-বোনদের কিংবা বাবা-মাকে ঠিকমত টাকা-পয়সা দিতে পারেন না। এ রকম ভাইয়ের সাথে ছোট ভাই-বোন মর্যাদা দিয়ে কথা বলেন না। কখনও দেখা যায় বড়ভাইকে 'তুই' বলে সম্বোধন করা হয়। কিন্তু ঐ পরিবারেই মেজ ছেলে বড় ব্যবসা কিংবা বড় চাকরি করে সে পরিবারের সবাইকেই টাকা-পয়সা দিতে পারেন। এমন ভাইকে ছোটরা বেশ সম্মান করে। 'আপনি' বলে সম্বোধন করে। তাঁকে দেখে অন্যরা ভয় পায়, শ্রদ্ধা করে এবং তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্তের মূল্যায়নও করে থাকে। এক্ষেত্রে আপনি, তুমি কিংবা তুই পরিবার ও বংশকে অতিক্রম করে অর্থের মানদন্ডে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় এবং জটিল মর্যাদার ভাষিক স্তরীকরণ পরিলক্ষিত হয়।

বংশের ব্যাপারটি বর্তমানে মূখ্য না হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখনও বংশীয় পরিচয়ের পূর্বছায়া যে এসে পড়ে না, তা নয়। কুমারখালীর মুসলমানদের মধ্যে সৈয়দ, মিয়া/মিঞা, খন্দকার, খান, মুন্‌শী, শেখ, মন্ডল, সরকার, প্রামাণিক নানা রকমের বংশীয় শ্রেণীকরণ দেখা যায়। কুমারখালীতে বংশীয় বিষয়ে সৈয়দ এবং মিয়ার অবস্থান প্রথম দিকে। সৈয়দ ও মিয়া বংশের লোক ভাল ও সৎ হিসেবে বিবেচিত। সৈয়দ ও মিয়া বংশের যদি কেউ চোর, ডাকাত বা অন্য কোন অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকে, তাহলেও লোকে তাকে বলে ভাল বংশের ছেলে কিন্তু খারাপ লোকের সাথে মেশার কারণে খারাপ হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে কুমারখালীর এলাকার লোকেরা যে বংশের লোকদের ভদ্র হিসেবে মনে করতে চায় না অর্থাৎ 'চাষা-ভুষা' বলে সম্মোধন করে, তাদের ঘরের সন্তান কখনও খারাপ কাজ করলে বলে, 'বংশ দেখতে হবে না? ওদের পূর্ব পুরুষও ভাল ছিল না।' হিন্দুদের সমাজে বংশের বিষয়টি আরও জটিলরূপে অবস্থান করতে দেখা যায়।

হিন্দু সমাজে বংশের সাথে বংশ না মিললে বিয়ে পর্যন্ত হয় না। অর্থাৎ মেয়ে যদি কায়স্থ হয় তাহলে ছেলেকেও কায়স্থ হতে হবে। কখনও কখনও দেখা যায় বংশের কারণে কোন উচ্চশিক্ষিত সুন্দরী মেয়েরও বিয়ে হয়ে যাচ্ছে তার থেকে অপেক্ষাকৃত কমশিক্ষিত ও অসুন্দর ছেলের সাথে। বিষয়টি ছেলের ক্ষেত্রেও একই রকম ঘটে থাকে। হিন্দুদের সমাজে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, পাল, পোদ্দার, ঘোষ, রাজবংশী, মন্ডল, সরকার নানা রকম বংশীয় শ্রেণীকরণ দেখা যায়। মুসলমানদের যেমন আপন ভাই-বোন ব্যতিত চাচাতো ভাই-বোন, খালাতো ভাই-বোন, ফুফাতো ভাই-বোনদের মধ্যে বিয়ের প্রচলন আছে; অর্থাৎ আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ের রীতি আছে, হিন্দু সমাজে তা অনুপস্থিত। তবে ইদানিং কুমারখালীতে হিন্দুদের এই বংশীয় বিষয়টির কিছুটা শিথিলতা চোখে পড়ছে। যোগ্য পাত্র-পাত্রীর স্বল্পতা ও অর্থনৈতিক কারণে বংশীয় রীতি-নীতির বিষয়টি কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাশে থেকে যাচ্ছে। তাছাড়া পূর্বে হিন্দু ঘরের কোন ছেলে অথবা মেয়ে ভিন্ন ধর্মের ছেলে অথবা মেয়ে বিয়ে করলে সে আর তার বাব-মায়ের বাড়িতে উঠতে পারতো না। এমনকি ছেলে মেয়ের এ ধরনের কাজের জন্য পরিবারের অন্যদেরও কষ্ট ভোগ করতে হতো। হিন্দু সমাজের লোকেরা ঐ পরিবারের সাথে কোন যোগাযোগ রাখতো না, কথা বলতো না। তাদের একঘরে করা হতো। বর্তমানে তারও কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। সামাজিক এ সব পরিবর্তন ভাষা ব্যবহারের জগতে বিস্ময়কর প্রভাব ফেলছে। বিস্ময়কর এই প্রভাব হলো, হিন্দু ছেলে অথবা মেয়ে বাবা, কাকা, মাসী, পিসি ইত্যাদি সম্বোধনসূচক সর্বনাম ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু মুসলমানের সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার কারণে আব্বা, চাচা, খালা, ফুফু ইত্যাদি সর্বনাম ব্যবহার করতে সংকোচ বোধ করেন না। বিয়ের কারণে হিন্দুরা মুসলমান সমাজে অবস্থান করলে মুসলমানদের সম্বন্ধসূচক নিয়ম-কানুন মেনে চলেন। কেউ কেউ নতুন ধর্মীয় আচরণও মেনে চলেন। ধর্মীয় আচরণ মেনে চললে তিনি আর হিন্দু থাকেন না। মুসলমান হয়ে যায়। হিন্দুদের ক্ষেত্রে যেমন মুসলমানদের ক্ষেত্রেও বিষয়টি সমভাবে প্রযোজ্য।

কুমারখালীর শিক্ষিত লোকদের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু ধ্বনির উচ্চারণ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, 'জ' ধ্বনি কখনও কখনও 'চ' ধ্বনির মত উচ্চারিত হয়। আবার 'জ' ধ্বনির উচ্চারণ রক্ষিতও থাকে। যেমন:

ক. আজ যাব না।
খ. আচ যাব না।

Dhaka University Institutional Repository

ক নং-এ 'জ' ধ্বনিটি 'চ' ধ্বনির মত উচ্চারিত হয়েছে। 'জ' ধ্বনিটি তালব্য এবং ঘোষ স্বল্পপ্রাণ। অন্যদিকে 'চ' ধ্বনিটি তালব্য এবং অঘোষ স্বল্পপ্রাণ। শব্দ উচ্চারণের প্রতি সচেতন ব্যক্তি ছাড়া অধিকাংশ লোকই 'আজ' শব্দটি 'আচ' উচ্চারণ করে থাকেন। তেমনি,

ক. কাজ করে খাও।
খ. কাচ করে খাও।

উপরের উদহরণে 'ক' নং এর 'কাজ' শব্দটি 'খ' নং-এ 'কাচ' উচ্চারিত হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও 'জ', 'চ' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কুমারখালীর শিক্ষিত লোকদের শব্দ উচ্চারণের যে বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় তাতে 'জ' ধ্বনিটি 'চ' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে উচ্চারিত হয় সহজাতভাবে এবং ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই উচ্চারণের বিষয়টি ভাষাতাত্ত্বিক ছাড়া খুব একটা কারও নজরে আসে না। আবার 'জ' ধ্বনির উচ্চারণ রক্ষিতও থাকে। যেমন:

	'জ' আছে এমন শব্দ	অর্থ
ক.	আজিবর.....	লোকের নাম
খ.	আজাইল.....	গ্রামের নাম
গ.	অজু.....	মুসলমান ধর্ম সংক্রান্ত শব্দ
ঘ.	জবাই	গলা কাটা
ঙ.	জমি	ভূমি

ইত্যাদি।

উপরের উদাহরণে যে, আজিবর, আজাইল, অজু, জবাই এবং জমি দেখানো হয়েছে, তার উচ্চারণ রক্ষিত। অর্থাৎ 'আচিবর', 'আচাইল', 'অচু', 'চবাই', 'চমি' উচ্চারিত হয় না। তাহলে বলা যায় কুমারখালীতে 'জ' ধ্বনিটি অজ্ঞাতবশত কখনও কখনও 'চ' ধ্বনির মত উচ্চারিত হয়। আবার রক্ষিতও থাকে।

শিক্ষিত লোকদের শব্দ উচ্চারণে আরও বৈচিত্র্য আছে। যেমন, 'স্তর' শব্দটি নানাভাবে উচ্চারিত হতে পারে। তবে এখানে উল্লেখ থাকে যে, শিক্ষার যে স্তরীকরণ অর্থাৎ উচ্চশিক্ষিত, শিক্ষিত কিংবা মোটামুটি শিক্ষিতের বিষয়টি উচ্চারণের জগতে সব সময়ই যে প্রভাব ফেলে তা কিন্তু নয়। ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান, যোগাযোগ ও কর্ম উচ্চারণের ক্ষেত্রে বড় রকমের ভূমিকা পালন করতে পারে। কুমারখালীতে সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির উচ্চারণের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। 'স্তর' শব্দটির উচ্চারণের দিকে নজর দেয়া যেতে পারে। যেমন:

ক.	স্তর	প্রমিত রূপ
খ.	ইচ্তর	উচ্চারণ বৈচিত্র্য
গ.	ইছ্তর	উচ্চারণ বৈচিত্র্য
ঘ.	ইস্তর	উচ্চারণ বৈচিত্র্য

ইত্যাদি

উচ্চারণ বৈচিত্র্য থাকলেও কুমারখালীর শিক্ষিত লোকদের ভাষা শিষ্ট বা প্রমিত ভাষার বেশ কাছাকাছি অবস্থান করে এবং কিছু কিছু ভাষা প্রমিতভাষার মতোই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। প্রমিতের মতো ব্যবহৃত হয় সাধারণত অধিক সচেতন ভাষাভাষীর ভাষা। কুমারখালীর ভাষার বিষয়ে যে ধারণা পাওয়া তা হলো, 'সেন রাজাদের সময়ে রাজধানী নবদ্বীপ সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্রস্থল ছিল। নবদ্বীপ নিবাসী শ্রী

Dhaka University Institutional Repository

চৈতন্যদেবের প্রভাবে তাহা বাংলা সাহিত্যের কেন্দ্র হইয়া উঠে। ষোড়শ শতকের চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবনদাস নবদ্বীপ সম্বন্ধে বলিয়াছেন:

নানাদেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়॥
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়॥

এই সময় হইতে নদীয়ার ভাষা বাঙ্গালার সাহিত্যিক ভাষা হইয়া উঠে।[৮] বাংলা ভাষা যা পন্ডিত ব্যক্তিদের কঠোর পরিশ্রমে সাহিত্যের ভাষা বা বইপত্রের ভাষা হয়ে ওঠে তার যে কেন্দ্রীয় শাখা ছিল তা হলো 'কেন্দ্রীয় শাখা- কলিকাতা, হাওড়া, তমলুক ও ঘাটাল (মেদিনীপুর জেলা), নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, কটোয়া মহকুমা (বর্ধমান জেলা)। বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার কথ্যভাষা (যাহা পূর্বে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল)।[৯] কুমারখালীতে এক সময় হিন্দুদের সংখ্যাধিক্য ছিল। কিন্তু ভারত ও পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করায় হিন্দুদের জন্য ভারত এবং মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান এমন ধরনের ভাবাবেগ কাজ করায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বসতি স্থাপনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও মানুষের আবাস স্থলের পরিবর্তনগত চিত্র অনুপস্থিত নয়। এসব কারণে কুষ্টিয়ার তথা কুমারখালী এলাকায় যে সুন্দর ভাষা ব্যবহৃত হতো বা হয়ে আসছিল তার কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেছে। অর্থাৎ যেমন কিছু মানুষ কুমারখালী থেকে অন্য জায়গায় বসতি স্থাপন করেছেন, ঠিক তেমনি কিছু মানুষ কুমারখালীতে নতুনভাবে বসতি স্থাপন করেছেন। মানুষের বসতি স্থাপনের সাথে ভাষা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মানুষ জীবিত ও সুস্থ অবস্থায় যেখানেই যাক না কেন সে ভাষার মতো অমূল্য সম্পদ সাথে নিয়ে যায়। ভাষার শুদ্ধতা/অশুদ্ধতার প্রসঙ্গটি এর সাথে সম্পৃক্ত। কুমারখালীতে ভাষার যে কিছুটা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় তা এই বসতি স্থাপনের সাথে সংযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়।

কুমারখালীতে এমন কিছু শব্দ আছে যা ভিন্ন ভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে এবং এ সব শব্দ কুমারখালীর লোকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন, 'কথা' শব্দটি নানা বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে নানা অর্থ প্রকাশ করে। তবে এখানে উল্লেখ থাকে যে, কখনও কখনও 'কথা' শব্দটি হুবহু ব্যবহৃত না হয়ে কথার অর্থগত রূপটি বাক্যে উপস্থিত থাকে। যেমন:

ক. আস্তে আস্তে কথা।
খ. জোরে জোরে কথা।
গ. চেচা-মেচি করা।
ঘ. সোরগোল করা।
ঙ. ধীরে ধীরে কথা।
চ. চিবিয়ে চিবিয়ে কথা।
ছ. ফিসফিস করা।
জ. চিৎকার করা।
ঝ. কানে কানে কথা।
ঞ. আবোল-তাবোল কথা।
ট. গাঁজাখুরে কথা।
ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

উপরের উদাহরণে ক, খ, ঙ, চ, ঝ, ঞ এবং ট নম্বর বাক্যে 'কথা' শব্দটি হুবহু ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু গ, ঘ, ছ এবং জ নম্বর উদহরণে 'কথা' শব্দটি সরাসরি ব্যবহৃত হয় নি। কিন্তু 'কথা' শব্দটি হুবহু ব্যবহৃত হোক কিংবা না হোক, প্রতিটি ক্ষেত্রে 'কথা' শব্দের উপস্থিতি বর্তমান। 'কথা' শব্দটি কুমারখালীতে ছেলে/মেয়ের নাম হিসেবে ব্যবহৃত এবং সাইনবোর্ডের ভাষায়ও কথার ব্যবহার লক্ষণীয়। কুমারখালী শহরের একটি দোকানের সাইনবোর্ডে লেখা আছে, 'কথা ডায়াগনোসিস সেন্টার'। অর্থাৎ ভাষার একটি শব্দের নানা রকম প্রয়োগ কুমারখালীতে দেখা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

১. ১২৫তম বর্ষ পূর্তি স্মরণিকা (১৮৬৯-১৯৯৪), ১৯৯৪, কুমারখালী পৌরসভা, কুষ্টিয়া, পৃ. ৪২।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭।

৫. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব (দ্বিতীয় সংস্করণ), ১৯৯৭, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা; পৃ. ১৩৯।

৬. রাজীব হুমায়ুন, ১৯৯৩, সমাজ ভাষাবিজ্ঞান, দ্বীপ প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৩২-৩৩।

৭. মৃণাল নাথ, ১৯৯৯, ভাষা ও সমাজ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, পৃ. ৪২।

৮. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলাদেশী বাংলার আদর্শ অভিধান : ভূমিকা, বাঙলা ভাষা (২য় খন্ড), ১৯৮৫, হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২৯০।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২।

Dhaka University Institutional Repository

অশিক্ষিতদের ভাষা

বাংলাদেশ আদমশুমারী (১৯৯১) অনুযায়ী কুমারখালীর জনগোষ্ঠীর শিক্ষিতের হার ধরা হয়েছে ২৪.৯%। এই ২৪.৯% এর মধ্যে পুরুষ ও মহিলা উভয়ই রয়েছেন। তাহলে কুমারখালীর সিংহভাগ জনগোষ্ঠী অর্থাৎ শতকরা ৭৫.১ জন লোকই অশিক্ষিত। অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর জীবন প্রবাহ ও কর্মের উপর অনেকাংশে নির্ভর করছে কুমারখালীর অর্থনীতি, একথা বললে খুব একটা ভুল বলা হয় না। অশিক্ষিত লোকের মুখের ভাষা ও তার ব্যবহারের দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কুমারখালীর ভাষা ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল, তা বললেও সম্ভবত ভুল বলা হবে না। অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ভাষা আলোচনা করতে গিয়ে যে দিকগুলো প্রথমেই এসে যায় তা হলো, ধর্ম ও যৌনগত দিক। কুমারখালীতে অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে যৌনগত যে দিক রয়েছে তা হলো : (ক) পুরুষ এবং (খ) মহিলা। ধর্মগত যে দিক রয়েছে তা হলো : (ক) মুসলমান এবং (খ) হিন্দু।

কুমারখালীর অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ভাষা আলোচনা ও বিশ্লেষণের পূর্বে কুমারখালীর উপভাষাগত অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা নেয়ার আবশ্যকতা রয়েছে। শিক্ষিত ভাষা-ভাষীদের মধ্যে যেমন ভাষা প্রমিতকরণ রূপের প্রয়োগ-রীতি লক্ষ্য করা যায়, অশিক্ষিত লোকদের ভাষা প্রয়োগরীতিতে তা অনুপস্থিত থাকে। প্রমিত ভাষার বিষয়টা কি তা আদৌ অশিক্ষিত লোকেরা বোঝেন না বা জানেন না। এই না বোঝার বা না জানার কারণ হলো তাঁরা স্কুলে গিয়ে লেখা-পড়া করেন নি। পাঠ্যপুস্তকের ভাষার সাথে অশিক্ষত লোকদের পরিচয় থাকে না।

তবে এমন কিছু সংখ্যক অশিক্ষিত লোক কুমারখালীতে আছেন যাঁরা সামাজিক ভাবে বেশ মর্যাদা সম্পন্ন। তাঁরা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এঁদের ভাষা ব্যবহার যথেষ্ট মার্জিত ও সমাজ রীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। 'সমাজে বাস করতে হ'লে ব্যবস্থার সাথে খাপ্ খাইয়ে নিয়ে যে ভাষার ব্যবহার করা প্রয়োজন, সে-ভাষাই সামাজিক ভাষা। এর উল্টোটার নাম হ'ল অসামাজিক ভাষা। 'অসামাজিক-ভাষা' ব্যবহার করে সমাজে বাস করা যায় না-একথা বোধ হয় না বল্লেও চলে। আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা এমনই যে, এতে বয়সের প্রশ্ন, মান-মর্যদার প্রশ্ন, ব্যক্তিগত সম্বন্ধের প্রশ্ন, শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম-কর্ম প্রভৃতি কত কিছুর প্রশ্ন যে জড়িয়ে আছে, তার কোন সীমা নেই। সমাজের এ-সব অবস্থার কথা মেনে নিয়েই ভাষার ব্যবহার করতে হয়। নতুবা সমাজে বাস করা কঠিন। আমরা সমাজের এত সব দাবীকে সন্তুষ্ট ক'রে যে ভাষা ব্যবহার করি তাকেই 'সামাজিক ভাষা' ব'লে উল্লেখ করতে পারি।'[১]

মানব শিশু যে সমাজে জন্ম গ্রহণ করে, যে ভাষিক এলাকায় বেড়ে ওঠে, শিশু সে এলাকার ভাষা আয়ত্ত্ব করে থাকে বা শিখে থাকে। ভাষা শেখার পাশা-পাশি সমাজের রীতি-নীতিও শিশু শিখে থাকে। ভাষা শেখার পাশা-পাশি সমাজের রীতি-নীতি শিশু শিখে থাকে বড়দের কাছ থেকে। লেখাপড়ার বা শিক্ষার যে চারটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে, শিশু তার দুটি নিজে নিজেই সমাজ থেকে আয়ত্ব করে থাকে। শিক্ষার চারটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো:

ক. শোনা
খ. বলা

Dhaka University Institutional Repository

গ. পড়া এবং
ঘ. লেখা।

তাহলে অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী বলতে শিক্ষার দু'টি বিষয় সম্বন্ধে যাঁরা অজ্ঞাত থাকেন, তাঁদের বোঝানো যেতে পারে। শিশু বড় হয়ে একদিন সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয় অথবা সিদ্ধান্ত দেয়। সিদ্ধান্ত নেয়া বা দেয়ার সাথে যা জড়িত, তা হলো তার মেধার তীক্ষ্ণতা ও বুদ্ধির বহিপ্রকাশের রূপায়ন। ভাষার মাধ্যমে মানুষের মননের প্রতিফলন ঘটে থাকে। ভাষাকে মানব মনের দর্পনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। মানুষের মননের অপরিস্ফুটিত রূপটি শিক্ষার ছোঁয়ায় বিকাশ লাভ করে থাকে। অশিক্ষিত ভাষাভাষী শিক্ষার যে দুটো দিক সম্বন্ধে জ্ঞাত তা হলো:

ক. শোনা এবং
খ. বলা।

ভাষার ক্ষেত্রে শোনার সাথে বোঝার একটি সম্পর্ক আছে এবং বলার সাথে বোঝানোর বিষয়টি জড়িত। যে শিশু জন্মের পর থেকে-

গ. পড়া এবং
ঘ. লেখা

সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে সম্মক ধারণা না পেয়ে বড় হয়েছে অর্থাৎ অশিক্ষিত রয়ে গেছে, তাদের ভাষা বিশেষ ভাবে সমাজ নির্ভর ও এলাকা নির্ভর হয়ে থাকে। এদের ভাষা থাকে অনেকাংশেই অবিকৃত। পৃথিবীর প্রতিটি ভাষা-ই এক একটি উপভাষা। এলাকা নির্ভর কোন উপভাষা-ই হয়তো বা কোন দেশের সরকারী কাজে ব্যবহৃত হয়ে মান ভাষার মর্যাদা পেয়ে থাকে, অথবা দেশের বা রাষ্ট্রের কাজ চালানোর জন্য কোন একটি উপভাষাকে বেছে নিয়ে তাকে একটু ঘষা-মাজা করে মান ভাষায় উন্নীত করা হয়ে থাকে।

অশিক্ষিত ভাষা-ভাষীরা সাধারণত মান ভাষা বা শিষ্ট ভাষার ব্যাপারে খুব একটা সচেতন নয়। তাঁরা তাঁদের এলাকার ভাষা-ই সাধারণত ব্যবহার করে থাকেন। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, 'কোন দেশে বা অঞ্চলে চলিত বা প্রচলিত ভাষার পাশাপাশি এক বা একাধিক আঞ্চলিক বা উপভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চলিত ভাষার সঙ্গে উপভাষার সামাজিক ব্যবধান রূপমূল ও ব্যাকরণগত কাঠামোয় লক্ষ্য করা যায়। চলিত ভাষার স্বরাঘাত, উচ্চারণ বা রূপমূল গঠনে যে প্রকৃতি বিদ্যমান, উপভাষায় তার ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। সাধারণ ভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রচলিত ভাষায় ভাষাভাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে অথবা ভৌগোলিক ব্যবধান, সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসগত পার্থক্যের জন্যে উপভাষার সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে চলিত ভাষা সর্বস্তরে ব্যবহৃত হয় এবং লিখিত পদ্ধতির ক্ষেত্রেও অনুসৃত হয়ে থাকে। অন্যদিকে, উপভাষা অঞ্চল বিশেষে চলিত ভাষার স্থান দখল করে। ভৌগোলিক বা সামাজিক ব্যবধানের জন্য একটা অঞ্চলে একাধিক উপভাষা গঠিত হতে পারে এবং অঞ্চল বিশেষের উপভাষার মধ্যে ধ্বনি বা রূপমূল গঠনে পার্থক্য দেখা দিতে পারে।[২] তাহলে যাঁরা অশিক্ষিত তাঁরা এলাকাগত ভাষা অর্থাৎ উপভাষা ব্যবহার করেন, তাঁদের ভাষা ব্যবহারেও পার্থক্য দেখা দিতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

কুমারখালী বর্তমানে কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত। কুমারখালীর উপভাষার বিষয়ে যে ধারণা পাওয়া যায় তা হলো, 'ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগে ভাষাবিদ পন্ডিত Sir G. A. Grierson-এর সম্পাদনায় ভারতীয় উপমহাদ্বীপের ভাষাগুলির বিবরণী The linguistic Survey of India নামক গ্রন্থাবলীতে ১৯০৩ হইতে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ঐ সময়ে দেশে ভাষাবিজ্ঞান বা ধ্বনিবিজ্ঞানের আলোচনা মুষ্ঠিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং বিবরণী সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানসম্মত হয় নাই। যাহা হউক ব্রিটিশ সরকারের কীর্তি এই ভাষা বিবরণীই আমাদের উপভাষা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের একমাত্র সোপান না হইলেও আমাদের প্রধান অবলম্বন। নানা অবশ্যম্ভাবী ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও গ্রিয়ার্সন সাহেবের অবদান আমাদের চিরস্মরণীয়। তিনি বাংলা ভাষার উপভাষাগুলিকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভেদে প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পাশ্চাত্য বিভাগের উদীচ্য শাখার বিরাজভূমি হিসাবে তিনি দিনাজপুর, পূর্ব মালদহ, রাজশাহী, বগুড়া এবং পাবনা জেলাগুলিকে গণনা করিয়াছেন। এগুলি এখন বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত। রাজবংশী বা রংপুরী শাখা রংপুর, জলপাই গুড়ি (পশ্চিমবঙ্গ), গোয়ালপাড়া (আসাম) ও কোচবিহারে (পশ্চিমবঙ্গ) প্রচলিত। বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার কথ্যভাষা পাশ্চাত্য বিভাগের কেন্দ্রীয় শাখার।[৩]

'পাশ্চাত্য বিভাগ:

ধ্বনিতত্ত্ব। মহাপ্রাণ ঘোষবর্ণ, চ বর্গ, ড়, ঢ়, আদি হ এই সকলের প্রকৃত উচ্চারণ রক্ষিত। শ, য, স স্থানে (কয়েকটি যুক্ত ব্যঞ্জন ভিন্ন) শ উচ্চারণ।

রূপতত্ত্ব কর্মকারকের এক বচনে ক, কে। অতীতকালের প্রথম পুরুষের সকর্মক ক্রিয়ার 'এ' বিভক্তি—সে দিলে ইত্যাদি। (আসামী ভাষাতেও এই রূপতত্ত্ব আছে) ভবিষ্যৎ কালের প্রথম পুরুষ বে।

কেন্দ্রীয় শাখা—কলিকাতা, হাওড়া, তমলুক ও ঘাটাল(মেদিনীপুর জেলা), নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, কাটোয়া মহকুমা (বর্ধমান জেলা)। বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার কথ্যভাষা (যাহা পূর্বে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল)। এই শাখা ভুক্ত। এখানকার কথ্যভাষায় পাশ্চাত্য বিভাগের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি বিদ্যমান।[৪]

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে The linguistic Survey of India প্রকাশিত হতে থাকে, এখন থেকে ৯৭ বৎসর পূর্বে উপভাষা জরীপ সংক্রান্ত এ মহামূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়া শুরু করেছিল। বর্তমানে কুমারখালী কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত (যা পূর্বে নদীয়া জেলার অর্ন্তভুক্ত ছিল)। কুমারখালীর ভাষা যথেষ্ট শ্রুতিমধুর ও চলিত ভাষার মত। তবে কুমারখালীর ভাষায় আঞ্চলিকতার বিষয়টি যে একেবারেই নেই তা বলা যায় না। আর এই আঞ্চলিকতা ফুটে ওঠে অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ভাষায়। কুমারখালীর ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে দিকটি লক্ষ্য করা যায়, তা হলো কুমারখালীকে পৃথক করেছে গড়াই নদী। গড়াই নদীর যে পাড়ে পৌর এলাকা অর্থাৎ শহর, শহর বাদে অন্য যে সব গ্রাম বা মৌজা রয়েছে, সে সব এলাকার ভাষায় আঞ্চলিকতা বেশী পরিলক্ষিত হয়। কুমারখালীর শহর সংলগ্ন একটি মৌজার নাম হলো দূর্গাপুর। দূর্গাপুরের অশিক্ষিত লোকদের ভাষা ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তাঁরা কুকুর কে 'কত্তা/কুত্তে','কেঁচো'কে 'কেচে', 'যেতে পারবো না'কে 'যাবার পারবো নানে/য্যারের পারবো নানে' ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন। তবে গড়াই নদীর অপর পাড়ের লোকদের ভাষা চলিত ভাষার কাছা-কাছি। নিচে কুমারখালীতে ব্যবহৃত হয় এমন শব্দ যা কুমারখালীর আঞ্চলিকতা নির্দেশ করে, তার কিছু উদাহরণ দেখানো হলো। একই সাথে শব্দের বা শব্দগুচ্ছের অর্থ প্রচলিত ভাষায় দেয়া হলো।

Dhaka University Institutional Repository

কুমারখালীর আঞ্চলিক শব্দ	অর্থ	কুমারখালীর আঞ্চলিক শব্দ	অর্থ
দ্যাহো	দেখ	উটপি	উঠবে
ক্যাম্মা/ক্যাম্বা	কেমন	নাত্রি	রাত্রি
হতিহতি	হতে হতে	হবিনানে	হবে না
খালে গেছে	আঁচড় লেগেছে	ক্যা	কেন
তাইতি	সেজন্য	ছাওয়াল-পাল	ছোট ছেলে-মেয়ে
হয়া	হয়ে	ইয়ারকি মারে	দুষ্টুমি করে
অ্যাকমোত্তরে	খুব তাড়াতাড়ি	কাঁদাস	কাঁদানো
হেনে	এখানে	যাহ্	যাও
নুন চাকতি ডাকতেছে	তরকারীর লবন দেখার জন্য ডাকছে	কিডা	কে
টাহা	টাকা	মারেছে	মেরেছে
থাহে	থাকে/আছে	চুলো	চুলা
খ্যায়া খ্যায়া ব্যাঙ হয়ছে	খেয়ে খেয়ে মোটা হয়েছে	আচকে	আজকে
দি আইগা	দিয়ে এসো	ধুয়ে	ধোয়া
ধত্তি		দিলি	দেয়া
যাবিনি	যাবে/যাওয়া	দিয়াসতি	দিয়ে-আসা
কইছিলাম	বলেছিলাম	থাল	প্লেট
উটকোচ্চে	খুঁজছে	পাত্তিছিনে	পারছিনে
শন্যি	শূন্যে	চেন্ন	চিহ্ন
নড়ি/লড়ি/নটি	লাঠি	পিসাদ্দেছে	চাপ দিয়েছে
লো	মেয়েলি সম্বোধন	পার	উপর
কাল	আগেরদিন/পরের দিন	কয়ডা	অল্প
কি হাল করে	কি রকম করে	ব্যাল	বেল
রাদিছিলাম	রান্না করেছিলাম	দ্যাহলাম	দেখলাম
খা	খাও	ঠ্যাকাবি	ঠেকানো/ঠেকাবে
হেনে	এখানে	ভরা	সম্পূর্ণ
কোনে	কোথায়	শাগ	সবজি
তাও	তবুও	যন্তোনা	ঝামেলা
প্যাটের	পেটের	জালানো	দুষ্টুমি করা
ধুপি পিটে	ভাঁপা পিঠা	ফুল আলা	ফুল ওয়ালা
বয়গা	বসগে	হইছে	হয়েছে
মেছেক	মিছাক(দাঁত পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত হয়)	পালাম	পেলাম
নিয়াইছেরে	নিয়ে এসেছে কি না	ঘাটা	ঘন্টা
বসার ঢক	বসবার ধরণ	খাতি	খেতে
গিলাশ	গ্লাস		

Dhaka University Institutional Repository

কুমারখালীর আঞ্চলিক শব্দ	অর্থ	কুমারখালীর আঞ্চলিক শব্দ	অর্থ
বাটি মাটি	বাটি ও অন্যান্য থালাবাসন	বইছে	বসেছে
কুকরো/কুকড়ো	মোরগ-মুরগী	কোনে	কোথায়
দৌড়ি	দৌড়ে	রয়ছে	রয়েছে
যাওয়াজ্জো	যাওয়ার মত	খাবিনানে	খাবে না
বচ্চেন	বুঝেছেন	দে	দাও
কোনে	কোথায়	জন্যি	জন্য
পরভাতে	শেষ রাতে/সেহরির সময়	কিডা	কে
কুশর	আখ	অ্যাহলাই	একাই
গুদো	ধানের চিটা	উড়োনে	উড়ানো
মানষির	মানুষের	নতা	লতা
সেগুন	সেগুলো	থাহে	থেকে/থাকে
খুপ	খুব	নাদা/রাদা	রান্না
মুদিন	ভেতরে/মধ্যে	গাঙ	নদী
খায়া	খেয়ে	এ্যাট্টা	একটা
ওলো	মেয়েলি সম্বোধন	কই	কোথায়
কত্তেছে	করছে	খাড়া	দাঁড়ান
আহারে	দু:খ সংক্রান্ত উক্তি	ছ্যামা	ছায়া
হাল করা	বিরক্ত করা	হ্যালা হ্যালা	একা একা
ভাত যা টানবিনি	ভাত বেশী খাবে	কতা	কথা
রাদেছে	রান্না করেছে	কচ্ছে	বলছে
জামা	শার্ট	জাগা	জায়গা/স্থান
আগলা	আলগা	চোহি	চৌকি
থাহলো	থাকলো	থো	রাখা/রাখ
ছিড়া মিড়া	ছেঁড়া বস্ত্র/জিনিস	গ্লাস-ম্লাস	গ্লাস-বাটি
খাবানা	খাবে কি না	ব্যাড়ে বোনে	মারবোনে
ঢালতিছির	ঢালছে	যায়া	গিয়ে
নাপঝাপ/লাবটাব	লাফঝাপ	পাহা	পাকা
থুয়ে	রেখে	জারো	দুষ্টু/শয়তান
ভোল/ভৌল	তামাশা	শুকোবিনানে	শুকাবে না
মাজে	মেজ	কল্লো	করলো
শ্যাষ	শেষ	আসপি	আসবে
কুনায় কুনায়	কোনে কোনে	কয়	বলে
কতায় কতায়	কথায় কথায়	নাহি	নাকি
আসপিনানে?	আসবে না	খাবি	খাবে
তাওয়ামুহো	তাওয়ার মতো মুখ	য্যাতো	যত
বহেক	বকেক/বকা	পাচ্ছিনে	পারছিনে

Dhaka University Institutional Repository

কুমারখালীর আঞ্চলিক শব্দ	অর্থ	কুমারখালীর আঞ্চলিক শব্দ	অর্থ
সুমোর	সময়/একসাথে	ছুলা	ছোলা
মালকুচা	আঁটোসাঁটে কাপড় পরা	রানতি	রাঁধতে
কামই	অনুপস্থিত	পারলি	পারলে
তুলবিনি	তুলবে	ইটু	একটু
ওক্করে	কবরে	নুজা	রোজা
হাবাতে	পেটুক	আহুনু	এখনো
অচামিতি	বিনা কারণে	কাম	কাজ
মাত্তি	মারতে	গ্যালো	গেল
শয্য	সহ্য	কট্টি	কতগুলো
ক্যা	কেন	সপ	সব
ক্যামমো	কেমন করে	অ্যাড়ে	এঁড়ে
ব্যাড়ায়	বেড়ায়	আইছে	এসেছে
খুচ্চো	ভাঙ্গানো/খরচা	অপিস	অফিস
দিলি	দিলে	কচ্ছি/কচ্চি	বলছি
থাকতি	থাকতে	ভদ্দিন	সারাদিন
বিষ্টি/দ্যাওয়া	বৃষ্টি	গবগব	মুষলধারে
পারবোনানে	করবো না/পারবো না	বুচতি	বুঝতে
নাবে	নেমে	হবি	হবে
আলি	এলি	থাহা	থাকা
খ্যায়া	খেয়ে	দেহলি	দেখলে
উটে	উঠে	প্যান	প্যান্ট
বুজেগিছি	বুঝতে পেরেছি	কুহুর/ কুত্তে/কুত্তা	কুকুর
কইছিলাম	বলেছিলাম	পানশো	স্বাদহীন
ব্যাল	বেল	অ্যাতো	বেশী/এত
অ্যাতো	এত	অ্যাহুন	এখন
পাতে	খাবারযুক্ত প্লেট	বাল	বাল্ব
দিবাইতো	দেয়া উচিত	মুদিন	ভেতরে
কত্য-বাত্তারা	গল্প-গুজব	নাগে	লাগে
তুরা	তোরা	থোন	রাখেন
ল্যাকতেছে	লিখছে	ফন্দি/ফুন্দি	কায়দা/কানুন
দ্বারে	দুয়ারে	বানতি	বাঁধতে
পাল্লাম	পারলাম	ওকেনে	ওখানে
কবো নানে	বলবো না	কইচোল	ঝামেলা (মেয়েরা বলে)
শুমোদ্দি	স্ত্রীর বড় ভাই/গালি দেয়ার শব্দ (পুরুষের ক্ষেত্রে)	কিদো	কি যেন (মেয়েরা বলে)

Dhaka University Institutional Repository

কুমারখালীর আঞ্চলিক শব্দ	অর্থ	কুমারখালীর আঞ্চলিক শব্দ	অর্থ
গুডাদু/গুটাদু	অল্প	উচো	উঁচু
এট্টু	একটু	জন্তনা	যন্ত্রণা
জ্যাম্মা-শ্যাম্মা	যেমন-তেমন	কত্তেছে	করছে
দেকি	দেখি	রইছে	রয়েছে
এ্যাকবারে	একসঙ্গে	তফাত	দূরে
জাগা	জায়গা/ঘুম ভাঙ্গানো	ভাতার	স্বামী
গুছাগুছো	গোছগাছ করা	গ্যাদা	ছোট
শেনতে	সেখান থেকে	আরাটা	আরেকটা
মাটমাটে কল্লি	এলোমেলো করলে	ব্যপসা	ব্যবসা
নাতি	লাথি	টুক করে	চুপিসারে
বুজাই	অনেক/বেশি	আশপদ্দা	সাহস
কয়ডা বাজে	কত বাজে	শ্যাবে	সব
মজার	সুন্দর	কত্তাম	করতাম
মাতব্বর	গ্রাম্য-প্রধান	ফুকচি/ফুকছি	উঁকি
কবো	বলবো	বহিচি	রাগ করেছি
ব্যাতা	ব্যথা	হুড়পাড়	তাড়াতাড়ি
প্যাট	পেট	কোন	কোথায়
ঘাতোনি/ঘুতোনি	মারধর	মুড়ো	শেষ
কোলো	বলল	ছুটা/সুডা	সোডা
তারিক	তারিখ	চহরা-বহরা	নকশা করা
ন্যাওট	ঘোরা(বৃত্তাকারে একবার)	নুচ্চো	লম্পট
মান্নি	মান্য	আরাগ	আরেক
ত্যায়গা-শিনগা	তারপর	ওন্না/উওরনা	তার না
খুতি	থলে	খান্টেক	অল্প/একটু
পন্ত	পর্যন্ত	নিলে বুজিনে	ধরণ বুঝিনে
কোন	কোথায়	পিসার	প্রেসার
পুশকনী	পুকুর	জুলা	কারিগর
শিয়েল	শিয়াল	হোনে	ওখানে
শিশি	বোতল	দুপোর	দুপুর
চেরাগ/চ্যারাগ	প্রদীপ/বাতি	চিয়ার	চেয়ার
ছাতি	ছাতা	জষ্টি	জ্যৈষ্ঠ
বাগ	বাঘ	ভাদোর	ভাদ্র
খ্যাতা	কাঁথা	কাহর	কাঁকর
পুহা	পোকা	ব্যতা	ব্যথা
বাগুন	বেগুন	ল্যাপ	লেপ
ডালি	ঝুড়ি	ঠান্টা	ঠান্ডা

Dhaka University Institutional Repository

কুমারখালীর আঞ্চলিক শব্দ	অর্থ	কুমারখালীর আঞ্চলিক শব্দ	অর্থ
গাবলা	গামলা	মিত্যে	মিথ্যা/মিথ্যে
শলা	ঝাটা	পিজ	পিঁয়াজ
কোবরেজ	কবিরাজ	বদনী	বদনা
ইচে	চিংড়ি	ইস্কুল	স্কুল
ব্যাত	বেত	গোশত	মাংস
জ্যাটটুক	যতটুকু	মিত্যে/মিত্তে	মিথ্যে
নে লো	নিতে বলা (মেয়েলি সম্বোধন)	কইছি/কইচি	বলেছি
নাগানো	লাগানো	রে লো	মেয়েলি সম্বোধন
কলাম	বললাম	কবো নানে	বলবো না
কইচোল (মেয়েরা বলে)	ঝামেলা	কিদো (মেয়েরা বলে)	কি যেন
গুডাদু/গুটাদু	অল্প	উচো	উঁচু
দ্যাহেন/দ্যাকেন	দেখেন	এদ্যা	এ দেখ
নাহি	নাকি	লেকতি	লিখতে
মাজা/মাজে	ধোয়া/পরিস্কার করা	চুচা	খোসা
নিয়াই	আনো/আনা	কবো	বলবো
নিবা	নেবে কিনা	কুটি	ছোট
যাস	যাওয়া/যাবে	ফ্যালা	ফেলে
দিয়াইছিস	দিয়ে এসেছে কি না	ডা/ডে	টা
বদলাতি	পরিবর্তন করা	বেল	বেল্ট
যাচ্চির/যাচ্ছিস	যাচ্ছ/যাওয়া	গুতো	খোঁচা/আঘাত
কাদা/ক্যাদা	কাদা/ভেজা মাটি	কাবু	চিকন
ডাহেন	ডাকেন	সুমায়	সময়
আলগোচে	চুপিসারে	জুয়ান	যুবক/যুবতী
ও যে	ঐ যে	কাচ	কাজ
তয়গা/ত্যায়গা	তারপর	মাপ	মাফ
মাজে-সাজে	মাঝে-মধ্যে	ছ্যাপ	থু তু
গরিপ	গরিব	নাগ	রাগ
কিরাসিন	কেরোসিন	কয়টাহার	কত টাকার
কামকাজ	বিয়ে সংক্রান্ত	এই তোরে	এ দিকে
কতি	বলতি	পাননে	পারিনে
লেকক/লেকক	লেখক	টপকরে	তাড়াতাড়ি
আনকো	অচেনা/অপরিচিত	আজুড়ে	শুধু(খারপ অর্থে)
খ্যাড়	খড়	চুনোমাছ	ছোট মাছ
আজুড়ে	শুধু/এমনিতে	পত	পথ/রাস্তা
ছ্যাড়া	ছেলে	খ্যাড়	খড়

Dhaka University Institutional Repository

কুমারখালীর আঞ্চলিক শব্দ	অর্থ	কুমারখালীর আঞ্চলিক শব্দ	অর্থ
ছেড়ি	মেয়ে	কওয়া	বলা
বিলেয়	বিড়াল	তবন	লুঙ্গি
চুকশা	মালসা	বিছেন	বিছানা
সুবরি	গুপারি	কুষ্টা	পাঠ
কুষ্টে	কুষ্টিয়া	মশোরি	মশারি
হুড়ুম	মুড়ি	হাশেল	রান্নাঘর
ম্যাজ	ম্যাচ	ফেসারি	খেসারি
বোরই	কুল	তামান দিন	সারা দিন
কদু	লাউ	মামু	মামা
কুশর	আখ	মামানী	মামী
নিয়ের	কুয়াশা/শিশির	পাখি/পক্কী	পাখি
আটি/বিচি	বীজ	ঘুড়া	ঘোড়া
খাজর	খেজুর	মাটেল	ডোবা
আমশবরি	পেয়ারা	খোপ	রুম
দোহান	দোকান	পিটে	পিঠা
কাহই	চিরুণী	ত্যাল	তৈল
ঝাল	মরিচ	মিরকে	মৃগেল
কুমোরখালী	কুমারখালী	গাড়	ফোঁড়া
পানিটিশে	পানি পিপাসা	লোগ	নখ
চৌত	চৈত্র	নিড়েন	নিড়ানি
ম্যাগ	মেঘ	জানলা	জানালা
অ্যাকুন	এখন	কামে	কাজে
পুযিনি	পূর্ণ হয় নি/কম পড়েছে	নাত/লাত	রাত
সরা/চাপিন/ঢাকুন	ভাতের হাঁড়ির মুখে দেয়া ঢাকনি	ঠিলে	কলস
মানা/বারন করা	নিষেধ করা	হ্যালাহ্যালা	একা একা
বহন/বকন বাছুর	মেয়ে বাচ্চা (গরু)	চেনি	চিনি
নোদ	রোদ/সূর্যের আলো	আদার	অন্ধকার

উপরে যে সব শব্দ বা শব্দগুচ্ছ দেখানো হয়েছে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া কুমারখালীর অশিক্ষিত লোকেরা প্রতিনিয়ত ব্যবহার করে থাকেন। কুমারখালীর কৃষ্ণপুর গ্রামের অশিক্ষিত লোকেরা যে ভাষায় কথা বলেন তার কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো; যেমন-

ক. হ্যালো হ্যালো কতা কচ্চে।
অর্থ : একা একা কথা বলছে।
খ. এই ছ্যাড়া কোন যাচ্ছিস?
অর্থ : এই ছেলে কোথায় যাচ্ছিস?
গ. খ্যায়া খ্যায়া ব্যাঙ হয়ছে ।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : খেয়ে খেয়ে মোটা হয়েছে।
ঘ. পেপো খাবি?
অর্থ : পেঁপে খাবি?
ঙ. কাম সারা হয়ছে?
অর্থ : কাজ শেষ হয়েছে?
চ. খাতি বইছে/ বইছে কোন দ্যাহো?
অর্থ: দেখ তো কোথায় খেতে বসেছে?
ছ. আজুড়ে কামে কতি যাব ক্যা?
অর্থ: শুধু শুধু বলবো কেন?

উপরের ক, খ, গ, এবং ছ নম্বরের উদাহরণের বাক্যগুলো সাধারণত মহিলারা ব্যাবহার করে থাকেন। ঘ, ঙ এবং চ নম্বরের উদাহরণের বাক্যগুলো পুরুষ ও মহিলা উভয়েই ব্যবহার করেন। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে এলাকার পার্থক্যের কারণে অর্থাৎ অঞ্চলগত পার্থক্যের কারণে ভাষা ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিতে পারে। যেমন,

ক. আমা বাড়ি য্যাবের চাইছিলে।
র্ক. আমা বাড়ি যাতি চাইছিলে।
অর্থ: আমাদের বাড়িতে যেতে চেয়েছিলে।

খ. দাদা আম দিলে।
র্খ. দাদা আম দিল।
অর্থ: দাদা আম দিল।

উপরের ক এবং খ নম্বরের উদাহরণের বাক্য দু'টি কুমারখালীর মালিয়াট, দূর্গাপুর ইত্যাদি অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। র্ক এবং র্খ বাক্য দু'টি মধুপুর, পান্টি, কৃষ্ণপুর ইত্যাদি এলাকায় ব্যবহৃত হয়। গড়াই নদীর একপাশে অর্থাৎ শহরের পাশের এলাকা হলো মালিয়াট, দূর্গাপুর ইত্যাদি এলাকা। গড়াই নদীর অপর পাশে মধুপুর, পান্টি ও কৃষ্ণপুর ইত্যাদি এলাকা। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে গড়াই নদীর যে পাড়ে পৌর এলাকা অবস্থিত নয়, সে এলাকার জনগোষ্ঠির ভাষা অপেক্ষাকৃত বেশি চলিত ভাষার কাছা-কাছি। অন্যদিকে পৌর এলাকা ছাড়া পৌর এলাকার পাশের বড় অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর ভাষায় আঞ্চলিকতার ভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়।

অতীতকালের প্রথম পুরুষের সকর্মক ক্রিয়ার 'এ' বিভক্তির বিষয়টি গড়াই নদীর যে পাশে পৌর এলাকা অবস্থিত সে এলাকার গ্রাম্য পরিবেশের জন্য প্রযোজ্য। কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে শহরের অশিক্ষিত ও শিক্ষিত ভাষা-ভাষী যারা ভাষা ব্যবহারের প্রতি সচেতন নয়, তাদের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু গড়াই নদীর অপর পাশের জনগোষ্ঠীর জন্য প্রযোজ্য নয়। র্ক ও র্খ নম্বর উদাহরণে বিষয়টি দেখানো হয়েছে।

অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে বড় রকমের সামাজিক স্তর বিন্যাস রয়েছে। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে যার বহিপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ভাষা ব্যবহারের বিষয়টি বলা হচ্ছে এ জন্য যে ভাষার ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষকে সম্মান করা যায়, আবার ভাষার প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষকে অপমানও করা যায়। ভাষা দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

মানুষকে আঘাত করা যায়, আবার ভাষা দিয়ে মানুষকে খুশিও করা যায়। বাচন ভঙ্গির ধরণ ও সর্বনামের ব্যবহার এ ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

অশিক্ষিত লোকদের শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে আর্থিক বিষয়টি অর্থাৎ টাকা পয়সার বিষয়টি মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। বংশ গৌরব এবং উঁচু স্তরের আত্মীয়-স্বজনও কোন কোন ক্ষেত্রে মর্যাদা বা মানসম্মান বাড়িয়ে থাকে। তবে বংশ গৌরব কিংবা উঁচু স্তরের আত্মীয়-স্বজন থাকলেই কারও মর্যাদা বেশি দিন টিকে থাকে না, যদি না সে তার নিজের অবস্থার উন্নতি করতে পারে। নিজের অবস্থার উন্নতি বলতে আর্থিক বিষয় বোঝানো হচ্ছে।

কুমারখালীতে আপনি, তুমি, তুই, আপনারা, তারা, তোরা, তোমরা ইত্যাদি সর্বনাম অধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অশিক্ষিত লোকেরা সাধারণত আপনে, আপনেরা, তুই, তুরা, তুমরা ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন। যেমন-

সর্বনাম	কুমারখালীতে সর্বনামের ব্যবহার
আপনি	আপনে ('ই' ধ্বনি; 'এ' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে)
আপনারা	আপনেরা ('আ' ব্যঞ্জন ধ্বনির পরের ধ্বনি, ব্যঞ্জন ধ্বনির পূর্বে গিয়ে 'এ' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে)
তোমরা	তুমরা ('ও' ধ্বনি 'উ' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে)
তোরা	তুরা ('ও' ধ্বনি 'উ' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে)

কুমারখালীতে বয়স্ক লোকদের ক্ষেত্রে সাধারণত 'আপনি' ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তবে দিনমজুর ও গরীব শ্রেণীর বয়স্ক লোকদের সাথে 'আপনি' ব্যবহৃত না হয়ে 'তুমি' ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সমবয়স্কদের ক্ষেত্রে 'তুই' এবং কখনও কখনও 'তুমি' ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কুমারখালীতে 'তুমি' শব্দটি বেশী ব্যবহৃত হয় স্বামী-স্ত্রী অথবা প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে। এখানে লক্ষণীয় যে বয়স্ক গরীব লোকদের সাথে যে 'তুমি' ব্যবহৃত হয়, স্বামী-স্ত্রী অথবা প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে ঠিক সে 'তুমি' ব্যবহৃত হয় না। 'তুমি' সর্বনামটির অর্থ সব সময় এক থাকে না। কখনো 'তুমি' তুচ্ছার্থে, কখনো সম্মানার্থে, কখানো বা হৃদয়ের গভীর ভালাবাসার বহিপ্রকাশ ঘটে থাকে 'তুমি' সর্বনামটি ব্যবহারের মাধ্যমে। বাবা বা মা'কে যখন 'তুমি' বলে সম্মোধন করা হয়, তখন 'তুমি' সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয়। গরীব দিনমজুরকে যখন 'তুমি' বলা হয়, তখন 'তুমি' ব্যবহৃত হয় তুচ্ছার্থে এবং স্বামী-স্ত্রী অথবা প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে ব্যবহৃত 'তুমি' ভালবাসার আধার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ছোটদের সাথে 'তুই' ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ধনী ও উচ্চ পরিবারের শিশুকে কোন অশিক্ষিত লোক 'তুই' বলেন না। শিশু ছেলে হলে বাবা, বাজান, চাচা, মামা ইত্যাদি বলে সম্বোধন করতে দেখা যায় এবং মেয়ে হলে মা, খালা, ফুফু ইত্যাদি বলে সম্বোধন করতে দেখা যায়। কিন্তু অশিক্ষিত ও গরীব ঘরের শিশুর সাথে কেউ আদরের সাথে কথা বলে না। তাদের সাথে 'তুই' ব্যবহৃত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে 'তুই' তুচ্ছার্থেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। অশিক্ষিত লোকেরা কেউ কেউ স্ত্রীর সাথে 'তুই' সর্বনাম ব্যবহার করে থাকেন। তবে মহিলারা কিন্তু স্বামীকে কখনও 'তুই' বলেন না। অশিক্ষিত মহিলারা স্বামীকে 'তুই' বলা বেয়াদবী মনে করেন। মুসলমান অশিক্ষিত মেয়েরা মনে করেন স্বামী হলো গুরুজন, স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেস্ত, তাই স্বামীকে 'তুই' বলা যায় না। এখানে স্ত্রীকে যে অর্থে 'তুই' বলা

Dhaka University Institutional Repository

হয়, সে অর্থে কিন্তু গরীব দিনমজুর ঘরের ছোট ছেলে বা মেয়েকে 'তুই' বলা হয় না। 'তুই' কখনও তুচ্ছার্থে কখনো সাধারণ অর্থে কখনও বা ভালবাসার আধার হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে কার উদ্দেশ্যে ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে অর্থাৎ পাত্রের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আর এ জন্যই সর্বনামের ব্যবহারের বিষয়টি একটি সূত্রের বা ছকের মাধ্যমে ফেলা যায় না। একটি জীবন্ত ভাষার ভাষা ব্যবহারের যে বৈচিত্র্য আছে তা হাতে গুণে বলা যায় না। অসংখ্য বৈচিত্র্যময় ভাষিক বাক্যিক গঠন প্রণালীই হলো একটি জীবন্ত ভাষার রূপ-লংকার।

কুমারখালীর ভাষায় আপনি, তুমি, তুই, আপনারা, তারা, তোরা, তোমরা ইত্যাদি সর্বনাম ব্যবহৃত না হয়েও বাক্যের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

ক. কি রে যাবি নে?
খ. কি গো যাবা না?
গ. কি ব্যাটা যাবা না?
ঘ. কি গো বাপু যাবা না?
ঙ. বুড়োর ব্যাটা যাবা না?

উপরের 'ক' এবং 'ঙ' নম্বর বাক্য দু'টির শ্রেণী বিশেষভাবে রক্ষিত। 'ক' নম্বরে 'কি রে' ব্যবহৃত হয় সাধারণত সমবয়স্ক কিংবা মর্যাদাশীল নয় এমন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে। 'ঙ' নম্বরে 'বুড়োর ব্যাটা' বলতে বয়স্ক লোককে বোঝানো হয়েছে এবং একই সাথে সে সামাজিকভাবে ততটা মর্যাদশীল নয়। ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ নম্বরের বাক্যগুলির যা অর্থ তা হলো, কাউকে উদ্দেশ্যে করে বলা হচ্ছে, ' সে যাবে কি না?'

অশিক্ষিত মুসলমানেরা পিতাকে 'আব্বা', 'বাজান' কিংবা বাপ বলে সম্মোধন করে থাকেন। তবে পিতাকে 'আব্বা' বলার প্রচলনই বেশী লক্ষ্য করা যায় এবং মাতাকে 'মা' বলে সম্মোধন করতে দেখা যায়। অশিক্ষিত ও নিম্ন-পরিবারের লোকেরা বাবা-মা'র সাথে 'তুই' সর্বনাম ব্যবহার করে থাকেন। মাতার ক্ষেত্রে 'তুই' সম্বোধনসূচক সর্বনাম ব্যবহার করার প্রবণতা বেশী লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুরা পিতাকে কখনও 'আব্বা' বলেন না, 'বাবা' বলে সম্বোধন করেন। মাতাকে 'মা' বলে সম্বোধন করে। মুসলমানেরা পিতা'র ভাইকে 'চাচা' বলেন কিন্তু হিন্দুরা পিতা'র বড় ভাইকে 'জ্যাঠা' বলেন এবং ছোট ভাইকে 'কাকা' বলেন ও পিতার বোনকে 'পিসি' বলে সম্বোধন করে থাকেন। মুসলমানেরা পিতার বোনকে 'ফুফু' বলেন এবং মাতার বোনকে 'খালা' বলে সম্মোধন করেন। হিন্দুরা মায়ের বোনকে 'মাসি' বলেন।

কুমারখালীতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্বোধনসূচক ও ধর্মীয় কারণে ধর্ম সংক্রান্ত কিছু শব্দ ছাড়া ভাষার ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রায় একই রকমের, 'একই ভাষাভাষী লোকের মধ্যেও সমাজভেদে ভাষা-ব্যবহারে তারতম্য ঘটে। তার প্রধান উদাহরণ হ'ল বাংলা-ভাষাভাষী হিন্দু ও মুসলমান সমাজের ভাষা। হিন্দুরা নমস্কার করেন, মুসলমানেরা সালাম বা আদাব জানান, হিন্দুরা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, মুসলমানেরা দাওয়াত কবুল করেন, হিন্দুরা জল পান করেন, মুসলমানেরা পানি খান, হিন্দুরা ভাত খেয়ে আঁচান, মুসলমানেরা খানাপিনা ক'রে হাত-মুখ ধোন, মুসলমানেরা 'চাচা' ব'লে আপন প্রাণ

Dhaka University Institutional Repository

বাঁচালেও, হিন্দুরা, 'কাকা' ব'লে ফাঁকা আওয়াজ করেন না। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের এই যে ভাষাগত তারতম্য, একেও "সামাজিকতার ভাষা" না ব'লে উপায় নেই।[২]

সমাজের নিয়ম-কানুন ও রীতি-নীতি ভাষার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। ভাষার মাধ্যমে সমাজের নিয়ম-রীতি প্রতিফলিত হয় বলেই মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে অবস্থান করছে। মানুষের সব থেকে বড় যে হাতিয়ার তা হলো তার ভাষা। ভাষার সুচারু ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ তার সব কাজ সুসম্পন্ন করতে পারে। একই সমাজে কিংবা একই পরিবারেই শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের বাস। শিক্ষিত লোকের ভাষা পরিবারে এমন দুর্বোধ্য হয় না, যা অশিক্ষিত লোক বোঝেন না। অথবা অশিক্ষিত লোক এমন ভাষা ব্যবহার করেন না, যা শিক্ষিত লোকের ভাষার মান রক্ষিত হয় না। আসলে একই অঞ্চলে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া একই ধরনের ভাষা ব্যবহৃত হয়।

অশিক্ষিত লোকদের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অকৃত্রিমতা লক্ষ্য করা যায়। অশিক্ষিত লোকেরা ভাষার ধ্বনি, রূপ, শব্দ কিংবা বাক্য কি তা জানেন না। এই না জানার কারণে ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে শুদ্ধতার কিংবা অশুদ্ধতার প্রসঙ্গ আসে না। গ্রামভিত্তিক ও অঞ্চলভিত্তিক কিছু বৈচিত্র্য ছাড়া কুমারখালীর অশিক্ষিত লোকেরা প্রায় একই ধরনের ভাষায় ভাব বিনিময় করে থাকেন। ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্য; যেমন:

ক. কুকুরটা খ্যাদা তো
খ. কুকুরটা বাড়ে তো
গ. কুকুরডা বাড়ে তো
ঘ. কুকুরডা দাবড়া তো
ঙ. কুত্তা খ্যাদা তো
চ. কুত্তে খ্যাদা তো
ছ. কুত্তাডা মার তো
জ. কুহুরডা মার তো

কুমারখালীর কৃষ্ণপুর, বিলকাটিয়া, ডাঁশা, বশিগ্রাম, পান্টি, বহল বাড়িয়া ইত্যাদি অঞ্চলে 'কুকুর'কে 'কুকুর' অথবা 'কুহুর' বলা হয়। কিন্তু যে অংশে কুমারখালীর পৌরসভা অবস্থিত সে অংশের লোকেরা; এমনকি পৌরসভার আশে-পাশের লোকেরা 'কুকুর'কে 'কুত্তা/কুত্তে' বলে থাকেন। 'খ্যাদা' 'বাড়ে' 'দাবড়া'; 'মার' শব্দগুলির অর্থ হলো 'তাড়ানো'। ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ এবং জ নম্বরের বাক্যগুলি দ্বারা কোন একজনকে উদ্দেশ্য করে 'কুকুর' তাড়াতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে কুমারখালীর সমগ্র এলাকার ভাষাভাষীরা ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ এবং জ নম্বরের উদাহরণের বাক্যগুলো বোঝেন। তবে যে এলাকায় 'কুত্তা/কুত্তে' ব্যবহৃত হয় না, সে এলাকার লোকেরা কুকুরকে 'কুত্তা/কুত্তে' বলাটা হাস্যকরও মনে করে থাকেন।

একই বৃহৎ অঞ্চলের ভাষার পার্থক্যের রূপ কিন্তু ঐ এলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলেও খুব একটা গ্রহণযোগ্য নয়। ভাষার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভাষার গ্রহণযোগ্যতা না থাকলে সে ভাষার ব্যবহার সংকুচিত না হয়ে পারে না। গ্রহণযোগ্যতা না থাকলে তার প্রায়োগিকতা

Dhaka University Institutional Repository

অনেকাংশে হ্রাস পেতে থাকে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অন্যান্য কারণে ভাষায় যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয় সে পার্থক্যই ভাষার উপভাষাগত অবস্থানটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

অশিক্ষিত লোকদের 'কুহুর' শব্দটি বেশি ব্যবহার করতে দেখা যায়। দূর্গাপুর, মালিয়াটি, আগ্রাকুন্ডা, ছুন্দা, চড়াইকোল ইত্যাদি এলাকায় 'কুত্তা/কুত্তে' ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

অশিক্ষিত মহিলারা তাদের স্বামীর নাম ধরে ডাকেন না। বিষয়টি হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। স্বামীর নাম ধরে ডাকলে 'পাপ' হবে, সে জন্য হিন্দু মহিলারা স্বামীর নাম ধরে ডাকেন না। তবে মুসলমান অল্পবয়স্ক মহিলারা পাপের বিষয়টি না বললেও তারা স্বামীর নাম ধরে ডাকেন না। বয়স্ক অশিক্ষিত মুসলমান মহিলারাও স্বামীর নাম ধরে ডাকাকে 'পাপ' মনে করেন। স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে হবে এমন বিষয় থেকে মহিলারা দূরে সরে যায়। এমন কি রোগী অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সময় পর্যন্ত অশিক্ষিত মহিলারা স্বামীর নাম বলতে চায় না, বা বলেন না। পরিচিত অন্য কেউ সেই মহিলার স্বামীর নাম বলে দেয়।
অশিক্ষিত লোকেরা উদ্দেশ্যহীন ভাবে কখনও কখনও কথা বলে থাকেন। যেমন,

ক. অ্যাহুনু লোক আছেরে ডাঙায়?
খ. অ্যাহুনু ডাঙায় মানুষ আছেরে?

উপরের ক ও খ নম্বরের বাক্য দুটির অর্থ হলো, 'নদীর তীরে এখনও কিছু লোক আছে'। কুমারখালীর গড়াই নদীর ঘাট থেকে বাক্য দুটো সংগ্রহ করা হয়েছে। খেয়া নৌকার যা ধারণ ক্ষমতা তার থেকেও অধিক লোক নৌকায় উঠেছে, তারপরেও নদীর কূলে বেশ কিছু লোক থাকায়, ঐ রকম কথা বলা হয়েছে। 'অ্যাহুনু লোক আছেরে ডাঙায়', বাক্যটি বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্যে করে বলা হয় নি। তবে বক্তার বিস্ময়কর উক্তি বাক্যে প্রতিফলিত হয়েছে। কুমারখালীতে এ ধরনের বাক্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কুমারখালীতে এমন কিছু শব্দের ব্যবহার আছে, যা একই জাতীয় জীব-জন্তুকে বোঝায়। যেমন ঃ

	শব্দ	অর্থ
ক.	গাই	গাভী।
খ.	দামড়া	চাষের কাজের জন্য খাশি করা গরু।
গ.	আড়ে	ষাঁড় (খাশি করা হয় নি)।
ঘ.	বকন	মেয়ে গরু (যার বাচ্চা হয় নি)।
ঙ.	আড়ে বাছুর	পুরুষ শিশু গরু।
চ.	বকন বাছুর	মেয়ে শিশু গরু।

ক, খ, গ, ঘ, ঙ এবং চ নম্বর উদাহরণের প্রতিটিই গরু। গরুর মধ্যে যৌনগত দিক অর্থাৎ পুরুষ গরু এবং মেয়ে গরু রয়েছে। কিন্তু বয়সের ও কাজের ভিত্তিতে নানা নামে সেগুলিকে চিহ্নিত করা হয়। আবার,

ক. কুকড়ো
খ. কুহড়ো

Dhaka University Institutional Repository

গ. কুহরো
ঘ. মোরগ
ঙ. মুরগি
চ. মুরগির বাচ্চা
ছ. কুহড়োর ছাও

মোরগ এবং মুরগী'র সাধারণ নাম কুমারখালীতে 'কুকড়ো'। তবে উচ্চারণের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। মোরগ এবং মুরগীও ব্যবহৃত হয়ে থাকেন। ছাগলকে কুমারখালীর লোকেরা নানা ভাবে চিহ্নিত করে থাকেন; যেমন,

	শব্দ	অর্থ
ক.	ধাড়ি	মেয়ে ছাগল (অন্তত একবার বাচ্চা হয়েছে)
খ.	পাটি	মেয়ে ছাগল (একবারও বাচ্চা হয় নি)
গ.	খাশি	পুরুষ ছাগল (কাটান দেয়া হয়েছে অর্থাৎ খাশি করা হয়েছে)
ঘ.	পাটা/পাঁঠা	পুরুষ ছাগল (কাটান দেয়া হয় নি অর্থাৎ খাশি করা হয় নি)
ঙ.	আবলোস/আবলুস	মেয়ে ছাগল (কোন দিন বাচ্চা হয় নি, বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনাও নেই)
চ.	ছাগলের বাচ্চা	শিশু ছাগল (মেয়ে অথবা পুরুষ)

অর্থাৎ একই জীবের নানা নাম কুমারখালীতে ব্যবহৃত হয়। একই জীবের নানান রকম নাম ব্যবহারের বিশেষ তাৎপর্যও আছে। প্রতিটি নামের বিশেষ অর্থ আছে। সে অর্থ দ্বারা পশুর বা জীবের বয়স ভিত্তিক অথবা অবস্থা ভিত্তিক শ্রেণী নির্দেশ করে। ভাষার সামাজিক স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে যার গুরুত্ব অপরিসীম। কুমারখালীতে 'কাটান দেয়া'কে 'খাশি করা' বোঝানো হয়ে থাকে।

অশিক্ষিত লোকেরা প্রভাবশালী ও ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্মানের চোখে দেখে থাকেন। ডাক্তার ও শিক্ষককে তাঁরা বেশ মর্যাদা দেয়। অল্প-পরিচিত শিক্ষককে স্যার এবং পরিচিত শিক্ষককে মাস্টের ভাই, মাস্টের চাচা ইত্যাদি বলে সম্বোধন করেন। থানা সদরের ডাক্তারকে ডাক্তার সাহেব, ডাক্তার সাব ইত্যাদি বলে সম্বোধন করে থাকেন। গ্রামের পরিচিত ডাক্তারকে সামাজিক সম্পর্ক অনুযায়ী ডাক্তার ভাই, ডাক্তার, ডাক্তার মামু ইত্যাদি বলে সম্বোধন করতে দেখা যায়। পুলিশকে কুমারখালীর গ্রামের অশিক্ষিত লোকেরা বেশ ভয় করে চলেন। পুলিশের ক্ষেত্রে 'মর্যাদা' শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে না এ জন্য যে, কুমারখালীর গ্রামের অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে এখনও এমন ধারণা আছে যে পুলিশ যখন তখন যাকে তাকে ধরে নিয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ পুলিশের ক্ষমতা আছে। 'মর্যাদা' ও 'ভয়' শব্দ দুটি এক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। 'মর্যাদা' দেয়া হলো মন থেকে কাউকে সম্মান করা এবং 'ভয় করা' হলো ক্ষণিকের জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাউকে মান্য করার ভাব করা। পুলিশকে স্যার বলে সম্বোধন করতে দেখা যায়। পুলিশের মধ্যে চাকরিগত স্তরীকরণ আছে। কেউ অফিসার, কেউ হাবিলদার, কেউবা কনস্টেবল ইত্যাদি বিষয়ে অশিক্ষিত লোকেরা তেমন খোঁজ-খবর রাখেন না। কুমারখালীর অশিক্ষিত লোকেরা পুলিশ কনস্টেবল শব্দের সাথে খুব একটা পরিচিত নয়। তবে পুলিশ কনস্টেবলকে কেউ কেউ 'পুলিশের সেপাই' হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। পুলিশ বাদে থানা সদরের অন্যান্য কর্মকর্তা যেমন কৃষি অফিসার, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা বা অন্যান্য পেশার বড় কর্মকর্তাদের অশিক্ষিত লোকেরা খুব একটা মর্যাদা দিয়ে চলেন না। মর্যাদা না দেয়ার মূলে যে কারণ রয়েছে তা হলো কোন কোন

Dhaka University Institutional Repository

অফিসারের কি কাজ বা কে কোন অফিসার এ বিষয়টি অধিকাংশ গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকেরাই জানেন না।

অশিক্ষিত লোকদের ভাষা ব্যবহার ও ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হলো, প্রত্যেক মানুষ তার নিজস্ব যোগাযোগ ও সামাজিক অবস্থানের মধ্য দিয়ে চলে থাকেন। এই অবস্থা ও সামাজিকতা ভাষার ব্যবহারের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাই অশিক্ষিত হলেই যে বিশেষ ভাষা ব্যবহার করে থাকেন, তা বলা যায় না। তবে শিক্ষিত ভাষাভাষী অপেক্ষা অশিক্ষিত ভাষাভাষীরা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছুটা অসচেতন এ কথা বলা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী

১। মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী, মনসুর মুসা(সম্পা), ১৯৯৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা; পৃ. ৫৩৮

২। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা; পৃ. ১৩৮

৩। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলাদেশী বাংলার আদর্শ অভিধান: ভূমিকা, বাঙলা ভাষা (২য় খন্ড), হুমায়ুন আজাদ (সম্পা), ১৯৮৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২৯১।

৪। প্রাগুক্ত; পৃ. ২৯২।

৫। মুহম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত; পৃ. ৫৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দুদের ভাষা

কুমারখালী এক সময় হিন্দু প্রধান এলাকা ছিল। এক সময় বলতে বাংলা যখন বৃটিশ শাসনের অধীনে ছিল তখন কার কথা বলা হচ্ছে। বৃটিশ শাসনের অবসানের পর ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমে উপমহাদেশের মানুষের আবাস স্থলের পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তনের সূত্র ধরে কেউ হয়তো নিজের জন্মভূমি ছেড়ে অন্য এলাকায় অথবা অন্যদেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছেন। নদীয়া জেলার মহকুমা কুমারখালী নতুন দেশের নতুন জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নতুনত্বের হাওয়ায় নতুন ভাবে কুমারখালীর লোকেরা বসতি স্থাপন করেছেন।

পরিবর্তনগত বসতি স্থাপনের ধারার প্রচলন হয়েছিল ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কুমারখালীর বেশ কিছু মানুষ যেমন কুমারখালী ছেড়ে চলে গেছেন, আবার কিছু মানুষ কুমারখালীতে বসতি স্থাপন করেছেন। কুমারখালী ছেড়ে চলে যাওয়া লোকদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের লোকেরাই বেশী। কুমারখালীতে বর্তমানে হিন্দু ও মুসলমান এ দুটি ধর্মের লোক পাশা-পাশি বসবাস করছেন।

ধর্মীয় রীতি, ধর্মীয় আচরণ, ধর্মীয় সংস্কৃতি মানুষের ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করে। হিন্দু ধর্মের লোকদের নাম রাখার ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রভাব ও দেব-দেবীর কিংবা প্রতিমা/দেবতাদের নামের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এমনকি কুমারখালীতে বেশ কিছু গ্রাম/মৌজার নাম আছে, যা হিন্দুধর্মের দেব-দেবীর নামের সাথে সংগতিপূর্ণ। যেমন:

- কৃষ্ণপুর
- কুড়ুপাড়া
- রমানাথপুর
- দেবী নগর
- দূর্গাপুর
- গোবিন্দপুর

ইত্যাদি

হিন্দু পুরুষের নামের পূর্বে 'শ্রী' এবং মহিলাদের নামের পূর্বে 'শ্রীমতি' বসে। কুমারখালীর হিন্দুদের কয়েকটি নাম। যেমন:

পুরুষের ক্ষেত্রে
- শ্রী হেরম্ভ কুমার পোদ্দার
- শ্রী ঈষাণ চন্দ্র সরকার
- শ্রী সুশান্ত কুমার কর্মকার
- শ্রী গণেষ চন্দ্র পাল

ইত্যাদি

মেয়েদের ক্ষেত্রে
- শ্রীমতি প্রণিতা রাণী প্রামাণিক
- শ্রীমতি রীপা পোদ্দার
- শ্রীমতি রাধা রাণী সাহা

ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

কোন কোন হিন্দু পুরুষের নামের পূর্বে দুটো 'শ্রী' দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, 'শ্রী শ্রী চিত্তরঞ্জন নাথ'। তবে হিন্দু মহিলাদের নামের পূর্বে দুটো শ্রীমতি বসতে দেখা যায় না। হিন্দুদের নামের পূর্বে 'শ্রী' এবং 'শ্রীমতি' ছাড়াও 'শ্রীযুক্ত' 'শ্রীযুক্তা' ইত্যাদি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। 'শ্রীযুক্ত' ব্যবহৃত হয় পুরুষের নামের পূর্বে এবং 'শ্রীযুক্তা' ব্যবহৃত হয় মহিলাদের নামের পূর্বে। "শ্রী' 'শ্রীযুক্ত' 'শ্রীমান' প্রভৃতি শব্দ জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকল বাঙালির নামের পূর্বে ব্যবহার করা চলে কি না, জাতিকে বাছিয়া লইতে হইবে। ৬০/৬৫ বৎসর পূর্বেও হিন্দু মুসলমান সকলেই নিজেদের নামের পূর্বে 'শ্রী' ইত্যাদি লিখতেন। আমরাও লিখিতাম, দলিল-দস্তাবিজেও লিখিত হইত। ঈশা খাঁর কামানে বাংলায় 'শ্রী ইছা খান' ও শের শাহের টাকায় দেবনাগরিতে 'শ্রীসের সাহস্য' এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর একমাত্র মুসলমান মহিলা কবি 'শ্রীমতি রহিমন্নিছা' প্রভৃতি ঐতিহাসিক দলিলে 'শ্রী'র ব্যবহার স্মর্তব্য। 'শ্রী' যেন হঠাৎ মুসলমানদের কাছে ৪০/৫০ বৎসর পূর্বে 'বিশ্রী' হইয়া গেল। অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি, কতকটা মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম সংস্কারবশত: হিন্দুয়ানী বর্জনের তাগিদে এবং কতকটা জলাতঙ্কের মত সংস্কৃতাতঙ্কে বাংলার মুসলমান তাহাদের নামের পূর্ব হইতে 'শ্রী' লেখা বাদ দিতে থাকে। তখন বা তাহার কিছুদিন পূর্ব হইতে (সমসাময়িক হওয়াই স্বাভাবিক) মুসলমান বি.এ. পাশ করিলে নামের পূর্বে সম্ভ্রমসূচক 'মৌলবী' শব্দ এবং তন্নিম্নানের ইংরেজী শিক্ষিত হইলে 'মুন্‌শী' শব্দ ব্যবহার করিতেন। নামের পূর্বে 'শ্রী'র পরিবর্তে 'জনাব' লেখার রেওয়াজ পাকিস্তান আমলেই চালু হয়। ইসলামী জোশে মূল শব্দটির স্ত্রীলিঙ্গের রূপ 'জনাবা' কোন্ অর্থ প্রকাশ করে, তাহা না বুঝিয়াই বাংলায় তাহা চালু হইতে থাকে। সুতরাং পুংলিঙ্গে জনাব এবং স্ত্রীলিঙ্গে (সংস্কৃত সদস্য-সদস্যা; সভ্য-সভ্যা; মনোরম-মনোরমা প্রভৃতির অন্ধ অনুকরণে) 'জনাবা' লিখিত হইতে থাকে। এখন বাংলার মুসলমানদিগকে এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে।"

হিন্দুদের ডাক নামের ক্ষেত্রে যা দেখা যায় তার কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন:

ক. বিমল
খ. যতিন
গ. স্বপন
ঘ. আনন্দ

} পুরুষদের ক্ষেত্রে

ক'. রীতা
খ'. রীপা
গ'. শীখা
ঘ'. রাধা

} মেয়েদের ক্ষেত্রে

উপরের উদহরণে ক, খ, গ এবং ঘ-নং এর হিন্দু পুরুষের ক্ষেত্রে 'ক' এবং 'খ' অর্থাৎ বিমল এবং যতিন। 'ক' এবং 'খ' অর্থাৎ বিমল এবং যতিন শুধুমাত্র হিন্দুদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলেও 'গ' এবং 'ঘ' নং অর্থাৎ স্বপন এবং আনন্দ মুসলমানদের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তেমনি মেয়েদের ক্ষেত্রে ক', খ', গ' এবং ঘ' ব্যবহৃত হলেও ক' এবং খ' অর্থাৎ 'রীতা' এবং 'রীপা' হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের মধ্যেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু গ' এবং ঘ' অর্থাৎ 'শীখা' এবং 'রাধা' শুধুমাত্র হিন্দুদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

কুমারখালীতে হিন্দুদের মধ্যে সম্পর্কসূচক যে সব শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

বাবা — পিতার ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

মা	মায়ের ক্ষেত্রে
বৌদি	ভাইয়ের বউ (বড় হলে)
জেটিমা/জেঠিমা	পিতার বড় ভাইয়ের বউয়ের ক্ষেত্রে
জাঠা/জ্যাটা	পিতার বড় ভাই
কাকা	পিতার ছোট ভাই
আজা	মায়ের পিতা
আজি	মায়ের মা
দাদু	পিতার পিতা
কত্তা মা/কর্ত্তা মা/ঠাকমা	পিতার মায়ের ক্ষেত্রে
ঠাকুরজী	স্বামীর বোন (ছোট হলে)
দাদা বাবু/জামাই বাবু	বোনের স্বামী (বড় হলে)
পিসি	পিতার বোন
মাসি	মায়ের বোন
বড় ঠাকুর	স্বামীর বড় ভাই
বড় দিদি	স্বামীর বড় ভাইয়ের বউয়ের ক্ষেত্রে
বাবা	শ্বশুর
দিদি	স্বামীর বোন (বড় হলে)

সম্বোধনসূচক শব্দ ব্যবহারে কুমারখালীর হিন্দুদের মধ্যে কিছুটা ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। যেমন, জেটিমা/জেঠিমা'কে কখনও কখনও বড়মা বলতে দেখা যায়। কিন্তু কখনও 'চাচী' কিংবা 'চাচী মা' বলতে দেখা যায় না। জেটিমা/জেঠিমা'তে 'ট' এবং 'ঠ' এর উচ্চারণগত পার্থক্য লক্ষণীয় 'ট' এবং 'ঠ' উচ্চারণ স্থানের দিক দিয়ে দুটোই তালব্য ধ্বনি। 'ট' ধ্বনিটি অঘোষ স্বল্পপ্রাণ এবং 'ঠ' ধ্বনিটি অঘোষ মহাপ্রাণ। অর্থাৎ স্বল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণতার প্রভাব ব্যক্তিক উচ্চারণের শুদ্ধতা/অশুদ্ধতার উপর নির্ভর করে থাকে।

ধর্ম সংক্রান্ত কিছু শব্দ হিন্দুদের মধ্যে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন: ভগবান, পূজা/পূজো, উপোস, আহ্নিক, দেবতা, দেবী, স্বর্গ, নরক, প্রার্থনা, রামরাম, দূর্গাদূর্গা/দূগ্গা-দূগ্গা, হরিহরি, হরে কৃষ্ণ হরে রাম ইত্যাদি। অশিক্ষিত ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া লোকেরা দূগ্গা-দূগ্গা জাতীয় শব্দ বলে থাকে। হিন্দুদের মধ্যে যারা শিক্ষিত ও অবস্থাসম্পন্ন লোক তারা সামাজিকভাবে বেশ মর্যাদা সম্পন্ন। যদিও হিন্দুদের মধ্যে বংশীয় শ্রেণী বিভাগ বর্তমান। যেমন, ব্রাহ্মণ, সাহা, রাজবংশী, ঘোষ, পাল ইত্যাদি। বংশীয়ভাবে উঁচু ও নীচুর বিষয়টি হিন্দু সমাজে সুদৃঢ়ভাবে অবস্থান করতে দেখা যায়। তবে বর্তমানে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অবস্থা হিন্দুদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও প্রাচীন মতবাদের উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে বলা যায়।

হিন্দুদের মধ্যে মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে 'বাবু' শব্দটি বিশেষ সম্মানার্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে ধনী ও সম্মানিত বয়স্ক লোকদের অশিক্ষিত ও গরীব হিন্দুরা কত্তা/কর্তা বলেও সম্বোধন করে থাকে। এক্ষেত্রে প্রকৃত নাম না বলে কত্তাবাবু/কর্তাবাবু বলা হয়ে থাকে। যেমন, শিক্ষিত ও ধনী 'শ্রী অনীল কুমার ঘোষ' রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় কোন একজন অশিক্ষিত গরীব হিন্দু'র সাথে দেখা হলো। অশিক্ষিত গরীব লোক 'শ্রী অনীল কুমার ঘোষ'কে দেখে বলল, কত্তাবাবু/কর্তাবাবু কেমন আছেন?

Dhaka University Institutional Repository

কুমারখালীতে সাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে হিন্দুদের মধ্যে 'কি' এবং 'আজ্ঞে' ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। সম্মানীত শ্রেণীর লোকদের সাথে সাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে 'আজ্ঞে' ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সাধারণ ও নিম্নশ্রেণীর ক্ষেত্রে আজ্ঞে ব্যবহৃত না হয়ে 'কি' শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে সাড়া দেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

কুমারখালীতে নদীর ক্ষেত্রে 'গাঙ' এবং পুকুরের ক্ষেত্রে 'পুকোর' শব্দের প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু হিন্দুরা খুব একটা 'গাঙ' বলেন না, নদী বলে থাকেন এবং 'পুকোর' না বলে 'পুকুর'ই বেশী বলেন। উল্লেখ্য যে, সব মুসলমান যে নদী না বলে গাঙ বলেন তা কিন্তু নয়। তেমনি সবাই পুকুর না বলে পুকোর বলেন তাও নয়। অশিক্ষিত ও ভাষার শব্দ ব্যবহারের প্রতি অসচেতন ব্যক্তিরা নদী না বলে গাঙ বলে থাকেন এবং পুকুর না বলে পুকোর বলে থাকেন। হিন্দুরা পানি না বলে সাধারণত জল বলে থাকেন। যেমন:

ক. নদীর জল।
খ. পুকুরের জল।
গ. জল পড়ছে।
ঘ. খাবারের জল।
ইত্যাদি।

তবে মুসলমানদের পাশাপাশি অবস্থান করার জন্য এবং শিক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে মুসলমানদের সাথে হিন্দুদের ব্যবহৃত ভাষার কিছুটা পরিবর্তন দেখা যায়। তারই প্রতিফলিত রূপ দেখা যায় 'জল' শব্দের ক্ষেত্রে। কোন কোন 'হিন্দু' মুসলমানদের সাথে কথা বলার সময় 'জল' না বলে 'পানি' বলে থাকেন।

'... বাংলা 'পানি' এবং 'জল' এই শব্দটির ব্যবহারের কথাও চিন্তা করে দেখতে হবে। পানি 'অর্ধ তৎসম' শব্দ, অর্থাৎ সংস্কৃত তথা প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার বিশেষণ পদ 'পানীয়' থেকে অর্থে ও গঠনে বিকৃতি ঘটিয়ে গৃহীত হয়েছে। এবং মূলে শব্দটি বিশেষণ হলেও, বাংলায় ও হিন্দীতে অর্ধ তৎসম রূপ নিয়ে বিশেষ্য পদে পরিণত হয়েছে। তাই, শব্দটিকে আমরা বাংলায় 'পানিফল', 'পানিবসন্ত', 'পানকৌড়ি', 'পান্তোয়া' এমন কি 'পান্তাভাতে'ও ব্যবহৃত হতে দেখি। এই 'পানি' শব্দের বাংলা বিশেষণ রূপ হচ্ছে 'পানসে' অর্থাৎ 'ফিকা, জেলো। 'পানসে হাওয়া' পানসে ঝোল, 'পানসে শরবত' - ও চলতে পারে অর্থাৎ ঘরোয়া কথায় 'পানসে' শব্দের ব্যবহার চলতে পারে, তবে 'পয়:প্রণালী' স্থলে 'পানসে নর্দমা' 'জলজ শিলা' স্থলে 'পানসে শিলা' 'জলক্রিয়া' স্থলে 'পানসে ক্রীড়া' চলবে কিনা পাঠকেরাই ভেবে দেখুন। 'তৎসম' তথা প্রাচীন ভারতীয় অর্থ 'জল' শব্দ ছাড়া 'পানি' শব্দ বাংলা বিজ্ঞানের ভাষায় ব্যবহার করা চলবে বা চলা উচিত বলে আমি মনে করি না। এই জন্য 'পানসে' বাষ্প না লিখে 'জলীয় বাষ্প' লেখার প্রয়োজন হয়ে থাকে। এমন কি, ঘরোয়া কথায়ও সর্বত্র - বিশেষ করে বাংলার বাগধারাসম্মত (idiomatic) কথায়ও 'জলের' স্থলে 'পানি' এবং 'পানির' স্থলে 'জল' ব্যবহার করা চলে না। তাই, আমরা কখনও 'জলাতঙ্ক' (hydrophobia) কে 'পান্যাতঙ্ক', জলপাইকে 'পানিপাই', 'জলপানি'কে 'পানিপানি' 'পানিযোগ' এবং 'পানিফল'কে 'জলফল', পানকৌড়িকে 'জলকৌড়ি', পান্তাভাত'কে জলভাত বলতে পানি না ও বলি না।'[২] 'জল' এমন একটা শব্দ, যা মৌলিক অর্থে [√ জল (আচ্ছাদন করা) + অচ্, র্তৃ= জল - যাহা পৃথিবীকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, অথবা যা দ্বারা পৃথিবী আচ্ছাদিত] এবং ব্যবহারে অতিব্যাপক।'[৩]

হিন্দুরা দেখা সাক্ষাত হলে একে অপরকে 'আদাপ/আদাব' অথবা 'নমস্কার' বলে সম্ভাষণ জানায়। নিয়মন্ত্রণের ক্ষেত্রে অশিক্ষিত ও ভাষার শব্দ উচ্চারণে অসতর্ক ব্যক্তিরা নেমন্তন্ন ব্যবহার করেন। শিক্ষিত শ্রেণীরা 'নিমন্ত্রণ' ব্যবহার করে থাকেন। 'স্নান' এবং 'চান' দুটি শব্দই কুমারখালীর হিন্দুদের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহৃত। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের 'চান' শব্দ ব্যবহার করতে দেখা যায় এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুরা স্নান ব্যবহার করেন। হিন্দুদের ব্যবহৃত বিচ্ছিন্ন কিছু শব্দ/বাক্যাংশ...

কথ্য বাঙলা	হিন্দু ব্যবহৃত
.../জল	জল
স্নান	স্নান/চান
নিমন্ত্রণ	নেমন্তন্ন
মৃত	ওঁ
বিস্ময়সূচক	এ রাম
চিঠির উপরিভাগে	শ্রী শ্রী দুর্গা[৪]

হিন্দু ধর্মের 'হিন্দু' শব্দটি যা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ও বিশেষ ধর্ম সংক্রান্ত অর্থজ্ঞাপক সেই 'হিন্দু' শব্দটি ফারসী শব্দ। "হিন্দু নামটীও মূলে ফারসী (সংস্কৃত "সিন্ধু" শব্দের প্রাচীন পারসীক বিকার জাত)।"[৫]

হিন্দুদের বিয়ে সংক্রান্ত কিছু রীতি দেখা যায় যা বিশেষ ভাষা দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকে। রাজশাহীর উপভাষার শব্দ অথবা খন্ডবাক্য ব্যবহারের পাশাপাশি চলিত রীতিতে তার অর্থ সম্বলিত উদারহরণ:

'১. ডুব দ্যায়ানা- বিয়ের পরদিন সকালে কল তলায় স্নান করানো।
২. পুকুর খেলা- বাসী বিয়ের দিন স্বামী স্ত্রীকে কৃত্রিম পুকুর পার করায় এবং কড়ি খেলে।
৩. পান তুলা- এয়োগণের সাথে বর-কনের আঁচল বেঁধে পুকুরের চারদিকে ঘোরা, সিঁদুর পরানো ও পান তুলে কন্যাকে দেয়া।'[৬]

কুমারখালীতে ডুব দ্যায়ানা শব্দ ব্যবহৃত না হয়ে 'ডুব দেয়ানো' ব্যবহৃত হয়। 'হিন্দু সমাজেও সামাজিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি প্রচলিত রয়েছে। যথা-

১. সূর্যযাগ্‌গী (সূর্য অর্ঘ্য) - যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন- বিয়ে, অন্নপ্রাশন, পৈতা নেয়া ইত্যাদিতে সূর্যকে প্রণাম করা।
২. পঞ্চম দোল (আড়দোল বা রাজদোল) - পাঁচদিন যাবৎ শ্রীকৃষ্ণের পূজা উপলক্ষ্যে হোলি খেলা, কুঁড়ে পোড়ানো ইত্যাদি।'[৭]

চিঠি লেখার সময় চিঠির শিরোভাগের ঠিক মাঝামাঝি স্থানে হিন্দুরা সাধারণত 'ওঁ', 'শ্রী শ্রী হরি সহায়', 'শ্রী শ্রী দুর্গা সহায়', 'শিবা' প্রভৃতি লিখে থাকেন। চিঠির সূচনা সম্ভাষণে হিন্দুরা প্রণামান্তে সেবকের নিবেদন, পরম শুভাশীর্বাদপূর্বক, নমস্কার পূর্বক নিবেদন ইত্যাদি লিখে থাকেন। চিঠিপত্র লেখার ক্ষেত্রে গুরুজন, বন্ধু-বান্ধব, ভাই-বোনসহ নানান শ্রেণীর স্তর রয়েছে। একটি সমৃদ্ধশালী ও জীবন্ত ভাষার ব্যবহার ও প্রয়োগরীতি কখনও শুধুমাত্র কয়েকটি সূত্রের দ্বারা বিধিবদ্ধ করা যায় না। ভাষার ব্যবহার ও প্রয়োগ কৌশল বৈচিত্র থেকে অত্যাশ্চর্যভাবে বিচিত্রতায় পরিপূর্ণ। তবে ধর্মীয় কারণে ভাষার ব্যবহার বিশেষ শৃঙ্খলায় আবদ্ধ।' ধর্মীয় রীতি-নীতিতে বিচিত্রতার প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু সম্বোধনসূচক কিংবা নামের ক্ষেত্রে অথবা চিঠি লেখার ক্ষেত্রে যে সব ভাষাগত ভেদাভেদ লক্ষ্য করা যায়, সেখানে

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিকতার অবস্থান অনেকাংশে অধিকভাবে পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। বিশেষ সমাজ ও বিশেষ ধর্মের জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার বাহন হিসেবে ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই বিশেষ সমাজ ও বিশেষ ধর্মের কারণে একই ভাষার মধ্যে ভেদাভেদের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই ভেদাভেদই হলো ধর্মীয় অথবা গোষ্ঠীগত ভাষা। ধর্মীয় কিংবা গোষ্ঠীগত ভাষায় যে ধর্মের ভাষিক প্রয়োগ রীতি প্রকাশ পায় তাই হলো সে ধর্মের ভাষা। বাংলা ভাষায় হিন্দুদের বিশেষ যে কিছু বুলি রয়েছে সে সব বুলিকে হিন্দুদের ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যে ভাষা সাধারণত হিন্দুরা ছাড়া অন্য ধর্মের বাংলা ভাষা-ভাষী লোকেরা খুব একটা ব্যবহার করেন না।

গ্রন্থপঞ্জি

১. মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী, মনসুর মুসা (সম্পাদিত), ১৯৯৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৫২৯-৫৩০।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১০।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১১।

৪. রাজীব হুমায়ুন, ১৯৯৩, সমাজভাষাবিজ্ঞান, দ্বীপ প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৭০।

৫. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৬, রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, কলিকাতা, পৃ. ১৯।

৬. পি,এম, সফিকুল ইসলাম, ১৯৯২, রাজশাহীর উপভাষা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২৫।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের ভাষা

কুমারখালী বর্তমানে যেমন মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা এক সময় ঠিক এমন ছিল না। 'ইকতিয়ার উদ্দিন বিন বকতিয়ার খিলজির বাংলা জয়ের সংগে সংগেই এ অঞ্চল মুসলিম শাসনে আসে নি। ..... সুলতান মুকিম উদ্দিনের শাসনামলে এটা মুসলিম রাজ্যভুক্ত হয়। মুসলিম শাসন জারি হওয়ার পরে এ অঞ্চলে জশ জশোতার সংগে ইসলাম প্রচার চলতে থাকে। ..... খুলনার হযরত খান জাহান আলী, চব্বিশ পরগণার সৈয়দ আব্বাস আলী মক্কি : পাবনার মখদুম শাহ দৌলা শহীদ, ফরিদপুরের ফরিদ উদ্দিন গঞ্জশকর প্রমুখ উন্নত মর্যাদার মুবাল্লেগগণের প্রচারের ঢেউ এ অঞ্চলেও এসেছিল।'[১] কুমারখালীতে যাঁরা ইসলাম প্রচার করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন, দরবেশ শাহ সোনাবন্ধু একজন বিখ্যাত ইসলাম প্রচারক। ..... দরবেশ কৈশর কালে কাজী বশির উদ্দিনের বাড়িতে রাখালী করতেন। তিনি একটি বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে চলাফেরা করতেন। তাই পৌরসভার একটি মহল্লার নাম সেরকান্দি (যার অর্থ বাঘের গ্রাম)।'[২] শাহ মখদুম মৌলুক খোরশেদ। ..... তাঁর কেরামতিতে পদ্মার পানি শুকিয়ে চর পড়ে যায়। তিনি চরের মাঝামাঝি স্থান খোরশেদপুরে দরগাহ প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। ..... দরবেশের কাঁচা করবটি বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাকা করেছেন। তাঁর নামানুসারেই খোরশেদপুর গ্রামের নামকরণ করা হয়।[৩]

কুমারখালীর মুসলমানদের ভাষার সাথে ইসলাম প্রচারের প্রসঙ্গটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কুমারখালীর একটি গ্রামের নাম 'খোরশেদপুর' যে টি একজন ইসলাম ধর্ম প্রচারকের নামানুসারে করা হয়েছে। কুমারখালীর মুসলমান সমাজে ছেলে-মেয়েদের নামের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। পয়গম্বর অথবা নবী রসুলের নামের সাথে সঙ্গতি রেখে ছেলেদের নাম রাখার প্রবণতা লক্ষণীয় এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে নবী, রসুল কিংবা খলিফাদের মেয়ে অথবা তাঁদের বউদের নামের প্রভাব দেখা যায়। 'আরবী ফার্সী প্রভাবিত মুসলমানের নামের আগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'মোহাম্মদ' থাকে।'[৪] মেয়েদের নামের পূর্বে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রতি ক্ষেত্রেই মোছাম্মৎ দেখা যায় এবং পরে খাতুন অথবা বেগম ব্যবহৃত হয়। এবার কয়েকটি নামের দিকে নজর দেয়া যেতে পারে। যেমন:

ক. মোহাম্মদ হামিদুল হক খান
খ. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
গ. মোহাম্মদ করিম উদ্দিন মোল্লা
ইত্যাদি

— পুরুষের নাম

ক. মোছাম্মৎ জহুরা খাতুন
খ. মোছাম্মৎ আছিয়া বেগম
গ. মোছাম্মৎ ফাতেমা খাতুন
ইত্যাদি

— মহিলার নাম

ইদানিং নাম রাখার ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন, 'আবু হাসিব মোহাম্মদ শান্তনু কায়সার খান'। নামের মূল অংশ হল 'শান্তনু'। 'শান্তনুর' আগে ও পেছনে কয়েকটি শব্দ বসিয়ে আধুনিক করা হয়েছে। আবার 'সুমন রায়হান খান' এখানে 'মোহাম্মদ' অনুপস্থিত। অর্থাৎ প্রতিক্ষেত্রে 'মোহাম্মদ' থাকতে হবে অথবা থাকে, তা নয়। নাম রাখার ক্ষেত্রে বংশের পদবী নামের পূর্বে অথবা পরে যুক্ত করার প্রবণতা মুসলমানদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তবে তারও যে ব্যতিক্রম নেই, তা নয়।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন, 'আমিনুল ইসলাম'। এখানে বংশীয় পদবী অনুপস্থিত। ছেলের নাম মায়ের নামের সাথে সঙ্গতি রেখে রাখলে ভাল হয় এবং মেয়ের নাম বাবার নামের সাথে সঙ্গতি রেখে রাখা ভাল। এ ধরনের কথা কুমারখালীতে শোনা যায়। নিজেদের কিছুটা আধুনিক করার জন্য নাম রাখার ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম অনেকের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে। 'শান্তনু' নামটি মুসলমানের এটা কুমারখালীর লোক সহজে বিশ্বাস করবেন না। শান্তনু নাম বললে কুমারখালীতে অধিকাংশ লোক মনে করবেন এটি হিন্দুদের নাম। কিন্তু পুরো নাম বললে 'শান্তনু' শব্দের রূপ মুসলমান আদলে রাখা হয়েছে বলে মনে করা হয়। শান্তনু, ডন, টপা, ঋতু, শুভ ইত্যাদি ছেলেদের ডাক নামগুলো আরবি-ফার্সী নামের জগতের পরিবর্তনগত অবস্থা বলা যেতে পারে।

মেয়েদের নামের ক্ষেত্রে 'আয়েশা জাহান প্রিমা' নামটির মূল নাম 'প্রিমা'। 'প্রিমা' নামের পূর্বে কয়েকটি শব্দ বসিয়ে নামটি মুসলমানদের শ্রেণীতে ফেলা হয়েছে। প্রিমা, প্রিথা, সোমা ইত্যাদি নামগুলো মুসলমান পরিবারে রাখার প্রবণতা লক্ষণীয়।

মুসলমানদের মধ্যে স্বজনসূচক যে শব্দগুলো ব্যবহৃত হতে দেখা যায় তা হলো:

আব্বা/আব্বু/বাজান/বাপ.....পিতার ক্ষেত্রে
আম্মা/আম্মু/মা.....ময়ের ক্ষেত্রে
চাচা/চাচু/চাচ্চু/কাহা/কাকা.....পিতার ভাইয়ের ক্ষেত্রে
ফুফু/ফুপু.....পিতার বোনের ক্ষেত্রে
খালা.....মায়ের বোনের ক্ষেত্রে
বু/আপা.....নিজের বড় বোনের ক্ষেত্রে
দাদা/দাদু.....পিতার পিতার ক্ষেত্রে
দিদা/দাদী.....পিতার মায়ের ক্ষেত্রে
নান/নানী/নানু/নান্নু.....মায়ের মায়ের ক্ষেত্রে
ভাই.....বড় ভাইয়ের ক্ষেত্রে
ভাবী.....বড় ভাইয়ের বউয়ের ক্ষেত্রে
মামা.....মায়ের ভাইয়ের ক্ষেত্রে
মামী.....মামার বউয়ের ক্ষেত্রে
চাচী/কাকী.....চাচার বউয়ের ক্ষেত্রে
বউমা/মা.....ছেলের বউয়ের ক্ষেত্রে
দুলাভাই.....বড় বোনের স্বামীর ক্ষেত্রে
ভগ্নিপতি/বোনের স্বামী/বোনের বর.....ছোট বোনের স্বামীর ক্ষেত্রে
খালু.....খালার স্বামীর ক্ষেত্রে
ফুপা/ফুফা.....ফুফুর/ফুপুর স্বামীর ক্ষেত্রে
তাওই.....ভাইয়ের/বোনের শ্বশুরের ক্ষেত্রে
মাওই.....ভাইয়ের/বোনের শাশুড়ীর ক্ষেত্রে
বিয়েন/বিয়াইন.....ভাইয়ের/বোনের স্বামীর বোনের ক্ষেত্রে
বিয়েই/বিয়াই.....ভাইয়ের/বোনের স্বামীর ভাইয়ের ক্ষেত্রে
বিয়েন/বিয়াইন.....ছেলে/মেয়ের শাশুড়ির ক্ষেত্রে
বিয়েই/বিয়াই.....ছেলে/মেয়ের শ্বশুরের ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

ভাই (শুনোন্দি).....বউয়ের বড় ভাইয়ের ক্ষেত্রে
শালা (নাম ধরে ডাকা হয়).....বউয়ের ছোট ভাইয়ের ক্ষেত্রে
শালী (নাম ধরে ডাকা হয়).....বউয়ের ছোট বোনের ক্ষেত্রে
বু/বোন (জেশ্যেষ).....বউয়ের বড় বোনের ক্ষেত্রে
ভাই (মামাতো ভাই).....মামার ছেলে
বোন (মামাতো বোন).....মামার মেয়ে
ভাই (খালাতো ভাই).....খালার ছেলে
বোন (খালাতো বোন).....খালার মেয়ে
ভাই (ফুপাতো/ফুফাতো ভাই).....ফুফুর ছেলে
বোন (ফুপাতো/ফুফাতো বোন).....ফুফুর মেয়ে
ভাই (চাচাতো ভাই).....চাচার ছেলে
বোন (চাচাতো বোন).....চাচার মেয়ে

ছোট ভাই/বোনদের নাম ধরে ডাকা হয়। তাছাড়া চাচার ছেলে/মেয়ে, ফুফুর ছেলে/মেয়ে, খালার ছেলে/মেয়ে, মামার ছেলে/মেয়ে বয়সে ছোট হলে তাদেরও নাম ধরে ডাকা হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কুমারখালীতে চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো, খালাতো ভাই বোন বড় হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের নাম বলার পরে ভাই/বোন বলা হয়। যেমন:

ক. আকুল ভাই
খ. সুমন ভাই
গ. সবুজ ভাই
] পুরুষের ক্ষেত্রে

ঘ. সম্পা বু/আপা
ঙ. সোমা বু/আপা
চ. লতা বু/আপা
] মহিলাদের ক্ষেত্রে

ক, খ, গ, ঘ, ঙ এবং চ নং উদহরণে 'আকুল', 'সুমন', 'সবুজ', 'সম্পা', 'সোমা' এবং 'লতা' খালাতো, ফুফাতো, মামাতো অথবা চাচাতো ভাই/বোন হওয়ায় তাদের থেকে বয়সে ছোট মামার, ফুফুর, চাচার কিংবা খালার ছেলে/মেয়ে তাদের ভাই/বোন বলছে ঠিক-ই কিন্তু নাম উচ্চারণ করার পরে। এ ধরনের সম্বোধন কুমারখালীতে গ্রহণযোগ্য। তবে বয়সে অনেক বড় ও সম্মানীত ব্যক্তি হলে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ আপন ভাই/বোনকেও নাম এবং সম্বোধনসূচক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে ডেকে থাকেন। চাচা, ফুফু, মামা, খালার বিষয়েও নাম এবং সম্বোধনসূচক শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে বয়সে কিছুটা বড় হলেও তাদের নাম এবং সম্বোধনসূচক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে ডাকার প্রচলন আছে। যেমন:

- হামিদ মামা
- লতা ফুফু
- মিলন কাকা
- ফুল খালা

ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষিত, ধনী ও বয়সে অনেক বড় হলে অবশ্য নাম না বলে সম্বোধনসূচক শব্দ ব্যবহারই করা হয়। একই সাথে সম্বোধনসূচক শব্দগুলোর উচ্চারণ ভঙ্গিতে যথেষ্ট শালীনতা লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ গরীব এবং অশিক্ষিত লোকেরা পিতাকে বাজান/বাপ বলে সম্বোধন করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে আব্বা বলেন। শিক্ষিত এবং মর্যাদা সম্পন্ন লোকেরা পিতাকে 'আব্বা' বলে সম্বোধন করেন এবং অতি আধুনিক শ্রেণীর লোকদের ছেলে-মেয়েরা পিতাকে আব্বু বলে থাকেন। শিক্ষিতদের মধ্যে আধুনিক শ্রেণী মা'কে আম্মা/আম্মু বলেন, বাকীরা 'মা' বলেন। শিক্ষিত, অশিক্ষিত ভাষাভাষী যাঁরা সাধারণ মনের ও নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করেন, তাঁরা সম্বোধনসূচক শব্দের রীতি বৈচিত্র খুব একটা পছন্দ করেন না। এই শ্রেণীর লোকেরা 'বু', দাদা, দাদী, নানা, নানী, চাচা, চাচী ইত্যাদি সম্বোধনসূচক শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। অশিক্ষিত লোকেরা বু, চাচা, কাকা, কাহা ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন। চাচু/চাচ্চু, নান্/নানু/নান্নু ইত্যাদি শব্দগুলো আধুনিক ও ভাষা ব্যবহারের প্রতি বৈচিত্রমনা লোকেরা ব্যবহার করে থাকেন। ছোট ভাইবোনকে নাম ধরে ডাকতে দেখা যায়।

মুসলমানদের ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত কিছু শব্দ যেমন, মসজিদ, আযান, নামাজ, অজু, কোরান শরীফ, সূরা, ফেরেস্তা, জায়নামাজ, কাবাশরীফ, জানাজা, গোরস্তান, কবর, আখেরাত, ইহকাল, পরকাল, পয়গম্বর, নবী, রসুল, আলহাজ্ব, হুজুর, মৌলানা, মৌলভী, বেহেস্ত, দোজখ, পীর, মাদ্রাসা ইত্যাদি। এই শব্দগুলোর ব্যবহারের ক্ষেত্রে উচ্চারণগত বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন:

ক. আজ্জান পড়ে গেল রে ভাই⇒ অশিক্ষিত এবং শব্দ উচ্চারণের প্রতি অচেতন ব্যক্তির দ্বারা ব্যবহৃত।
খ. আজান পড়ে গেল ⇒ শিক্ষিত লোকের দ্বারা ব্যবহৃত।
গ. আযান হয়ে গেল ⇒ শিক্ষিত ও ভাষার প্রতি সচেতন ব্যক্তির দ্বারা ব্যবহৃত।

পানি, গোসল, নাওয়া, মুসলমানী, দাওয়াত, শরীয়ত, আল্লাহ্ ইত্যাদি শব্দ মুসলমান সমাজে ব্যবহৃত হয়। শিক্ষিত লোকেরা 'গোসল' বলে কিন্তু অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত লোকেরা 'গোসল' না বলে 'নাওয়া' বলে থাকেন। যেমন:

ক. গোসল করতে যাব।
খ. নাতি যাব।
গ. গোসল করবা না?
ঘ. নাতি যাবি নে?

উপরের 'গোসল' ও 'নাওয়া' শব্দ দুটির বাক্যিক প্রয়োগরীতি দেখানো হয়েছে। অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা গোসল না বলে 'নাওয়া' শব্দ ব্যবহার করে। মুসলমানেরা 'জল' বলেন না। সব সময়ই 'পানি' বলেন। তবে মুসলমানদের মধ্যে 'জলীয় পাম্প', 'জলক্রীড়া', 'জলপাই', 'জলাতংক' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

মুসলমানেরা দেখা-সাক্ষাত হলে এক অপরকে সালাম দেয়। সালাম দেয়াটাকে ভদ্রতা মনে করা হয়। চিঠি পত্রে মুসলমানেরা পিতা-মাতা বা বড়দের ক্ষেত্রে পাক জনাবেষু, শ্রদ্ধেয় আম্মাজান ইত্যাদি লিখে সম্বোধন করে থাকেন। অবশ্য ইদানিং এই রীতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বর্তমানে শ্রদ্ধেয়, শ্রদ্ধেয়া, প্রিয় ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

অশিক্ষিত লোক, যাঁরা গ্রামে অবস্থান করেন এবং মাঠে কাজ করেন তাঁদের মধ্যে সালাম দেয়ার বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় না। শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধার বিষয়ে তাদের তেমন কোন জ্ঞান নেই। তবে বড়দের তারা 'মুরুব্বি' বলে মান্য করেন। ধনী ও সম্মানীত মুসলমান ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সাহেব বলে সম্বোধন করতে দেখা

Dhaka University Institutional Repository

যায়। পুরুষদের ক্ষেত্রে 'সাহেব' ব্যবহৃত হলেও মহিলাদের ক্ষেত্রে কখনও 'বিবি' ব্যবহৃত হয় না। 'বিবি' না বলে চাচী আম্মা/চাচীমা, দাদী/দাদীমা, খালা/ফুফু ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। 'বিবি' শব্দটি কুমারখালীতে সম্মান অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে 'বউ' অর্থে ব্যবহৃত হয়। পুরুষদের ক্ষেত্রে সম্মানার্থে যেমন 'সাহেব' ব্যবহৃত হয়, কুমারখালীতে মহিলাদের জন্য ঠিক তেমন সম্মান অর্থে কোন শব্দ নেই বলা যায়।

বিদায় নেয়ার সময় 'খোদা হাফেজ' 'আল্লাহ হাফেজ' ইত্যাদি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বিদায় নেয়ার ভাষার ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রমও আছে। অশিক্ষিত ও সামাজিক বিষয়াদী থেকে পিছিয়ে থাকা লোকেরা বিদায় নেয়ার সময় বলে থাকেন 'গেলাম আবার আসবনে' অথবা 'আবার দেখা করবো নে' ইত্যাদি।

কুমারখালীর আধুনিক শিক্ষিত পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ইউরোপিয়ান ভাব অথবা পশ্চিমি সংস্কৃতির কিছু কিছু প্রভাব কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। মানুষ অনুকরণ প্রিয়। ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক বিষয় সে অনুকরণকে ত্বরান্বিত করে। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন,

ক. 'গুড বাই'।
খ. 'সী ইউ'।
গ. 'ও কে'।
ঘ. 'সী ইউ এগেইন'।

উপরের 'ক', 'খ', 'গ' এবং 'ঘ' নম্বরের উদাহরণগুলো বিদায় নেয়ার সময় আধুনিক শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা ব্যবহার করে থাকেন। মুসলমানেরা চিঠিপত্র লেখার সময় চিঠির কাগজের উপরের দিকে 'বিস্‌মিল্লাহ্‌-হির-রাহমানির-রাহিম' অথবা 'খোদা হাফেজ', 'আল্লাহ সহায়', 'আল্লাহ মহান', 'খোদা সহায়', 'খোদা ভরসা' ইত্যাদি লিখে থাকেন।

কোন কিছুতে ব্যর্থ হলে অথবা মাঠে ফসল কম ফললে 'ভাগ্যে ছিল না', 'কপালে ছিল না' এ রকম বাক্য ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কোন কাজের সফলতায় 'মাশ-আল্লাহ', 'মারহাবা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া 'ইন্‌শাআল্লাহ', 'ইন্‌শেআল্লাহ' শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ধর্মীয় কারণে আরবী ফার্সী কিংবা উর্দূ শব্দের প্রতি মুসলমানদের আগ্রহ লক্ষণীয়। 'মুসলমান ধর্মের ও মধ্যযুগের মুসলমান সভ্যতার ভাষা বলিয়া পশ্চিম-আফ্রিকা, উত্তর-আফ্রিকা ও স্পেন হইতে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং রুষ দেশ ও সিবোরিয়া হইতে মধ্য-আফ্রিকা ও সিংহল পর্যন্ত বিরাট্‌ ভূখন্ডের বহু বহু অসভ্য, অর্ধ-সভ্য ও সুসভ্য জাতির ভাষাকে আরবী প্রভাবান্বিত করিয়াছে। ফারসীর মারফৎ, এবং সরাসরি, উর্দূ বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষার মধ্যেও শত শত আরবী শব্দ প্রবেশ করিয়াছে।"[৪] 'মুসলমানদের নামের পূর্বে সম্ভ্রম মূলক 'জনাব' শব্দ পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রী লিঙ্গ উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃতব্য। অনেকে এখন অজ্ঞতাবশত: স্ত্রী লিঙ্গে 'জনাবা' শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। 'জনাব' শব্দের স্ত্রী লিঙ্গের রূপ 'জনাবত', উচ্চারণ- সৌকর্যে 'জনাবা'. মূলে অশ্লীলতাব্যঞ্জক শব্দ। অতএব, ইহা সর্বত্র পরিত্যাজ্য।"[৫]

কুমারখালীতে বিশেষ করে আমন্ত্রণ পত্রে দাওয়াতের কার্ডে জনাব/বেগম ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। 'জনাবত' শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। তবে নারীদের ক্ষেত্রে কখনও কখনও 'জনাবা' শব্দ ব্যবহৃত হয়। অশিক্ষিত লোকদের দাওয়াত দেয়ার বিষয়টি একটু অন্যরকম। সাধারণত তাঁরা আমন্ত্রণ পত্র/দাওয়াত পত্রের মাধ্যমে কাউকে খুব একটা দাওয়াত দেয় না। কোন অনুষ্ঠান; যেমন 'রিয়ো' কিংবা 'মুসলমানী' এ জাতীয় অনুষ্ঠানে তাঁরা আত্মীয়-স্বজন অথবা অন্য লোকদের বাড়িতে গিয়ে মৌখিক ভাবে বলে

Dhaka University Institutional Repository

আসেন/দাওয়াত করে আসেন। তাঁরা কখনও 'জনাব'/'জনাবা' এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করেন না। মুসলমানেরা আরবী, ফার্সী এবং বাংলা মিশিয়ে যে সব বাক্য ব্যবহার করেন তা বংলা ভাষায় স্বীকৃত এবং সময় নির্দেশকও বটে। যেমন:

'ক. তুমি 'আসর'-এর নামাজ পড়ে আমার বাড়ি আসবে বলেছিলে, কিন্তু 'মাগরেব' চলে গেল তবু তোমার দেখা পেলাম না।
খ. 'বাদ মাগরেব' মিলাদ-মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে।
গ. আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব 'ইনশাআল্লাহ্'।
ঘ. আপনার ছেলে 'মাশাল্লাহ (মাশ-আল্লাহ)' খুব উন্নতি করবে।
ঙ. যা খেলাম 'নেয়ামত' খেলাম, শুক্র আলহামদুলিল্লাহ্'।'[৬]

কুমারখালীতে খাবার সংক্রান্ত সবকিছুই আল্লাহর নেয়ামত। 'নেয়ামত', 'মাশআল্লাহ্', 'সোবাহানআল্লাহ্', এ জাতীয় শব্দ শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। অশিক্ষিত লোকেরা সৃষ্টি কর্তাকে নানাভাবে স্মরণ করে থাকেন। তার মধ্যে আল্লাহ্, 'আল্লা'র ইচ্ছে' এ জাতীয় শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

কুমারখালীতে ব্যবহৃত এমন কিছু বাক্য। যেমন,
ক. আল্লাহ যা করে ভালোর জন্যিই/জন্যই করে।
খ. আল্লাহর মার দ্যাশের/দেশের বার।
গ. ভক্তিতি ভগবান অভক্তিতি অপমান।
ঘ. কপালে যা ছিল তাই হয়ছে/হয়েছে।
ঙ. ঠিক পতে/পথে থাকিস কানা আধার/আঁধার রাতে পাবি দানা।
ইত্যাদি।

উপরের উদাহরণের 'গ' এবং 'ঙ' নম্বরে 'ভক্তিতি ভগবান অভক্তিতি আপমান' এবং 'ঠিক পথে থাকিস কানা আঁধার রাতে পাবি দানা' এ জাতীয় বাক্য মুসলমান ছাড়াও হিন্দুদের মধ্যেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মুসলমানেরা ইপতার/ইফতার, সেহ্‌রী/শেষ রাতের খাবার, 'ইফতারের সময়' ইত্যাদি শব্দ/বাক্যাংশ ব্যবহার করে থাকেন। 'মুসলমানগণ সময়সূচক কিছু শব্দ কমবেশী ব্যবহার করেন। এ শব্দগুলো নামাযের সময়ের সাথে সম্পর্কিত। ...

ক. ফজর ওয়াক্ত - ভোর।
খ. জোহর ওয়াক্ত - দুপুর।
গ. আসর ওয়াক্ত - বিকেল।
ঘ. মাগরিবের ওয়াক্ত - সন্ধ্যা।
ঙ. এশার ওয়াক্ত - রাত আট টা/ন' টা।

এগুলো ছাড়া 'বাদ মাগরেব' (সন্ধ্যার পরে) বাদ 'জুমা' (জুমার পরে) ইত্যাদি শব্দও মুসলমানগণ ব্যবহার করেন।'[৭] কুমারখালীতে ইফতারের সময়ও সময় নির্দেশক। তাছাড়া তাহাজ্জতের নামাজের ওয়াক্ত' বললে ভোরবেলার পূর্ব অর্থাৎ মধ্যরাত ও ভোর রাতের মাঝামাঝি সময়ের শেষ সময়কে বোঝানো হয়। 'মুসলমানদের মধ্যে 'শ্রী' এবং 'লক্ষ্মী'র ব্যবহার না থাকলেও, 'বিশ্রী', 'কুশ্রী', 'সুশ্রী', 'অলক্ষ্মী', 'লক্ষ্মিটি শোন' প্রায়শ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।'[৮]

কুমারখালীতে মুসলমানদের ব্যবহৃত ভাষার বাক্যাংশে 'শ্রী' ও 'লক্ষ্মি'র ব্যবহার আছে। যেমন :

Dhaka University Institutional Repository

- শরীরের কি শ্রী।
- যেই না শ্রী।
- কথার শ্রী দেখ।
- আমার লক্ষ্মী।
- লক্ষ্মী না ভাল।

ইত্যাদি।

ভাষা মানুষের মনের কথা বলে, মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, মানুষের ভাল লাগা, মন্দ লাগা সব কিছুই ভাষা ধারণ করে। ধর্মীয় প্রভাব, ধর্মীয় বিশ্বাসবোধ, ধর্মীয় বিধান সবকিছুই ভাষার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। বাঙালী মুসলমান সমাজেও কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয়ে আসছে যেগুলো বিশেষভাবে মুসলমানেরাই আধিকভাবে ব্যবহার করে থাকেন। কুমারখালীর মুসলমানেরাও বিশেষ কিছু শব্দ অথবা বাক্যাংশ ব্যবহার করে থাকেন যা অন্য ধর্মের লোকেরা খুব একটা ব্যবহার করেন না। এই বিশেষ কিছু শব্দ অথবা 'বাক্যাংশ'কেই মুসলমাদের ভাষা বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. ১২৫ তম বর্ষপূর্তি স্মরণিকা (১৮৬৯-১৯৯৪), ১৯৯৪, কুমারখালী পৌরসভা, কুষ্টিয়া, পৃ. ১১২।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

৪. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৬, রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, কলিকাতা, পৃ. ৪৬০।

৫. মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী, মনসুর মুসা (সম্পা.), ১৯৯৪, বাংলা একাডেমী ঢাকা, পৃ. ৫২৯।

৬. রাজীব হুমায়ুন, ১৯৯৩, সমাজভাষাবিজ্ঞান, দ্বীপ প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৯৭।

৭. প্রগুক্ত, পৃ. ৭০।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

পেশাগত ভাষা

আঞ্চলিক ভাষা বিন্যাস ও সামাজিক ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি পেশাগত বৈশিষ্ট্যের জন্যেও ভাষার পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। অনেক সময় সাধারণ চাকুরিজীবী, ধর্মযাজক, আইনজীবী, সৈনিক, অভিনেতা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে ভাষাগত বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকটি পেশার ক্ষেত্রে ভাষাভাষীরা নিজেদের অলক্ষ্যেই ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে থাকেন।[১] পেশাগত কারণে ভাষার যে দিক রয়েছে তা হলো এক এক পেশার লোক এক এক রকম ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। অর্থাৎ এক পেশার ভাষাভাষীদের বুলিভান্ডারে এমন বিশেষ কিছু শব্দ বা খন্ডবাক্য কিংবা বাক্য রয়েছে তা অন্যপেশার ভাষাভাষীরা খুব একটা জানেন না বা জানার প্রয়োজনীয়তা আছে তা মনে করেন না।

এখানে বিশেষ কিছু শব্দ বা খন্ডবাক্য কিংবা বাক্য বলতে বোঝানো হচ্ছে যে প্রতিটি পেশায় ভিন্নতা আছে, পেশার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দ বা খন্ডবাক্য ব্যবহৃত হয়। মানুষের নিজের প্রয়োজনে ক্ষমতা ও যোগ্যতা বলে মানুষ এক এক পেশায় আত্মনিয়োগ করে থাকে। কুমাখালীতে দেখা যায় এমন কিছু পেশা আছে যা জন্মগত কারণে অর্থাৎ বাবার পেশায় পরবর্তীতে সন্তানের পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

প্রায় অধিকাংশ পেশাতেই ব্যবহার্য ও অতিপ্রয়োজনীয় কিছু বস্তু থাকে। মূলত গ্রাম্য পরিবেশে যে সব পেশা দেখতে পাওয়া যায় সেখানে বস্তুর বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ বিশেষ পেশায় বিশেষ বিশেষ বস্তু বা দরকারী জিনিস ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পেশার ক্ষেত্রে বস্তু ছাড়া আর যা থাকে তা হলো বিশেষ বাচন ভঙ্গি। বিশেষ বাচন ভঙ্গি বলতে জেলেদের মাছ বিক্রি করবার জন্য ব্যবহৃত ভাষা আর ছাত্রদের পড়ানোর জন্য ব্যবহৃত শিক্ষকের ভাষা এক রকম হয় না। অর্থাৎ পেশার কারণে বাচন ভঙ্গির পার্থক্য হতে পারে। 'শিক্ষকতার ক্ষেত্রে উচ্চ স্বরাঘাতপূর্ণ দীর্ঘ বাক্যের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময় বেতার বা টেলিভিশন ঘোষক-ঘোষিকা, বিশেষত সংবাদ পাঠকের ভাষার স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়।[২]

পেশাগত ভাষার বিষয়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, পেশার ব্যবহার্য কিছু বস্তু বা বিষয় এবং দ্বিতীয়ত, পেশার বিশেষ বাচন ভঙ্গি বা ভাষিক প্রয়োগিকতা। পেশার ব্যবহার্য কিছু বস্তু বা বিষয় থাকে। পেশা কখনও একই স্তরের কিংবা একই রকমের হয় না। পেশায় যেমন বৈচিত্র্য আছে, তেমনি আছে পার্থক্য। প্রতিটি পেশায় যেমন ভিন্নতা আছে, তেমনি প্রতিটি পেশায় ব্যবহৃত বস্তুর মধ্যে পার্থক্য আছে। পেশাগত পার্থক্য না থাকলে সামাজিকভাবে উঁচু-নিচুর বিষয়টি জন্মলাভ করতো না। পেশাগত অবস্থানই বর্তমান আধুনিক সমাজের সামাজিক স্তর বিন্যাসের মূল হাতিয়ার হিসেবে অনেকাংশে অবস্থান করছে। একজন শিক্ষিত লোকের যেমন বই, খাতা, কলম ইত্যাদির প্রয়োজন তেমনি একজন কৃষকের প্রয়োজন লাঙ্গল, জমি, বীজ ইত্যাদি। আবার একজন উকিল, ডাক্তার কিংবা সিনেমার অভিনেতার পেশার জন্যও কিছু বস্তু আছে। বস্তুকে বাদ দিয়ে পেশা কল্পনা যায় না। ডাক্তারের পেশায় যা ব্যবহৃত হয়, কৃষকের কাছে তা মূল্যহীন। তেমনি তাঁতীর পেশায় যে জিনিসের প্রয়োজন, কামার কিংবা কুমারের সে রকম জিনিসের কোন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনের নিত্যতা ও প্রয়োজনহীনতা ভাষার জগতকে আলোড়িত করে। ভাষা ছাড়া বস্তুকে চেনা যায় না, জানা যায় না। পৃথক পৃথক পেশায় ব্যবহৃত জিনিস বা বস্তুকে চেনার জন্য ভাষায় পৃথক পৃথক নামে পেশাগত জিনিসগুলো অবস্থান করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা যেমন পরিবর্তনশীল পেশাগত ভাষাও তেমনি সমাজের প্রয়োজনে পরিবর্তিত হতে পারে। সমাজের প্রয়োজন বলতে মানুষের পেশায় ব্যবহৃত যন্ত্রের আধুনিকায়নের জন্য একই পেশার বস্তুর নতুন আধুনিক যন্ত্রের আবিষ্কারের জন্য নতুন নতুন নামের সংযোজন হতে পারে। নতুন নতুন নামের ভিড়ে হয়তো প্রাচীন নাম কখনও কখনও হারিয়ে যেতে পারে। যেমন, কৃষিকাজে বর্তমানে যেমন পাওয়ার টিলার, ডিপ টিউবয়েল ইত্যাদি ব্যবহৃত হচ্ছে। ৩০/৪০ বছর পূর্বে গ্রামের কৃষকেরা কৃষি কাজের এ সব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের নাম জানতেন না। গ্রামের লোকেরা এখন আর গরুর কাঁধে জোয়াল দিয়ে জমি চাষ করতে চায় না। অর্থাৎ জমি চাষ করার জন্য যে লাঙ্গলের প্রয়োজন হতো, বর্তমানে সে লাঙ্গলের কদর কমে গিয়ে যান্ত্রিক লাঙ্গলের ব্যবহার শুরু হয়েছে। কৃষি কাজের কোন পরিবর্তন হয় নি। কিন্তু কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রের পরিবর্তন হয়েছে বা হতে চলেছে। এভাবে পেশায় ব্যবহৃত যন্ত্রের আধুনিকায়নের জন্য পেশাগত ভাষার পরিবর্তন হতে পারে।

প্রতিটি পেশার বিশেষ বাচন ভঙ্গি বা ভাষিক প্রায়োগিকতা লক্ষ্য করা যায়। ভাষিক প্রায়োগিকতা দ্বারা পেশাগত ভাষা তার মৌলিকত্ব রক্ষা করে চলে। 'টেলিভিশন বা সংবাদপত্রে ফ্যাশন জগতের বিজ্ঞাপনেও কিছুসংখ্যক নির্বাচিত রূপমূল লক্ষ্য করা যায় ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্য। এই শ্রেণীর বিজ্ঞাপন-ভাষা চিঠিপত্র বা অন্যান্য যোগাযোগের ক্ষেত্রেই শ্রেণীগত ভাষার বৈশিষ্ট্য সর্বত্রই লক্ষণীয়।'[৩] 'সংবাদপত্রেও দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সংবাদপত্র বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয়। যেমন, দুপুরে প্রকাশিত নগর সংস্করণের জন্যে লিখিত 'সিটি এডিসন', কিন্তু শেষ রাত্রির 'চূড়ান্ত সংস্করণ', 'অতিরিক্ত শেষ সংস্করণ'-এর তাৎপর্য সব সময় অনুধাবন করা কঠিন।'[৪] পেশাগত ভাষার ভাষিক প্রায়োগিকতা সব সময়ই যে একই রকম থাকে তা কিন্তু নয়। একজন শিক্ষক তার পেশার জন্য পাঠ্যবই রচনা করতে পারেন। পাঠ্যবইতে যে ভাষা থাকে, তা এক রকম। কিন্তু ঐ শিক্ষকই পেশার কারণে ক্লাসে ছাত্রদের পড়িয়ে থাকেন। ছাত্রদের ক্লাসে পড়ানোর ভাষা অন্য রকম। অর্থাৎ ক্লাসে ছাত্রদের পড়ানোর ভাষা ও পাঠ্যবই লেখার ভাষা এক রকম নাও হতে পারে। একই পেশা, একই ব্যক্তি, তবুও পেশাগত ভাষায় পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় বা যেতে পারে।

পেশাগত ভাষাকে কোন কোন ভাষাবিজ্ঞানী রেজিস্টারের আওতায় ফেলতে চেয়েছেন। রেজিস্টার হলো, 'প্রসঙ্গ বিষয়ে ভাষা খুবই সূক্ষ্মবেদী (sensitive)। প্রসঙ্গ যখন বদলে যায় ভাষা ব্যবহারেরও হেরফের হয়– বিষয়ের সঙ্গে ভাষার হেরফেরকে সমাজ ভাষাবিজ্ঞানে রেজিস্টার বলা হয়।'[৫] অর্থাৎ পেশাগত ভাষার সাথে রেজিস্টারের কিছুটা মিল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 'কোনো কোনো ব্রিটিশ এবং মার্কিন ভাষাবিদ রেজিস্টারকে একটু সীমিত অর্থে ব্যবহার করে থাকেন– রেজিস্টারকে অনেক সময় বলা হয় functional variety বা নির্বাহনগত বুলি। তাঁদের মতে পেশাগত কারণে যে বাক ভিন্নতা দেখা যায়, তা-ই রেজিস্টার। এই ভিন্নতা কেবলমাত্র শব্দের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। তাঁদের মতে রেজিস্টার কিছু শব্দ দ্বারা চিহ্নিত তথা সীমিত বুলি বিশেষ। একই পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা যে বুলি ব্যবহার করে থাকে তা হচ্ছে রেজিস্টার, যেমন বিজ্ঞানী, ডাক্তার, উকিল ইত্যাদি ব্যবহৃত বুলি বিশেষ। অথবা যে গোষ্ঠীর মধ্যে একই স্বহিত (interest) কাজ করছে, যেমন ফুটবল প্রেমী, ডাকটিকিট সংগ্রাহক ইত্যাদি তাদের ব্যবহৃত বুলি।'[৬]

পেশাগত ভাষার সাথে রেজিস্টারের যে মিল রয়েছে তা-ই হয়তো পেশাগত ভাষাকে রেজিস্টারের খুব কাছাকাছি এনেছে। কিন্তু পেশাগত ভাষা আর রেজিস্টারের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। পেশাগত ভাষা ব্যবহার ও তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। 'ভাষাবিজ্ঞানের প্রচলিত তথা প্রথাগত ব্যাখ্যায় রেজিস্টার শব্দ দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকে। বলা হয় রেজিস্টার হল পেশাগত বুলি। রেজিস্টার

Dhaka University Institutional Repository

একেবারেই তা নয়। এক পেশার শব্দ অবলীলায় অন্য পেশায় অনুপ্রবেশ করে থাকে, তখন তাকে পেশা– বিশেষের শব্দ বলে চিহ্নিত করার আর কোনো উপায় থাকে না। ... রেজিস্টার হল প্রতিবেশ-গ্রাহী ভাষার ব্যবহার– তা কোনো নির্দিষ্ট শব্দের ওপর নির্ভর করে না। রেজিস্টার নির্ভর করে প্রসঙ্গ প্রতিবেশের ওপর এবং সেই প্রসঙ্গ/প্রতিবেশে বিশেষ সংকথনের (utterance) ওপর। একটি সংকথন কিভাবে কী বার্তা বয়ে আনছে তারই ওপর নির্ভর করছে রেজিস্টার — বিবেচ্য বিষয় শব্দ নয়, একটি সমগ্র সংকথন (দ্র মন্ট্গোমারি ১৯৮৬ : ১০১-১০৩)।" রেজিস্টার নিয়ে আলোচনা করা মূখ্য উদ্দেশ্য নয়। এমনকি রেজিস্টারের সাথে পেশাগত ভাষার পার্থক্য কিংবা সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা করা লক্ষ্য নয়। পেশাগত ভাষা আলোচনা ও পর্যালোচনা করাই হলো মূল লক্ষ্য। বিশেষ করে কুমারখালীর পেশাগত ভাষার অবস্থান কেমন তা পর্যালোচনা করার অবশ্যকতা রয়েছে। কুমাখালীতে পেশাগত যে দিক রয়েছে তা হলো:

- কৃষিজীবী
- তাঁতী সম্প্রদায়
- জেলে
- কামার
- কুমার
- কর্মকার
- চাকুরিজীবী
- ব্যবসা-বাণিজ্য

ইত্যাদি।

পেশাগত কারণে বিশেষ পেশার জন্য বিশেষ কিছু বস্তু বা যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। এক পেশায় যে সব বস্তু বা যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অন্য পেশায় তা খুব একটা প্রয়োজন হয় না। এক পেশার বস্তু বা যন্ত্র অন্য পেশায় প্রয়োজন না হলে সে বস্তুর বা যন্ত্রের নাম সঙ্গত কারণেই সবার জানার দরকার হয় না। কুমারখালীর পেশাভিত্তিক যে সব শব্দ লক্ষ্য করা যায় সে বিষয়ে যাওয়ার পূর্বে উল্লেখ করার আবশ্যকতা আছে যে, পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তুর নাম বিষয়ক শব্দগুলো সরাসরি কুমারখালীর পেশার লোকদের নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এবং পেশাভিত্তিক শব্দগুলো কুমারখালীর লোকের মৌখিক উচ্চারণ অনুযায়ী উল্লেখ করা হলো। যেমন কৃষকের ব্যবহৃত কিছু শব্দ:

নাঙলা গরু/লাঙলা গরু, নাঙলা নড়ি/নাঙলা লাঠি, কাদল, পলা, মলন, মলনমলা, মুখোট/মুকোট, লাঙ্গল, জোঙাল, লাঙলের ফাল, সোঙাল, খ্যাড়, খ্যাড়ের পালা, লাঙ্গলের কুটো, লাঙ্গলের ইস, লাঙ্গলের ইস্তা, মই, একহালে মই, দো-হালে মই, নাঙলে, কাচি, কোদাল, নিড়েন ইত্যাদি। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হলো বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সৃষ্টির ছোঁয়া গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এখন গ্রামের লোকেরা পাওয়ারটিলার দিয়ে জমি চাষ করা ধরেছে। ধান ছড়ানোর জন্য মেশিনের ব্যবহার শুরু হয়েছে এবং ডীপ টিউবয়েলের মাধ্যমে পানি তুলে জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ সব কারণে কৃষিজীবীদের শব্দ ভান্ডারে নতুন নতুন শব্দের সংগ্রহ দিন দিন বেড়েই চলেছে। যদিও শব্দগুলো ইংরেজী ভাষার এবং আক্ষরিক অনুবাদের মাধ্যমে বাংলায় এসেছে। একই সাথে নতুন শব্দ ধীরে ধীরে ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন শব্দ ভান্ডারের উপর আবছা ছায়া ফেলে তার অগ্রযাত্রাকে জানান দিতে শুরু করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁতী সম্প্রদায়ের নিজস্ব কিছু শব্দ আছে। কুমারখালীতে তাঁত শিল্পের প্রসার ঘটেছে বিস্ময়করভাবে। 'কুমারখালী থেকে ৬ মাইল দক্ষিণে পানটিহাটে অত্র এলাকার তাঁতীরা ১৯০৬ সালে কাপড় বেচা-কেনা শুরু করে। ... তাঁত শিল্পের উপর শহর ও শহরের আশেপাশের প্রায় ২০ হাজার পরিবার নির্ভর করে বেঁচে আছে।'[৯] 'এই শহরে ৩০৬টি ফ্যাক্টরীতে ৬২৪২ খানা চিত্তরঞ্জন তাঁত ও ৩৪৮ খানা পাওয়ার লুম, ৭টি টুইস্টিং ফ্যাক্টরী, ৯৭৬ খানা পিটলুম গড়ে উঠেছে। এখন কুমারখালী শহর সারা দেশে তাঁতী প্রধান শহর রূপে খ্যাতি লাভ করেছে।'[১০] শুধু শহরকেন্দ্রীক না বলে তাঁত শিল্পের প্রসারের বিষয়টি কুমারখালীর প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে তা বলাই শ্রেয়। তাঁত শিল্প ছাড়া অন্য কোন শিল্প কুমারখালীতে ব্যাপকতা লাভ করেছে তা বলা যায় না। তাঁতীদের পেশাগত কারণে ব্যবহৃত শব্দের দিকে এবার নজর দেয়া যেতে পারে। যা নিজেদের মধ্যে শুধুমাত্র তাঁতীরাই ব্যবহার করে থাকেন। যেমন:

ত্যানা/তান কাড়ানো, সর/শর, চরকা, ডাঙি, হাতা, কাতা, ধাগা/মাল দড়ি, লোহার টাকো, বাশদড়ি, তাত, মুটকাঠ, পাখা, আড়াকাঠ, পাড়নকাঠ, রেল, লোহার মাকু, নলি, ম্যাড়া, ব্যালন, খোল, লোহার ছিক, কানজুত, শানা, কোল নোড়াজ, বান নোড়াজ, উশরি, ডাঙ্গি, বশশর, প্যারাস্যুটের 'ব', ব্যাল্লা, পাশা, খুটো, বাশের চটা, জোয়া, বাশের তৈরী কল, তারাজুত, মুড়ালি, কাঠের মুঠো, তাশুন, মুড়ো বাছা, গোড়া বালি, মাজন, হিড়, আড়, ড্রাম, খাচি, কাপড় পেচানো খোড়া ইত্যাদি।

কুমারখালীর মাঝ দিয়ে পদ্মার প্রধান শাখা গড়াই নদী বয়ে গেছে। পূর্বে কুমারখালীতে অসংখ্য খাল, বিল, পুকুরসহ অন্যান্য জলাশয়ে মাছের উপস্থিতি ছিল ঈর্ষণীয়। তবে বর্তমানে শুষ্ক মৌসুমে পদ্মায় পানি কম থাকায় গড়াই নদীতে তার প্রভাব পড়ে থাকে। শুষ্ক মৌসুমে পানির স্বল্পতার কারণে কুমারখালীর বড় বড় খাল, বিলের পানি শুকিয়ে যাওয়ার জন্য মাছের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। মাছ শিকারের উপর নির্ভর করা পরিবারগুলো ধীরে ধীরে অন্য পেশার দিকে ঝুঁকছে। তবুও জেলে সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব পেশাকে লালন করে চলেছে আপন মনে। জেলেদের জাল সংক্রান্ত কিছু শব্দ বা খন্ডবাক্য আছে, যা অন্য পেশার লোক তাদের মত জানেন না বা জানার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না। জেলে সম্প্রদায়ের পেশাগত নিজস্ব শব্দ যেমন: জাল, মৌসিজাল, পুটোনিজাল/ফুটোনিজাল, ফস্‌সা/ফস্যা জাল, ব্যাড়জাল, পুটিজালা, কইজালা, ফাসিজাল, মইজালা, খরাজালা, সূতিজাল, সাঙলে জাল, বাউলি জাল, ঘানেল ব্যাড়/জাঙলে জাল, টে ব্যাড়, জালের কাটি, টুনি, কাছি/রশি/কাচি, দড়া বা কাচি ইত্যাদি।

কৃষিকাজে ব্যবহৃত লোহার যন্ত্রপাতি এবং গৃহস্থলী কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি কামারেরা তৈরি করে। কামারদের সাথে কৃষকদের মধুর সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। লাঙ্গলের ফাল, কোদাল, দাও, বটি, কাচি, কুড়োল, যাতি, খুরি, শাপল/খুনতা, লাঙলের খিল, টেঙি, ছুরি, খুরপাই, ডাশা, ব্যানা ইত্যাদি কামারেরা তৈরি করে এবং পোড়ায়। কামারদের প্রয়োজনীয় নিজস্ব ব্যবহৃত কিছু শব্দাবলী, যেমন: যাতা, বালা, শিকল, ডুগনি, ধাপা, র‍্যাত/ফাইল, সাঁড়াশি, হাতুর, ছেনী, ঠাসা, পাড়ন, সাপল, আকড়ো, জল ঝাড়ন, চাড়ি, ঘস্না, হানা ইত্যাদি।

মাটির পাত্র তৈরি করে কুমারেরা। বাঙালীদের গ্রাম্য সভ্যতায় মাটির পাত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। কুমারখালীর গ্রামের লোকেরা মাটির পাত্র ব্যবহার করতে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। কুমারদের পেশাগত শব্দ খুব একটা বেশি নয়। কুমারদের পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু শব্দ যেমন: এঁটেল মাটি, খড়ি, বালি, চাক ঘোরানো, পেটম/হাতা, ইঁটে, ঠুঙা (মাটির তৈরি), ডাইস, খাপড়/মালা, কাঁধা, পাগোই ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

কুমারখালীর লোকেরা কর্মকারের দোকান বেশ পছন্দ করে। কুমারখালীর লোক বলতে বিশেষ ভাবে মেয়েদের প্রসঙ্গ একটু বেশি করে বলা প্রয়োজন। তবে এ ক্ষেত্রে টাকা পয়সার বিষয়টি জড়িত। কর্মকারকে কেউ কেউ স্বর্ণকারও বলে থাকে। কর্মকার বলতে সোনার দোকানের কথা বলা হচ্ছে। সোনার গহনা পরতে কুমারখালীর মেয়েরা খুব পছন্দ করে। ইদানিং উঠতি বয়সী তরুণরাও সোনার চেইন অথবা আংটি পরে থাকে। কর্মকারেরা তাদের পেশাগত কারণে কিছু শব্দ ব্যবহার করে। এ গুলো তাদের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির নাম। যেমন: বাকনল, পদিপ, শন্না, প্লাস, কাতানী, অ্যাকাই, হাতুর, নীট ম্যাশিন, ছেনী, চিরাবুলি, খরশান, লালশান, সাদাশান, টিপলি, গুল, নিত্তি, রেত, ব্রাশ, ডীল মেশিন, লোহার প্লেট, রীং রড, খ্যাল খাটে, কমপাশ, যাতি, জামবুরে, রীংবাড়, শামদানী, কাঁশলা, বালা মাজনা, প্যান সেলেট, সোহাগা, চাঁচ, কাটের উপর চাঁচ, মুশ, ডাইশ, গুঁই, প্লাস্টার পাউডার, বরিক, করাতের ডাল, করাত, প্লাস্টার মোম, পাতমেশিন, টার মেশিন, হাওয়া মেশিন, পালিশ মেশিন, আপোর, চটকার বাটি, রিটে ফল, শুয়ারা, নাইটিক অ্যাসিড, সালফারাইটিক অ্যাসিড, নিশে জল ইত্যাদি।

এ ছাড়াও আছে নানা পেশার লোক। যেমন রিক্সা চালক, ব্যবসায়ী ইত্যাদি। তাদেরও শব্দ ভান্ডারে রয়েছে নানা রকম শব্দ। এখানে উল্লেখ থাকে যে, কুমারখালীতে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং কুমারখালীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন এমন ভাষাভাষীদের নিকট থেকে তাদের স্ব স্ব পেশার শব্দগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে।

ভাষার সামাজিক স্তর বিন্যাসের জন্য পেশাভিত্তিক শব্দের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যেমন, 'কামার' এবং 'কর্মকার' শব্দ দুটো কুমারখালীতে স্তর বিন্যাস নির্দেশ করে। 'কামার' বলতে লোহা দিয়ে যারা কাজ করে তাদেরকে বোঝানো হয়। অন্যদিকে 'কর্মকার' বলতে সোনার অলংকার তৈরি করে যারা তাদের বোঝানো হয়। একই সাথে অর্থের বিষয়টি যেমন আসে ঠিক তেমনি সামাজিকভাবে উঁচু নিচুর বিষয়টিও চলে আসে। কর্মকারেরা ধনী ও সামাজিকভাবে উঁচু মর্যাদার এবং কামারেরা গরীব ও সামাজিকভাবে নিচু মর্যাদার।

'জেলে' এবং 'কুমার'দের কুমারখালীতে প্রায় একই রকম দৃষ্টিতে দেখা হয়। সামাজিভাবে এরা খুব ধনী নয় এবং মর্যাদা সম্পন্নও নয়। এদের সাথে কুমারখালীর লোকেরা বয়সভিত্তিক মর্যাদাসূচক সর্বনাম ব্যবহার করে থাকে। বয়সভিত্তিক বলতে বেশি বয়স্কদের সাথে আপনি/আপনে, তুমি/তোমরা এবং কম বয়স্কদের সাথে তুই/তোরা সর্বনামের ব্যবহার চোখে পড়ে।

তাঁতী সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়ে উভয়ই তাঁতের কাজ করে। তাঁতীদের মধ্যে সম্প্রদায়ের বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। তাঁতীদের ছেলে-মেয়েদের তাঁতী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ের প্রচলন দেখা যায়। কৃষকদের সাথে তাঁতীদের সম্প্রদায় সংক্রান্ত উঁচু-নিচুর বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। তাঁতী সম্প্রদায়ের সাথে কৃষকরা বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা করার ব্যাপার ততটা পক্ষপাতী নয়। একই সাথে তাঁতীরাও কৃষক পরিবারের সাথে আত্মীয়তা করতে চায় না। তবে এর ব্যতিক্রম যে একেবারেই নেই, তা নয়।

তাঁতীদের সাথে কৃষকের বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা না করার পেছনে যে বিষয়টি মূখ্য ভূমিকা পালন করে তা হলো, তাঁতীদের বাড়িতে ধান, পাট ও অন্যান্য কৃষিভিত্তিক শস্যের প্রাচুর্য থাকে না, কৃষিকাজ না করার জন্য। তারা বাজার থেকে চাল, ডাল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় শস্য সংগ্রহ করে। কৃষিভিত্তিক শস্যের চাষ না করার জন্য তাঁতীদের বাড়িতে ধূলা-বালি থাকে না। ধূলা-বালির কাজ তাঁতীদের মেয়েরা করতে পারে না। গরুর গোবর হাত দিয়ে ঝুড়িতে তোলা, এমন কাজ সবাই করতে পারে না। অবশ্য অনেক কৃষিজীবীর মেয়েও ধুলা-বালির কাজ করে না বা করতে পারে না। করা না করার বিষয়টি অর্থের

Dhaka University Institutional Repository

ও শিক্ষার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। ধনী কৃষকের মেয়ের আদর আহ্লাদ বেশ লক্ষণীয়। তাছাড়া অশিক্ষিত কৃষক পরিবারের কোন ছেলে কিংবা মেয়ে শিক্ষিত হলে তাকে বেশ মূল্যায়ন করা হয়।

কৃষকের মেয়ে তাঁতের কাজ জানে না। রাত নেই, দিন নেই যখন তখন তাঁতের কাজ করতে হয়, তাঁতীদের মেয়েদের। সূতা নিয়ে নাড়া-চাড়া করার মত ধৈর্য সবার থাকে না। গরীব তাঁতী পরিবারে কৃষকের মেয়ের বিয়ে হলে তার দুঃখের সীমা থাকে না। কারণ তাঁতের কাজ শিখে নিয়ে পরিবারের সবার মনরক্ষা করা নতুন বউয়ের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। তবে ধনী তাঁতীদের প্রসঙ্গ আবার একটু অন্যরকম। তারা এখন আর খুব একটা তাঁতে বসে না। ব্যবসা-বাণিজ্য বা চাকুরির মত পেশায় তারা আত্মনিয়োগ করার চেষ্টা করছে। এ ধরণের পরিবারের সাথে আত্মীয়তা হতে পারে কৃষকের বা অন্যকোন পেশার লোকের।

অন্য আর একটি বিষয় কুমারখালীতে লক্ষ্য করা গেছে তা হলো তাঁতী সম্প্রদায়ের লোকেরা অপেক্ষাকৃত নিরীহ প্রকৃতির। নিজের পেশার কাজ নিজের বাড়িতে অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে গিয়ে করে। রোদের মধ্যে খুব একটা কাজ করতে হয় না। আত্মীয় পরিজন বেষ্টিত তাঁতী সম্প্রদায়ের লোকদের আচার ব্যবহারের মধ্যে খুব একটা রুক্ষতা লক্ষ্য করা যায় না। কৃষকদের আচার ব্যবহার যে খারাপ তা নয়, তবে রোদ-বৃষ্টিতে পোড়া কৃষকদের মন-মেজাজ সব সময় ঠান্ডা থাকে না।

প্রতিটি পেশার জন্য যেমন ভিন্ন ভিন্ন কিছু শব্দ আছে, তেমনি প্রতিটি পেশার ভাষার মধ্যেও পার্থক্য আছে। তবে পেশাগত ভাষায় যা দেখা যায় তা হলো এক পেশার ভাষা যে শুধুমাত্র সে পেশার জন্যই রক্ষিত থাকে তা কিন্তু নয়। যেমন, কুমারখালীতে জেলেরা গ্রামে মাছ বিক্রি করতে বের হয়। আবার কুমারেরা গ্রামে তাদের তৈরি কলস, চাড়ি, মালসা, চাপিন/ঢাকুন ইত্যাদি বিক্রি করতে যায়। তাদের ভাষার দিকে একটু নজর দেয়া যেতে পারে।

জেলেদের ভাষা :
ক. মাছ নেবেন গো ভাল মাছ আছে।
খ. তাজা মাছ ছিল।
গ. মাছ... মাছ নেবেন গো।
ঘ. পুটি, চিংড়ি, মুদে মাছ আছে।

কুমারদের ভাষা :
ক. মা শগল মাল নিয়ে আইচি।
খ. চাড়ি আছে কোলা আছে।
গ. নেবেন গো মালসা আছে চাপিন আছে।
ঘ. কলস, ক-ল-স ভাল ঠিলে আছে।

উপরের উদাহরণে গ্রামে ফেরী করে মাছ ও মাটির পাত্র বিক্রি করার যে ভাষা জেলে ও কুমারদের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা থেকে বলা যায় উভয়ের ভাষার মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। তবে পার্থক্য আছে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যাওয়া মাছ ও মাটির পাত্রের বিষয়ে। কুমারখালীতে 'কলস'কে 'ঠিলে'ও বলা হয়। জেলে এবং কুমার উভয়েই বেশ জোরে জোরে চিৎকার করে তাদের জিনিস বা বিষয়ের নাম বলে থাকেন। কুমারখালীতে 'মলা' মাছ খুব একটা কেউ বলেন না। ছোট ছোট অনেক রকমের মেশানো মাছকে এক সাথে 'গুদোমাছ' বলা হয়। তাছাড়া 'মলা' মাছকে কুমারখালীতে 'মুদে' মাছ বলা হয়।

জেলে যখন বাজারে মাছ বিক্রি করে তখন কিন্তু সে প্রথমে কথা বলে না। কিংবা জোরে জোরে চিৎকারের সুরে কথা বলে না। তখন খরিদ্দার গিয়েই প্রথমে মাছের দাম জিজ্ঞাসা করে। কুমারদের ক্ষেত্রেও বিষয়টি একইভাবে প্রযোজ্য।

Dhaka University Institutional Repository

কুমারখালীতে ফেরীওয়ালাদের পেশাগত ভাষা আছে। যে বা যারা ফেরী করে মালামাল বিক্রি করে বেড়ায় তাদেরকে ফেরীওয়ালা বলা হয়। কিন্তু কুমারখালীতে 'ফেরীওয়ালা' শব্দটিকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। জেলেরা কিংবা কুমারেরা ফেরী করে মাছ বা জিনিসপত্র বিক্রি করলেও তাদের 'ফেরীওয়ালা' বলা হয় না। যারা চুড়ি, লিপিস্টিক, চুলের ফিতা, আলতা ইত্যাদি অর্থাৎ মহিলাদের ব্যবহার্য জিনিসপত্র বিক্রয় করে কুমারখালীতে তাদের ফেরীওয়ালা বলা হয়ে থাকে। আবার সিলভারের হাড়ি, পাতিল, কিংবা প্লাস্টিকের থালা, বদনা ইত্যাদি যারা ফেরী করে বিক্রি করে বেড়ায় তাদেরও কেউ 'ফেরীওয়ালা' বলে না। গ্রামে মেয়েদের শাড়ী-কাপড় যারা বিক্রি করে তাদেরও ফেরীওয়ালা বলা হয় না। বরং বলা হয় কাপড়ওয়ালা, হাড়িবাসুন বেচা ওয়ালা ইত্যাদি। 'ফেরীওয়ালা'দের ভাষা যেমন:

ক. নেবেন গো চুড়ি আছে, লিপিস্টিক।
খ. চুলের ফিতে আছে, লাল ফিতে।
গ. নেবেন হাড়ি পাতিল ছিল, বদনা।
ঘ. সিলবারের জিনিস আছে।
ঙ. শাড়ী নেবেন... এক নম্বর ভাল শাড়ী।

অর্থাৎ ফেরীওয়ালাদের ভাষা প্রায় একই রকম। শুধুমাত্র বিষয়ের নাম পরিবর্তন হচ্ছে মাত্র। কুমারখালীতে 'বিক্রি' শব্দটির স্থলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'বেচা' শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। 'সিলভার' শব্দটি কুমারখালীতে প্রায় ক্ষেত্রেই 'সিলবার' হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ফেরীওয়ালাদের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় তা হলো, ফেরীওয়ালারা সবাই একই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নয়। ফেরীওয়ালাদের মধ্যে ধর্মগত পার্থক্য আছে। ধর্মগত পার্থক্যের কারণে ভাষায় তার প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে কামার, কুমার ও জেলে সম্প্রদায়ের লোকেরা হিন্দু ধর্মের অনুসারী। কর্মকার কিংবা স্বর্ণকারেরাও সবাই হিন্দু ছিল। বর্তমানে মুসলমানদেরও কর্মকারের কাজের প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

একই এলাকার ফেরীওয়ালা কিংবা ব্যবসায়ী হওয়ার জন্য অনেকেই অনেককে চেনে, জানে। এমনকি মহিলারা পর্যন্ত ফেরীওয়ালাদের চিনতে ভুল করে না। পরিচিত হওয়ার জন্য একে অপরের সাথে কুশলাদি বিনিময় করে। কুশলাদি বিনিময়ের সময় ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, পরিচিত একজন কুমার কৃষকের চেলেকে দেখে বলছে,

'ক্যামন আছো গো? তোমার বাবা কোতায়?'

এখানে কুমার বলে নি যে, 'তোমার আব্বা কোতায়?' 'কোথায়' শব্দটি কুমারখালীতে কখনও কখনও কোতায় হিসেবে অশিক্ষিতদের মধ্যে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। মুসলমানেরা পিতার ক্ষেত্রে 'বাবা' শব্দটি ব্যবহার না করে 'আব্বা'ই বেশী ব্যবহার করে থাকে।

কুমাররা সাধারণত: হিন্দুদের মধ্যে ব্যবহৃত সম্বন্ধসূচক সর্বনামই ব্যবহার করে। তবে মুসলমানেরা কুমারদের সাথে 'ভাই' না বলে 'দাদা' এবং 'চাচা' না বলে 'কাকা' বলেই সম্বোধন করে। অর্থাৎ মুসলমানেরা কুমারদের সাথে মুসলমানদের ব্যবহৃত সর্বনাম ব্যবহার না করে হিন্দুদের সম্বোধনসূচক সর্বনাম ব্যবহার করে। শুধুমাত্র কুমারের বেলায় নয়, অধিকাংশ হিন্দুদের সাথেই মুসলমানেরা কথা বলার সময় হিন্দুদের সম্বোধনসূচক ভাষিক প্রয়োগরীতির প্রতি বিশেষ ভাবে নজর দেয়ার চেষ্টা করে। হিন্দুদের বেলায় কিন্তু এই দিকটি অনুপস্থিত। অনেক মুসলমান ভেবে থাকে যে হিন্দুদের 'দাদা' না বলে 'ভাই' বললে কিংবা 'কাকা' না বলে 'চাচা' বললে হিন্দুভদ্রলোক কিছু মনে করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

কুমারখালীতে সব থেকে নিচু পেশা হলো ভিক্ষাবৃত্তি। ফকিরদের নিজস্ব পেশাগত ভাষা আছে। তাদের পেশাগত ভাষায় তারা ভিক্ষে করে থাকে। মুসলমান ফকিররা সাধারণত আল্লাহ্‌র নাম বলে ভিক্ষে করে। তারা মাথায় টুপি পরে। আল্লার নাম বললে এবং মাথায় টুপি থাকলে ধর্মভীরু গ্রাম্য মহিলারা ফকিরদের কিছুটা বেশী ভিক্ষে দিয়ে থাকে। কোন কোন মহিলা মনে করে ফকিরদের ভিক্ষে দিলে আয় রোজগার বেশী হয়।

হিন্দু ভিক্ষুকেরা কিন্তু ভগবানের কিংবা ঈশ্বরের নাম বলে ভিক্ষে করে না। তারা সরাসরি বিনীত ভাবে ভিক্ষে চেয়ে থাকে। কুমারখালীতে ফকিরেরা যেভাবে ভিক্ষা করে তা হলো:

ক. লাইলা-হা-ইল্লেল্লাহ্ মা জোনোনি গুটাদু ভিক্ষে দেন/দ্যান গো, মা আপনার দ্বারে একটা ফকির আছে।

খ. মা আল্লার ওয়াচতে কিছু দান খয়রাত করবেন গো।

গ. ও মা অ্যাকমুট ভিক্ষে দেন গো, আল্লা আপনের আয় রুজগার দিবি।

ঘ. আল্লার ওয়াচতে একমুট ভিক্ষে দেন গো। মাক ছেলেপেলে ভাল থাকপি। রোগব্যধির হাত থেকে রিহাই পাবি।

ঙ. মা অ্যাক মুট ভিক্ষে দ্যান গো।

চ. মা গুটাদু ভিক্ষের জন্যি আইছি।

ছ. কিছু সাহায্য করবেন গো।

উপরের উদাহরণে ক, খ, গ এবং ঘ নম্বরে মুসলমান ফকিররা যে ভাবে ভিক্ষে চায় তা দেখানো হয়েছে। আর ঙ, চ এবং ছ নম্বরে হিন্দু ফকিররা যেভাবে ভিক্ষে চায় তা দেখানো হয়েছে। মুসলমান ফকিররা প্রতিক্ষেত্রেই আল্লার নাম বলে ভিক্ষে চেয়েছে। মুসলমান ফকিররা তাদের পেশায় আল্লাহ্ শব্দটিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু হিন্দু ফকিররা ভিক্ষে চাওয়ার সময় ভগবান কিংবা ঈশ্বরের নাম একবারও ব্যবহার করে নি। তাহলে একই এলাকার ও একই পেশাগত ভাষার মধ্যে ধর্মের কারণে পেশাগত ভাষা ব্যবহারে পার্থক্য থাকতে পারে।

ফকিরদের ভিক্ষে না দিলে যে ভাবে তাদেরকে বিদায় দেয়া হয় তা হলো:

ক. মাফ করো গো।

খ. দিতি পাল্লাম না, হাতে কাম/কাচ/কাজ আছে।

গ. ও গো ব্যাটা/বিটি/তোমাকে মাফ কত্তি বল্লাম।

কুমারখালীতে ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে পেশাগত ভাষা দেখা যায় তা প্রায় একই রকম। শুধুমাত্র বস্তু বা বিষয়ের নামের শব্দ ও ভাষার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন- চাউল ব্যবসায়ী, লবন ব্যবসায়ী, কাপড় ব্যবসায়ী, রড-সিমেন্ট ব্যবসায়ীদের পেশাগত ভাষা। এদের পেশাগত ভাষার মধ্যে শুধুমাত্র বিষয় বা বস্তুর ওজন, দাম অথবা ক্রেতা কি পরিমাণ ক্রয় করবে ইত্যাদি বিষয়ক শব্দাবলীর পার্থক্য দেখা যায়। যেমন:

ক. চাল কত করে কেজি?

খ. শার্টের পিচটার দাম কত?

গ. এক বস্তা সিমেন্টের দাম কত?

ক'. সতের টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

খ'. একশ' দশ টাকা।
গ'. তিনশ' পঁচিশ টাকা।

উদাহরণে চাউল, কাপড় ও সিমেন্টের ব্যবসায়ীর সাথে ক্রেতার ভাষা ব্যবহার দেখানো হয়েছে। ক, খ এবং গ নম্বর উদহরণে ক্রেতার ভাষা ব্যবহার এবং ক', খ' ও গ' নম্বর উদাহরণে ব্যবসায়ীদের ভাষা ব্যবহার দেখানো হয়েছে। প্রতিক্ষেত্রেই ব্যবসায়ীদের পেশাগত ভাষা প্রায় একই রকম। তবে চাউলের ব্যবসায়ী আর কাপড়ের ব্যবসায়ীর মধ্যে পার্থক্য আছে। কারণ কুমারখালীতে কাপড়ের ব্যবসায়ীরা কাপড় বিক্রি করার পূর্বে বেশ কিছু কথা বলে। যেমন: 'আগে পছন্দ করেন', 'দামে বাদবিনানে' ইত্যাদি।

চাউলের ব্যবসায়ী কিংবা সিমেন্টের ব্যবসায়ীরা পছন্দ অপছন্দের বিষয়টি খুব একটা বলে না। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চিঠিপত্রের ভাষা আছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যভাব পরিলক্ষিত হয়।

রিক্সা বা ভ্যান চালকের পেশাগত ভাষা আছে। রিক্সা কিংবা ভ্যান চালকের সাথে যখন ভাষা ব্যবহার করা হয় তখন কিছু কিছু ক্ষেত্রে অর্থ বুঝে নিতে হয়। যেমন:

ক. এই যাবা?
অর্থ. রিক্সা বা ভ্যান ভাড়া যাবে কি না?

খ. কত?
অর্থ: ভাড়া কত?

গ. যাবেন, চলেন যাই।
অর্থ: রিক্সা কিংবা ভ্যানে যাবেন কি না।

কুমারখালীর সাধারণ লোকেরা সাধারণত অপরিচিত কাউকে কিংবা পরিচিত শিক্ষক ছাড়া সাধারণ চাকুরিজীবীদের স্যার বলে খুব একটা সম্বোধন করে না। তবে পুলিশকে অশিক্ষিত কিংবা অল্পশিক্ষিত লোকেরা প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই স্যার বলে। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর পেশাকে অশিক্ষিত লোকেরা বেশ মর্যাদার চোখে দেখে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চাভিলাষী তরুণীরাও পুলিশ অফিসার কিংবা প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট পেশাকে পছন্দ করে থাকে। বিবাহ বা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতেও পেশা মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। পেশার কারণে কেউ কেউ বিশেষ স্টাইলে কথা বলতে গিয়ে বিকৃত ভাষায়ও কথা বলে থাকে। যদিও যে বিকৃত ভাবে ভাষা ব্যবহার করে সে ঠিক বুঝতে পারে না তার ভাষা কেমন হচ্ছে। 'সংবাদপত্রে অনেক সময় বেমানান বা বেখাপ্পা তথ্য একটা বাক্যের সাহায্যে লিখিত হয়। এখানে এই শ্রেণীর একটা অংশ উদ্ধৃত করা হল।

ক. Born on May 2, 1904, pipe smoking Bing is 5 ft. 9 ins. tall, has blue eyes and brown hair, thinning on top. Always casually and informally dressed, he invariably wears a smile.

খ. Of Irish birth, benign in manner, with the pink complexion and white hair which would as well become a business executive, Mr Thomson does not prevaricate.'''

পেশাগত ভাষার ক্ষেত্রে কুমারখালীতে কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। কুমারখালী থেকে একটি পত্রিকা বের হতো। যার নাম 'গ্রামবার্ত্তা'। গ্রামবার্ত্তা পত্রিকাটি কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারের তত্ত্বাবধানে বের হতো। কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারের নিজস্ব মুদ্রণযন্ত্রে পত্রিকাটি মুদ্রিত হতো। গ্রামবার্ত্তা ১২৮৭ শ্রাবণ সংখ্যার

Dhaka University Institutional Repository

একটি বিজ্ঞাপনের দিকে নজর দেয়া যেতে পারে। এ বিজ্ঞাপনটি পেশাগত কারণে দেয়া হয়েছিল এবং এটিকে পেশাগত ভাষার নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ:

'গ্রাহকগণের প্রতি

গ্রামবার্ত্তার গ্রাহক মহাশয়দিগকে সবিনয় আমাদিগের নিবেদন এই যে অনেকেই ১২৮৬ সালের প্রাপ্য মূল্য প্রদান করেন নাই, ৮৭ সালেরও কয়েক মাস গত হইল। কোন কোন মহাশয়ের নিকটে ২/৩ বা ৪/৫ বৎসরেরও মূল্য পাওয়ানা আছে। ইহাঁরা যে রাজা বা ধনী লোক সে কথা বলা বাহুল্য। কারণ মূল্য পাইব না এ আশঙ্কা না থাকায়, আশায় পত্রিকা প্রদান করিতেছি। সকলেই অনুগ্রহ প্রকাশে সত্বরে মূল্য প্রদানে দুঃখিনী গ্রামবার্ত্তার জীবন রক্ষা করিবেন। এই রোগেই সাপ্তাহিক গ্রামবার্ত্তার মৃত্যু হইয়াছে, হায়! মাসিক গ্রামবার্ত্তারও কি তাহাই ঘটিবে?'[১১]

বিজ্ঞাপনটিতে পত্রিকার বকেয়া সংক্রান্ত টাকা চাওয়া হয়েছে। সাধারণত বকেয়া টাকা যে ভাবে বা যে উক্তিতে চাওয়া হয়ে থাকে বিজ্ঞাপনটিতে সে ভাবে চাওয়া হয় নি। পত্রিকার বর্তমান ও পূর্ব-অবস্থা জানিয়ে অত্যন্ত মার্জিতভাবে বিজ্ঞাপনটি পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হয়েছে। পেশাগত কারণে এ রকম বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। পেশাগত ভাষার সাথে সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত ভাষার পার্থক্য লক্ষণীয়।

ভাষা ব্যবহারের প্রথম পর্যায় থেকেই পেশাগত ভাষা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পেশাগত কারণে ভাষার ব্যবহারের জন্যই মূলত ভাষায় প্রায়োগিক বৈচিত্র্য এসেছে। পেশাগত কারণে ভাষা ব্যবহারের জন্য ভাষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি ভাষা মানব জীবনের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ভাষার সামাজিক স্তর বিন্যাসের জন্য পেশাগত ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। এক এক পেশাকে এক এক রকম শব্দ, খন্ডবাক্য কিংবা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এই ভিন্ন ভিন্ন শব্দ, খন্ডবাক্য কিংবা বাক্যের অর্থের ভিন্নতার জন্য পেশাগত ভাষার শ্রেণী বা স্তরের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব, দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৯৭, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, পৃ. ১৪৭।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।

৫. মৃণাল নাথ, ১৯৯৯, সমাজ ও ভাষা, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, পৃ. ৬০।

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

৭. প্রাগুক্ত (মাটগোমারি, উদ্ধৃতি), পৃ. ৬১-৬২।

৮. ১২৫তম বর্ষপূর্তি (১৮৬৯-১৯৯৪), ১৯৯৪, স্মরণিকা, কুমারখালী পৌরসভা, কুষ্টিয়া, পৃ. ১১২।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

১১. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, প্রাগুক্ত, (উদ্ধৃতি, ব্রুক), পৃ. ১৪৮।

১২. গ্রামবার্ত্তা, ১২৮৭ শ্রাবণ, পৃ. ১২৮।

Dhaka University Institutional Repository

সুইপারদের ভাষা

কুমারখালী রেলস্টেশনের অনতিদূরে একটি মহল্লা বা পাড়া আছে। এ পাড়া বা মহল্লা অন্যান্য মহল্লা থেকে কিছুটা পৃথক। মহল্লায় যারা বাস করে তাদের সুইপার বলা হয়। কুমারখালীর মানুষেরা (হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে) শূকর পালে না। কিন্তু এ মহল্লার লোকেরা শূকর পালে। মহল্লার লোকেরা সর্দারকে মান্য করে। কিন্তু ইদানিং সর্দারের নিয়ন্ত্রণ ও আচরণ প্রণালীতে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পূর্বে বিয়ে থেকে শুরু করে যে কোন অনুষ্ঠান সর্দারের মতামতের উপর নির্ভর করতো। বর্তমানে তেমন দেখা যায় না। তবে এখনও সর্দারের মতামতের উপর অনেক কিছুই নির্ভর করে।

সুইপাররা সাধারণত ঝাড়ু দেয়া, পায়খানা পরিষ্কার করা ও অন্যান্য কাজ করে জীবীকা নির্বাহ করে থাকে। অনেকেই মনে করেন যে ব্রিটিশ শাসনামলে পৌর এলাকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করার জন্য বাংলাদেশে তেমন কোন লোক না পাওয়ার জন্য ভারতের মাদ্রাজ থেকে ধাঙড় নিয়ে আসা হয়। এই ধাঙড়রাই হলো সুইপার। পৌর এলাকার কাজ করার জন্য সুইপারের প্রয়োজনীয়তার কারণে পৌর এলাকায় এদের বাস। তবে পৌর এলাকা ছাড়াও বড় বড় হাট-বাজার পরিষ্কার করার জন্য এদের ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় বা আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই নিয়ে যাওয়া বা আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এক এক এলাকা থেকে অন্য নতুন নতুন এলাকায় সুইপারদের বসতি স্থাপনের কারণ বলে বিজ্ঞজনেরা সমর্থন করে থাকেন।

কুমারখালীর যে ইতিহাস তাতে কুমারখালী এক সময় জমিদারী শাসনের আওতায় ছিল বলে জানা যায়। কুমারখালী জমিদারী শাসনের অধীনে যাওয়ার পূর্বে নাটোরের রাজাদের অধীনে ছিল। '২৭২টি এস্টেট এবং ৬৯৫টি গ্রামের সমন্বয়ে ইউসুফশাহী পরগণার সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন একসময় নাটোরের রাজারা। ১৭৯৩-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তীতে বাকি রাজস্বের জন্য বিক্রয় আইনানুযায়ী (sale law, 1793) এই সম্পত্তি নিলামে ওঠে। ১৭৯৬ সাল থেকে ১৮১৫ সাল-- এই সময়ের মধ্যে পাঁচটি ধনাঢ্য পরিবারের পক্ষ থেকে এই সম্পত্তি কিনে নেওয়া হয়েছিল। যে পাঁচটি ধনাঢ্য পরিবার এই বিপুল সম্পত্তি কিনে নব্য জমিদার হয়ে বসেন তাঁরা ছিলেন, কলকাতার ঠাকুর পরিবার, ঢাকার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার, সলপের সান্যাল পরিবার, স্থলবসন্তপুরের পাকড়াশী পরিবার এবং পোরজনার ভাদুড়ী পরিবার।" কুমারখালীর শিলাইদহে আজও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠি বাড়ি আছে। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত এ কুঠি বাড়ি স্থাপিত হয়েছিল মূলত জমিদারী কাজ দেখা শুনার জন্য। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পুরুষেরা জমিদারী কাজ পরিচালনার জন্য কুঠিবাড়িটি নির্মাণ করেন।

কুমারখালীর বর্তমান সুইপারদের অবস্থান সম্বন্ধে জানা যায় যে, 'ঝাপশি বাঁশফোড়' ঠাকুর পরিবারের শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে প্রথম আসে। 'ঝাপশি বাঁশফোড়' কুঠিবাড়িতে ঝাড়ুদার হিসেবে কাজ করতো। ভারত থেকে ঝাপশি বাঁশফোড় তার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে বাংলাদেশের কুমারখালীতে ঠাকুর পরিবারের শিলাইদহের কুঠি বাড়িতে আসে জীবিকার সন্ধানে।

'বাঁশফোড়' হলো কুমারখালীর সুইপাদের পদবী। বাঁশফোড় পদবী হওয়ার পেছনে একটা চমৎকার যুক্তি আছে। যুক্তিটি হলো যেহেতু সুইপাররা ঝাড়ু দেয়া, পায়খানা, প্রসাবখানা পরিষ্কারের পাশাপাশি বাঁশের কাজ করতো তাই তারা নিজেদেরকে 'বাঁশফোড়' হিসেবে পরিচয় দিতো। সেই হতে সুইপারদের নামের শেষে বাঁশ ফোড় লেখা হয়। যেমন:

ক. শ্রী গণেশ চন্দ্র বাঁশফোড়

382705

Dhaka University Institutional Repository

খ. শ্রী পান্না লাল বাঁশফোড়
গ শ্রী রঞ্জন বাঁশফোড়

বাঁশের কাজ বলতে সুইপাররা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ঝুড়ি বানাতো, বাঁশের চটা তুলে শরপশ তৈরীসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরী করতো। সুইপাররা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, কাজের পাশাপাশি এ সব কাজ করতো। সুইপারদের মধ্যে দেখা যায় যে, নারী এবং পুরুষ উভয়ই কাজ করে। ঝাড়ু দেয়াসহ অন্যান্য কাজে পুরুষের পাশাপাশি মহিলারা অংশগ্রহণ করে। বাঁশের কাজের বিষয়েও মহিলারা পুরুষদের সহযোগিতা করতো।

নামের ক্ষেত্রে পুরুষেরা যেমন বাঁশফোড় বলে পরিচয় দেয় মহিলারা কিন্তু বাঁশফোড় বলে খুব একটা পরিচয় দেয় না। যেমন, ক. শ্রীমতি কাজলী রাণী খ. শ্রীমতি চামেলী রাণী গ. শ্রীমতি সনিয়া রাণী। মহিলাদের নাম জিজ্ঞেস করলে শুধুমাত্র নামের প্রধান অংশই তারা বলে থাকে। এ ক্ষেত্রে নামের পূর্বে শ্রীমতি পর্যন্ত বলে না। উপরের উদাহরণে নামের প্রধান অংশ হলো- কাজলী, চামেলী এবং সনিয়া। মহিলারা নির্দ্বিধায় তাদের নাম বলে থাকে। নাম বলার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোন রকম সংকোচ বোধ পরিলক্ষিত হয় না। বাঁশফোড়রা হিন্দু। তবে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু বলে প্রতীয়মান হয়। কুমারখালীর অন্যান্য মর্যাদা সম্পন্ন হিন্দুদের মত তাদের অবস্থান নেই। এমনকি কুমার ও জেলে সম্প্রদায়েরও নীচে এদের অবস্থান।

বর্তমানে কুমারখালীর বাঁশফোড়রা বাঁশের জিনিসপত্র তৈরী করে না। বাঁশের জিনিসপত্র তৈরী না করার পেছনে কারণ হলো স্বল্পমূল্যে প্রয়োজনীয় বাঁশ সংগ্রহ করতে না পারা এবং একই সাথে প্লাস্টিকের কিংবা সিলভারের জিনিসপত্রের জন্য বাঁশের তৈরী জিনিসপত্রের চাহিদা কমে যাওয়া। ঠাকুর পরিবারে সুইপার কাজ করতে শুরু করার বেশ কিছুদিন দিন পর পদ্মা নদীর ধারে দুই বিঘা খাজনামুক্ত জমি দান করে জমিদার ঠাকুরপরিবার। তখন মাত্র দু'জন সুইপার ছিল। একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা। পুরুষ সুইপারের নাম ছিল 'ঝাপশি বাঁশফোড়'। জমিদারদের জমিদারী চলে যাওয়া পর পূর্বের মত সুইপারদের আর ঠাকুরদের কুঠিবাড়িতে কাজ থাকে নি। তাছাড়া ঝাপশি বাঁশফোড়ের বাড়ি যেটা পদ্মা নদীর ধারে ছিল, সেটা পদ্মা নদীর ভাঙনের মুখে নদী গর্ভে হারিয়ে যায়। তখন বাঁশফোড়রা কুমারখালী শহরে চলে আসে। কুমারখালী পৌরসভা এলাকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা কল্পে সুইপারদের প্রয়োজন ছিল। পৌরসভা কর্তৃপক্ষ সুইপারদের পৌর এলাকায় কাজ করার জন্য ব্যবস্থা করে দেয় এবং একই সাথে কুমারখালী রেলস্টেশনের অনতিদূরে সুইপারদের থাকবার জন্য সুব্যবস্থা করে। যেখানে থাকার জন্য ভাড়া বাবদ বাঁশফোড়দের কোন অর্থ দিতে হয় না। এটিই এখন সুইপার পল্লী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

সুইপারদের মধ্যে শিক্ষিতের হার খুবই নগন্য। পূর্ব পাকিস্তান আমলে 'শ্রী গণেশ চন্দ্র বাঁশফোড়' মেট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিল। কিন্তু পাশ করতে পারে নি। শ্রী গণেশ চন্দ্র বাঁশফোড়ই তখন ছিল শিক্ষিতের তালিকায় অগ্রগণ্য। পরবর্তীতে শ্রী গণেশ চন্দ্র বাঁশফোড়ের ছেলে 'শ্রী পান্না লাল বাঁশফোড়' ডিগ্রী পরীক্ষা দিয়েছে। শ্রী পান্না লাল বাঁশফোড়ই হলো সর্বোচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি যে সুইপার পরিবারের মধ্য হতে ডিগ্রী পরীক্ষা দিয়েছে। উল্লেখ্য যে 'শ্রী পান্না লাল বাঁশফোড়', 'শ্রী গণেশ চন্দ্র বাঁশফোড়ে'র ছেলে এবং 'গণেশ চন্দ্র বাঁশফোড়ে'র দাদা (পিতার পিতা) ছিল 'শ্রী ঝাড়শি বাঁশফোড়'। শ্রী গণেশ চন্দ্র বাঁশফোড়ের বর্তমান বয়স আনুমানিক ৫৫/৬০ (পঞ্চান্ন অথবা ষাট) বছর।

সুইপারদের খাবার তালিকায় কোন বিধি নিষেধ লক্ষ্য করা যায় না। তারা প্রায় সব কিছুই খায়। খাবারের ব্যাপারে হালাল হারামের খুব একটা বালাই আছে তা মনে হয় না। হিন্দু সমাজে ধর্মীয় কারণে

Dhaka University Institutional Repository

যে সব পূজা আছে সে সব পূজা সুইপাররা পালন করে থাকে। তবে উপোস সংক্রান্ত বিষয়ে কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কুমারখালীর নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে উপোসের বিষয়টির ব্যাপারে ভিন্ন মত লক্ষ্য করা গেছে। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা উপোস থাকলে কিছুই খায় না। পূজা শেষে তারা খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু নিম্ন পরিবারের হিন্দুরা শুধুমাত্র ভাত ছাড়া অন্য ফলমূল এমনকি শুকনা খাবার গ্রহণ করে থাকে।

সুইপাররা দোল পূর্ণিমাতে খুব আনন্দ ফূর্তি করে। দোল পূর্ণিমাতে সবার ছুটি। কেউ কোন কাজ করে না। এ সময় তারা ভাত খায় না। তবে মাংস, পিঠা, লুচি ইত্যাদি খেয়ে থাকে। দোল পূর্ণিমাতে তারা একে অপরকে রঙ দিয়ে রাঙিয়ে দেয়। রঙ দেয়া হলো তাদের সামাজিক রীতি। দোল পূর্ণিমার আর একটি বড় আকর্ষণ হলো তারা মদ পান করে। ইচ্ছে মত মদ পান করে নেশার জগতে হারিয়ে যায় সুইপার পরিবারের সদস্যরা। বেশী দামী মদ সুইপাররা পান করতে পারে না। তারা নিজ হাতে কিছু মদ বানায়। নিজ হাতে বানানো মদকে বলা হয় 'চুলায় মদ'। তাছাড়া অল্প পয়সায় কেনা বাংলা মদ সুইপারদের খুব প্রিয়। ঢাক, ঢোল বাজিয়ে নৃত্য করে সুইপার সমাজের উঠতি বয়সি ছেলে-মেয়েরা। দিনের আলো যখন দিগন্ত রেখাকে অতিক্রম করে তখন সুইপার সমাজে চলে নানা রকম গান-বাজনা। এ সব গান-বাজনা একান্তই তাদের নিজস্ব। অন্যসব মানুষেরা এর অভ্যন্তরে খুব একটা প্রবেশ করে না বা তারা অন্যকোন ভদ্রলোকদের আমন্ত্রণও জানায় না।

বর্তমানে মদ পানের বিষয়েও কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। এখন থেকে ২০/৩০ (বিশ/ত্রিশ) বছর পূর্বে পুরুষ ও মহিলা উভয়ই মদ পান করতো। কিন্তু বর্তমানে মহিলাদের মধ্যে মদ পায়ির সংখ্যা বেশ কম। শুধুমাত্র পুরুষেরাই মদ পান করে। কোন কোন ক্ষেত্রে দুয়েকজন পুরুষও মদ পান থেকে বিরত থাকে।

সুইপাররা অন্যান্য লোকদের 'বাবু' বলে সম্বোধন করে। 'স্যার' বলে মান্য করে থাকে। সুইপাররা যে ভাষায় তাদের নিজেদের মধ্যে কথা বলে তা বাংলা ভাষা থেকে কিছুটা দূরে রয়েছে বলে মনে হয়। কারণ তাদের ভাষা বাংলা ভাষাভাষীরা খুব একটা বোঝে না। তবে তারা নিজেদের মধ্যে যে ভাষায় কথা বলে তা বাইরে খুব একটা বলে না। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের ভাষা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তারা লজ্জা পায়। নিজের ভাষায় তারা কথা বলতে চায় না। নিচে বাংলা ভাষার একটি অংশ দেয়া হলো। অংশটি প্রথমে বাংলা ভাষায়, পরবর্তীতে সুইপারদের ভাষায় দেখানো হলো।

বাংলা রূপ:

কেন জানি না গত রাতে একটুও ঘুম আসছিল না। ঘুম না আসাতে বিছানাকে বিরক্তিকর ও অসহ্যজনক মনে হচ্ছিল। আমার রুমে মাত্র একটি ছোট জানালা। জানালাটা খোলা ছিল। বিছানা ছেড়ে জানালায় এসে দাঁড়িয়ে বাইরে চোখ রাখলাম। তেমন কিছু দেখতে পেলাম না। তবে দূর আকাশের তারকারাজিরা মিটিমিটি চাহনিতে পৃথিবীর অসংখ্য তৃণলতাকে যে আপন মনে দেখে চলেছে নিত্যদিনের মত তা বুঝতে পারলাম। ভাবলাম, একটু বাইরে যাই। বাইরে এসে রাতের গভীরতার মধ্যে যে মায়াবী রূপ আছে, তার সাথে পরিচিত হলাম। মনে হলো, যদি এমন থাকতে পারতাম অনন্তকাল, যেমন দাঁড়িয়ে আছি এ মেঘহীন, চাঁদহীন সুন্দর তারকা খচিত আকাশের নীচে, তাহলে কতই না ভাল হতো!

Dhaka University Institutional Repository

উপরের অংশের সুইপারদের ভাষার রূপ:

কাহে জানি কাল রাতিখান থোরাসা অংহি না আওত রহে। অংহি না আয়মে বিইছাওনা নিমন না লাগত রহে। হামার ঘর মে এগো ছোটিচুকি খিরকী রহে। খিরকী খুল্লা রহে। বিইছাওনা ছোড়কে খিড়কী লগে আকে বাহারা মে আঁখ রখনি। ওইসন কিছু দেখে না সকনী। তবে দূরে আকাশমে তারা মিটমিট ককে তাকত রলসন দুনিয়াকে বহুত লাতার সন আপন মন সে দেখত রলসন রোজ দিন এসন তুওন হম বুঝে সকনী। মন মে ভবনী থোরা বাহারা যাই। বাহারা আকে খুব রাতকে যে নিমন চেহারা বা ওকর সাথে হম চিনাচিনি হকনী। মনমে ভইল হম যদি এইসন রহতি তবে জীবনভর, ওইসন খারা হোকে রহতি আর আকাশ মে ঘটানা রহিত, চাঁদ না রহিত, খুব নিমন তারা সে সাজাওল আকাশকে নিচে রহিত তবে না কেতনা নিমন হইত!

সুইপারদের ভাষার যে রূপ তা থেকে বোঝা যায় বাংলা ভাষার সাথে সুইপারদের ব্যবহৃত ভাষা পৃথক। উপরের উদাহরণ থেকে নেয়া কয়েকটি শব্দের অর্থের দিকে একটু নজর দেয়া যেতে পারে। যেমন:

সুইপারদের ব্যবহৃত শব্দ	অর্থ	সুইপারদের ব্যবহৃত শব্দ	অর্থ
অংহি	ঘুম	খিরকী	জানালা
সকনী	পারলাম/পেলাম	নিমন	ভাল (যার তুলনা হয় না এমন ভাল)
সাজাওল	সাজানো/গোছানো	ভবনী	বুঝলাম
রলসন	ছিল	ককে	করছে
হকনী	হলো	ওকর	ওর
এগো	একটা	ছোটিচুকি	ছোট
তুওন	তখন	ঘাটানা	মেঘ

অর্থাৎ বাংলা ভাষার সাথে সুইপারদের ভাষার তেমন মিল নেই। সুইপাররা ভারতে থাকাকালে হিন্দি ভাষা ব্যবহার করতো বলে জানা যায়। কেউ কেউ মনে করেন সুইপারদের আদি বাসস্থান ছিল মাদ্রাজে। মাদ্রাজের ভাষা তারা ব্যবহার করে বলে কুমারখালীর কেউ কেউ বলে থাকেন। কুমারখালীতে বসবাসরত সুইপাররা বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য তাদের নিজস্ব ভাষার উপর বাংলা ভাষার বেশ ছাপ পড়ছে বলে প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া লেখা পড়ার প্রয়োজনে বাংলা শিখতে হয়, বাংলা বলতে হয়। সুইপারপল্লী খুব একটা বড় নয়। বেশ ছোট। সে পল্লীর শিশুরা বাইরে আসার সাথে সাথে বাংলা ভাষার সাথে তাদের পরিচয় ঘটছে। এমতাবস্থায় সুইপারদের ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে একটা পৃথক ভাষিক জটিলতা লক্ষ্য করা যায়। নিচে সুইপারদের ব্যবহৃত কিছু শব্দ দেয়া হলো। সুইপারদের ব্যবহৃত শব্দের পাশাপাশি বাংলা অর্থও দেয়া হলো।

সুইপারদের ব্যবহৃত শব্দ	অর্থ	সুইপারদের ব্যবহৃত শব্দ	অর্থ
রাজাই	লেপ	চাক্কু	ভোঁজালি
মোম	মোমবাতি	কোদারী	কোদাল
কপ্	কাপ	তাক্তা	তকতা
ঘয়লা/ঘয়লি	কলসি	গদি	তোষক
হাতৌড়ি/হাতৌরি	হাতুড়ি/হাতুরি	খোন্তি	শাবল
হরকিন	হ্যারিকেন	পিড়া	পিঁড়ে
বনসি	বর্শি	আলানা	আলনা
গাগারা	ঘড়া	চাটাই	মাদুর
তরোয়ার	তলোয়ার	টাঙি/কুলাড়ি	কুড়াল

Dhaka University Institutional Repository

সুইপারদের ব্যবহৃত শব্দ	অর্থ
চম্মচ	চামুচ
বনশি	ছিপ
কারাত	করাত
সোপা	সোফা
চাছান্না	ছাঁকুনি
খ্যাতা	কাঁথা
কইচি	কাচি
কাটি	পেরেক
দাও	দা
হাঁড়িয়া	হাঁড়ি
সিলোট	বাটা
বিইছাওনা/বিছাওনা	বিছানা
বাঁয়	হাতা
অংটি	আংটি
গোর	ঘর
চুড়ি	বালা
ভরহাতাজামা	ফুলশার্ট
গঞ্জি	গেঞ্জি
তবিজ	তাবিজ
কোমর গোড়	বিছে
সাবুন/শাবুন	সাবান
কানপাচা	দুল
জয়মালা/হয়কল	হার
চটি	স্যান্ডেল
পাগড়ি	মাকড়ি
জুতা	জুতো
ঝুলা	ব্লাউস
বেটাম/বুতাম	বোতাম
ছুই	সুঁই
তেল	তৈল
গাঁহাকা/গাঁহাক	খদ্দের
বড়সাব	দারোগা
মাই	মা
বহিনা	বোন
পাওনা/পহনা	দুলাভাই
ছখি	সই
ভাতিজা	ভাইয়ের ছেলে
কণিয়া	ছোট ভাইয়ের বউ
ফুয়াশাচ/সাচ	ফুফুশাশুড়ি
মৌসি	খালা

সুইপারদের ব্যবহৃত শব্দ	অর্থ
কম্মল	কম্বল
তাকতা	তাক
চক্কু	ছুরি
বইঠি	বটি
ছিড়ি/সিড়ি	মই
জালুয়া	জেলে
হাসুয়া	কাস্তে
টেবুল	টেবিল
বোতল	শিশি
বর্তন	বাসুন
সিকহর	শিকে
জামা/কূর্তা	শার্ট
ছায়া	শায়া
লুগা	শাড়ি
মুচনা/গোরা	পাপোস
দাতুয়ান	ব্রাশ
পোকেট/পাকিট	পকেট
ঘৈড়ি	ঘড়ি
জুতাকা কালি	জুতোর কালি
চট্টি	চটি
হাফহাতাজামা	হাফশার্ট
পায়জামা	পাজামা
গোঁড়াঙি	মল
সাবুনচেচ	সাবানদানি
পেন্ট	প্যান্ট
ককই	চিরুনী
লংটা	ল্যাংট
সূতা	সুতো
গাহানা	গহনা
নুন	লবন
চুরিয়ালা	ফেরিওয়ালা
মাহাজন	মহাজন
বাবু	বাবা
ননদই	ননদ
দোস্/দোস্ত	বন্ধু
বোনবেটা	বোনের ছেলে
ভৌজি	বড় ভাইয়ের বউ
বেটি	মেয়ে
ফুয়া	ফুফু
মৌসি/মৌসিয়াসাচ	খালাশাশুড়ি

Dhaka University Institutional Repository

সুইপারদের ব্যবহৃত শব্দ	অর্থ
কাকি	চাচী
ভাইজি	ভাসুর
ভৌজি	ভাবি
বাবুজি	শ্বশুর/বাবা
সৌতিনকা বেটা	সতিনের ছেলে
গাগড়া	ঘড়া
বোকোড়ি	ছাগল
কুত্তা	কুকুর
মুরগা	মোরগ
তেলচাট্টা	তেলাপোকা
ঘুরঘুরুয়া	ঝিঁ ঝিঁ
মচ্ছর	মশা
গিদ	শকুন
ভুইলি	বিছে
কবুতর	পায়রা
মাকাড়া	মাকড়শা
থরিয়া	থাল
কছুয়া/দুড়ো	কচ্ছপ
নরকোল	নারিকেল
কেরাগাছ	কলাগাছ
কসাইলি গাছ	সুপারি গাছ
চাউর	চাল
হরদি	হলুদ
গলাভাত	নরমভাত
পানিভাত	পান্তাভাত
সেয়ৌ	সিমাই
ধনিয়া	ধনে
মাড়/ফ্যান	ভাতের গরম পানি/মাড়
বয়গন	বেগুন
ইলাইচি	এলাচ
চাটানি	চাটনি
ফারাটা	পরোটা
মরচা	মরিচ
চোখা	ভরতা
সেতরাজু	দাঁড়িপাল্লা
চিল্লাতা	জোরে
খালি	শূন্য
তনিসেবা	অল্পআছে
পেটদুখাতা	পেটব্যথা
গুভিড ওড়ান	ঘুড়ি ওড়ান

সুইপারদের ব্যবহৃত শব্দ	অর্থ
কাকিয়া শাচ/সাচ	চাচীশাশুড়ি
দিয়াদিন/দিদি	জা
দিদিয়া	মামাতো বোন
মৌয়া	শাশুড়ি
গাগড়া	ঘড়া
মগা	মগ
বিলায়ি/বিলাই	বিড়াল
সিয়ার	শেয়াল
মছরি	মাছ
মধুমাছি	মধুরমাছি
তিতিলি	ফড়িং
চিলহড়/চিলোড়	চিল
কেচুয়া/চেরা	কেঁচো
কৌয়া	কাক
কটহর গাছ	কাঁঠাল গাছ
সুসুন্দর	ছুঁচো
বকুলা	বক
মুস	ইঁদুর
চামবাদুর	বাদুর
অড়ৌল	জবা
বড়গাছ	বট
চিউড়া	চিড়ে
অমরুদ	পেয়ারা
মিঠাই	রসগোল্লা
খিচাড়ি	খিচুড়ি
কোহাড়া	কুমড়ো
নিমক	নুন
ভিনডি	ঢ্যাঁড়শ
বান্দাকপি	বাঁধাকপি
লেবুয়া	লেবু
দহি	দৈ
লঙ	লবঙ্গ
পুরি	লুচি
উছনা/সিজাল	সিদ্ধ
জলদি	মূহুর্ত
সাজ	সন্ধ্যা
লাঠি/ডান্ডা	দন্ড
নিমবানি	ভাল আছ নাকি
আঁখিওঠা	চোখওঠা
ডুগডুগ	হাড়ুডু

Dhaka University Institutional Repository

সুইপারদের ব্যবহৃত শব্দ	অর্থ
মুখচমকাওয়াতিয়া	মুখ বাঁকা করা
চটকান	চড়
বেন্ডিল	বান্ডিল
আধা	অর্ধেক
কড়িয়া	কালো
তনিসেবা	একটু
হরদি	হলুদ
টুটালবা	ভাঙ্গা
ছড়ি	ছড়া
টুপলা	পঁটুলি
সব	সবাই
ছা-ই	ছাই
যাতানি	যাচ্ছ/যাচ্ছি
পাক	রান্না
হাড্ডি	হাড়
বেটা	ছেলে
মরগোলবা	মরে গেছে
সেপাই	পুলিশ
পিয়াতা	পান করা
শুক্কল	শুকনো
কোহাড়া	কুমড়া
ধুরা	ধূলো
শেম	সীম
জানানা	স্ত্রী
বাহা	বামদিক
বিছ/মদ্দি	ভেতর/মধ্যে
মুয়াদিলিম	মেরে-ফেলা
ঢের	অনেক
বসকেবা	বেঁচে থাকা
বইঠা	বসা
শুয়া	ঘুমোন
গাঙ	নদী
পচাল	পঁচা
পাথ্থর	পাথর
চলা	হাঁটা
ইনার	কুয়ো
লোড়া	নোড়া/শিল
রসি	দড়ি
চাকড়বা	চওড়া
ছেপ/ছ্যাপ	থু তু

সুইপারদের ব্যবহৃত শব্দ	অর্থ
সারাপাতিয়া	অভিশাপ
রুপিয়া	টাকা
লুগা	শাড়ি
পাতলা	চেকন
টেরা	বাঁকা
চারকণিয়া	চারকোনা
গাড়াবা	গাঢ়লাল
ঝোপা	খোকা
একদলবানি	একত্রে আছি
ডরজন	ডজন
আওয়াতা	আসা
খুন	রক্ত
চোট	আঘাত
পিছুয়া	পেছন
জড়গলবা	পুড়েগেছে
লেইকা	শিশু/ছোট
লেংড়া	খোঁড়া
আগি	আগুন
মাছরি	মাছ
কুহাশা	কুয়াশা
লৌকি	লাউ
ডর	ভয়
পাখানা	পালক
ডয়না	ডানদিক
আদমি	মানুষ
পোঁচ/পচি	লেজ
মারদানা	পুরুষ
ঝুট	মিথ্যে
মু	মুখ
চওড়া	প্রশস্ত
লগে	কাছে
ছোটা	ছোট
মাইনা	মাস
চান	চাঁদ
বুড়ুয়া	বুড়ো
আনর	চোখে দেখে না/কানা
সাতে	সঙ্গে
জনি	তারা (আকাশের)
জঙ্গল	বন
খাঁড়া	দাঁড়ান

Dhaka University Institutional Repository

সুইপারদের ব্যবহৃত শব্দ	অর্থ	সুইপারদের ব্যবহৃত শব্দ	অর্থ
চুষ	চোষা	ফিসাতা	ধোয়া
হাওয়া	বাতাস	বহতা	বওয়া
কোনল	খাল		

কুমারখালীতে বহুদিন ধরে থাকার জন্য সেখানকার সুইপাররা এখন কুমারখালীর অধিবাসী। যাদের বাংলাদেশে জন্ম তারা ভাল বাংলায় কথা বলতে চেষ্টা করে। মাঝে-মধ্যে দুয়েকটি ইংরেজী শব্দেরও ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

সুইপারদের নিজেদের মধ্যে তেমন ভাষাগত সামাজিক স্তরীকরণ খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না। তবে সর্দারের পরিবারের সদস্যের অন্য সুইপাররা বেশ মর্যাদার চোখে দেখে থাকে। সুইপারদের মধ্যে যারা লেখা-পড়া করে তাদের মর্যাদার চোখে দেখা হয়। শিক্ষা ও অর্থকে সুইপার পল্লীর লোকেরা সম্মানের চোখে দেখে থাকে। সুইপারেরা খুব একটা ধনী না, বলা যায় নিম্নবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর। গরীব শ্রেণীর লোকেরা ধনীদের সমীহ করে চলে অর্থের কারণে। কোন কোন সময় অর্থ সামাজিক স্তরীকরণের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। সামাজিক স্তরীকরণের ক্ষেত্রে অর্থের বিষয়টিকে অমূলক ভাবা যায় না।

বর্তমান প্রজন্মের সুইপার শিশুরা লেখাপড়া করে বড় হতে চায়। তারা সুইপার থাকতে চায় না। সুইপার পল্লীতে যে সব শিশুরা লেখাপড়া করছে তাদের মতামত থেকে জানা যায়, সুইপারের কাজ ভাল না। তারা কেউ আইনজীবী হতে চায়, কেউবা শিক্ষক হতে চায়। তাছাড়া তাদের যে ভাষা, সে ভাষায় কথা বলতেই তাদের লজ্জা বোধ হয়, এমন ধরণের মন্তব্যও সুইপার পল্লীতে যে সব ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া করছে তাদের পক্ষ থেকে শোনা যায়। সুইপারদের বিয়ে সাধারণত অন্য সুইপারদের সাথে হয়। সুইপারদের সাথে অন্য কোন হিন্দু পরিবার বিবাহসূত্রে আত্মীয়তা করে না।

পূর্বে সুইপারদের কাজ করার জন্য অন্য কোন লোক না থাকায় তাদের কাজের জগতে কারও প্রবেশাধিকার ছিল না। অন্যদের প্রবেশ না থাকার জন্য সুইপারদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। অর্থাৎ সুইপারদের কাজ অন্য কোন লোক করতো না। কিন্তু বর্তমানে জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধির কারণে কাজের স্বল্পতা দেখা দেয়ায় ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য অনেকেই ঝাড়ু দেয়া সংক্রান্ত কাজে অংশ গ্রহণ করছে। কুমারখালীর সুইপারদের 'মেথর' নামেও সম্বোধন করা হয়। কুমারখালীতে মেথরের প্রধান কাজ হলো পায়খানা পরিষ্কার করা। পায়খানা পরিষ্কার সংক্রান্ত কাজ এখনও সুইপাররা পূর্বের মত করে থাকে। তবে ঝাড়ু দেয়ার মত কাজে অন্যান্যরাও অংশগ্রহণ করছে।

সুইপাররা অন্যান্য মানুষের সাথে কথা বলার সময় সামাজিকভাবে উঁচু নিচুর বিষয়টিকে এড়িয়ে যায় না। তারা কাউকে স্যার, কাউকে বাবু, কাউকে দাদা, ভাই ইত্যাদি বলে সম্বোধন করে থাকে। এ ধরণের সম্বোধন পাশাপাশি অবস্থান করার জন্য গড়ে উঠেছে। স্কুল কলেজের শিক্ষককে সুইপাররা স্যার বলে থাকে। পুলিশ কনস্টেবলকে বাবু এবং সাব-ইনসপেক্টর ও তার উপরের পুলিশ অফিসারকে বড়বাবু বলে সম্মোধন করে।

Dhaka University Institutional Repository

কুমারখালীতে 'সুইপার' ও 'মেথর' শব্দ দুটির অর্থ ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। 'সুইপার' ইংরেজী শব্দ। 'সুইপার' শব্দের বাংলা অর্থ হলো 'মেথর'। কিন্তু শাব্দিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুইপার ও মেথরের ভিন্নতা লক্ষণীয়। 'সুইপার পল্লী' বললে সুইপাররা কিছু মনে করে না। কিন্তু 'মেথর পল্লী' বা 'মেথর মহল্লা' বললে তারা কিছুটা কষ্ট পায় বলে মনে হয়। 'মেথর' শব্দের ব্যবহার কুমারখালীতে বেশ কম। শিক্ষিত-অশিক্ষিত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা 'মেথর' শব্দ ব্যবহার না করে 'সুইপার' শব্দ ব্যবহার করে থাকে। 'মেথর' শব্দটি কুমারখালীতে কখনও কখনও বিদ্রূপ জাতীয় শব্দ কিংবা গালি জাতীয় শব্দ হিসেবেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

কুমারখালীর মেথররা নিজেদের মধ্যে হিন্দু রীতিতে সম্বোধন সূচক শব্দ ব্যবহার করে এবং ধর্মীয় বিষয়াদী হিন্দু রীতিতে পালন করে থাকে। তবে বাংলা ভাষার সাথে মেথরদের ভাষাগত পার্থক্যের কারণে শব্দের উচ্চারণগত কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মেথরদের ভাষাকে কুমারখালীর কোন লোক অনুকরণ বা অনুসরণ করে না। উল্লেখ থাকে যে, যেহেতু কুমারখালীতে মেথরদের 'মেথর' না বলে 'সুইপার' বলা হয় সেজন্য মেথরদের ভাষা না বলে সুইপারদের ভাষা বলা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. অশোক চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৫, উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলন ও কাঙ্গাল হরিনাথ (উদ্ধৃতি: K.K. Sengupta : Pabna Disturbances and the politics of rent 1872-1885), লেখক সমাবেশ, কলকাতা; পৃ. ৮২।

Dhaka University Institutional Repository

কুলিদের ভাষা

কুমারখালী বাসস্ট্যান্ডের অনতিদূরে কুলি মহল্লা অবস্থিত। কুলিরা ধর্মগত দিক দিয়ে হিন্দু। কুলিদের ভাষায় তেমন কোন বিশেষ দিক লক্ষ্য করা যায় না। তারা বাংলা ভাষায় কথা বলে। কুলিরা কুমারখালীর আদি অধিবাসী হিসেবে নিজেদের দাবী করে। কুলিদের ভাষা বেশ মার্জিত ও শ্রুতিমধুর। ভাষাগত দিক বিবেচনা করলে তাদের দাবীকে অর্থাৎ তারা যে কুমারখালীর আদি অধিবাসী সে দাবীকে অগ্রাহ্য করা যায় না। তার কারণ হলো কুমারখালী এক সময় নদীয়া জেলার অংশ ছিল। নদীয়া জেলার ভাষা ভাল। নদীয়া জেলার কথ্য বাংলা চলিত রীতির ভিত্তিমূলে ছিল। সে জন্য কুমারখালীর কথ্য বাংলাও চলিত বাংলার ভিত্তিমূলে ছিল বলে ধরে নেয়া যায়। সে জন্য কুমারখালীর লোকদের ভাষা ভাল হওয়াই স্বাভাবিক। কুমারখালীর লোকদের সাথে কথা বললে ভাষার প্রায়োগিক দিকের উজ্জ্বল দিকটি লক্ষ্য করা যায়। যারা ভাল ভাষায় কথা বলতে পারে তারাই কুমারখালীর আদি অধিবাসী হিসেবে নিজেদের দাবী করে থাকে, ভাষাগত কারণে। কুলিদের প্রায় সবাই অশিক্ষিত। ট্রেনে মাল উঠানো, নামানো ও অন্যান্য মাল আনা-নেয়ার কাজে তারা অংশ নেয়। ইদানিং কেউ কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করছে। কুলিদের মধ্যে ধর্মগত আচার-আচরণ উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের মত। সম্বোধনসূচক যে সব শব্দ তারা ব্যবহার করে তাও কুমারখালীর উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের সম্বোধনসূচক শব্দের মত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন অধিবাসীদের ভাষা

কুমারখালীর প্রাচীন অধিবাসীদের ভাষার বিষয়ে জানতে হলে কুমারখালীর ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা নেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। 'কুমারখালী নামটি প্রাচীন। রেনেলের ম্যাপে কুমারখালীর নাম পাওয়া যায়। ১৮২০ সালের ৩০শে জুলাই বিশপ হেবার ঢাকা থেকে ফেরার পথে কুমারখালীতে রাত্রি যাপন করেন বলে তিনি তার ডাইরীতে লিখেছেন। বিশপ হেবার তার ডাইরীতে উল্লেখ করেছেন কুমারখালীতে গোয়ালা, মৎসজীবী, চাষী ইত্যাদি আদীম প্রকৃতির মত মানুষ দেখতে পেয়েছেন।

কুমারখালীর নামকরণ নিয়ে মতভেদ আছে। অনেকের ধারণা কমরশাহ নামক একজন লোকের নাম থেকে কুমারখালী নাম হয়েছে। কুমার নদীর খাল থেকে কুমারখালী হয়েছে বলে অনেকের ধারনা। দশম শতাব্দীর দিকে গড়াই নদীর নাম ছিল কুমার নদী।'[১] 'গ্রীক ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকদের বিবরণ ও খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিখ্যাত ভৌগোলিক টলেমির মানচিত্রে গঙ্গা নদীর অববাহিকায় কয়েকটি ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখা যায়। এই ক্ষুদ্র দ্বীপ অঞ্চলকে কুষ্টিয়া অঞ্চল মনে করা হয়। গঙ্গা নদী বাংলায় পাঁচটি মুখে প্রবাহিত হতো। গঙ্গা অন্য কোন বৃহৎ জলাশয় থেকে জেগে উঠা। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গোদ ও পুন্ড্রা জাতিসহ অন্যান্য জাতি এ দ্বীপাঞ্চলে আসে। চাষাবাদ কিংবা প্রচুর মৎস লাভের আশায় দলে দলে লোক এসে এখানে প্রথম জনবসতি গড়ে তুলে বলে মনে করা হয়। ভারত কোষ গ্রন্থে কুষ্টিয়া অঞ্চল সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'নদী বিধৌত গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চল পলি গঠিত সমভূমিতে অবস্থিত বলিয়া ইহার মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্বর ও কৃষির পক্ষে উপযোগী। সুতরাং এ অঞ্চলে খাল, বিল-নদী-নালা ও অসংখ্য কোল থেকে প্রমাণ হয় জেগে উঠা ব-দ্বীপ থেকে কুমারখালী গঠিত হয়েছিল।'[২] 'কুমারখালী 'ইতিহাস ঐতিহ্যগত দিক দিয়ে কুষ্টিয়ার চেয়ে সমৃদ্ধ এবং প্রাচীনতর', যার জন্য ইংরেজ আমলের প্রথমদিকে কুষ্টিয়ার পরিচয় দিতে গিয়ে 'কুমারখালী কুষ্টিয়া' বলা হতো। চৈতন্যদেবের আমলে এই কুমারখালীর নাম ছিল তুলসীগ্রাম। এ অঞ্চলের রাজস্ব আদায় করার জন্য নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ কালেক্টর হিসেবে কমরকুলি খাঁ-কে নিয়োগ করার পর কমরকুলির নাম থেকে কুমারখালী নামের উৎপত্তি হয়। ১৮৫৭ সালে পাবনা জেলার অধীনে কুমারখালী, খোকসা, পাংসা এবং বালিয়াকান্দি থানা নিয়ে কুমারখালী মহকুমা গঠিত হয়। এর ১৪ বছরের মাথায় অর্থাৎ ১৮৭১ সালে কুমারখালীকে পাবনা জেলা থেকে বের করে এনে নদীয়া জেলার একটা থানা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।'[৩]

'খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষে চতুর্থ শতাব্দীর সমতট রাজ্য ও পঞ্চম শতাব্দীর গুপ্ত শাসন আমলে কুষ্টিয়া কুমারখালী অঞ্চল এদের শাসনের আওতায় ছিল কিনা এ নিয়ে মতভেদ ও সংশয় আছে। তবে সপ্তম শতাব্দীতে শশাংকের রাজ্যভুক্ত কুষ্টিয়া কুমারখালী অঞ্চল ছিল। ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে গোপালদেব পাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার পর কুষ্টিয়া কুমারখালী অঞ্চল পাল রাজ্যভুক্ত হয় এবং দশম শতাব্দীতে পাল রাজত্বের অবসান পর্যন্ত কুষ্টিয়া কুমারখালী পাল রাজাদের অধীন ছিল। দশম শতাব্দীর শেষের দিকে বিক্রমপুরের হরিকেলের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল। রাজা সামন্ত সেন বাংলার সেন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন দশম শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। .... সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষণ সেন প্রায় ত্রিশ বছর রাজত্ব করেন। লক্ষণ সেনের রাজত্ব কালে ১২০১ সালে মতান্তরে ১২০৩ অথবা ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কি মুসলিম সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী নদীয়া জয় করেন। ... ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভ পর্যন্ত এই ৫৬২ বছর সুলতানী ও মুঘল শাসন আমলে বাংলার শাসনে ছিলেন সুবাদার, নবাব, নাজিম ও চাকলাদার। এদের প্রায় অনেকেরই শাসনাধীন কুষ্টিয়া কুমারখালী ছিল। মোগল শাসনামলে রাজস্ব আদায় ও আঞ্চলিক প্রশাসনিক সুবিধার

Dhaka University Institutional Repository

জন্য পরগণা তৈরি করেন। এই পরগণাগুলোকে থানার মর্যাদা দেয়া হতো। ১৮৫৫ সালে ভূমি জরীপ বিভাগ কর্তৃক যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে তেরটি পরগণা নিয়ে ১৪২.৭০ বর্গমাইল আয়তনে কুমাখালী থানা গঠিত হয়। পরগণাগুলোর নাম ছিল বিরাহীমপুর, মোহাম্মদ শাহী, ভর ফতে জংপুর, কান্তন নগর, জাহাঙ্গীরাবাদ, বামনকর্ণ নাজির, এনায়েতপুর, বেগমাবাদ, রোকনপুর, তারাউজিয়াল, জিয়া রোখি, ইসলামপুর ও খদকী। কুমারখালী থানার এই পরগণাগুলো বিভিন্ন সময়ে ভাগ ভাগ হয়ে সামন্ত রাজা, জমিদার কর্তৃক শাসিত হয়েছে।"[৫]

'১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধে ... সিরাজ-উদ-দৌলাকে পরাজিত করে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সুবে বাংলায় সর্বপ্রথম ক্ষমতার অধিকারী হয়। ১৭৬৫ সালে মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট থেকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকার রাজস্বের বিনিময়ে কোম্পানী বঙ্গদেশের দেওয়ানী শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। কোম্পানী কর্তৃক দেওয়ানী প্রাপ্তির ফলে কুমারখালী কুষ্টিয়া কোম্পানী শাসনাধীনে আসে। ১৭৮৭ সালে এফরেড ফার্নকে এ জেলায় (তৎকালে এ জেলা নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল) প্রথম কালেক্টর এবং জিকেরীকে কালেক্টরের সহযোগী নিযুক্ত করা হয়। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলায় তাদের শাসন কার্য পরিচালনার সুবিধার্থে জেলা, মহকুমা ও থানা গঠন করেন। এবং প্রশাসনিক সুবিধার জন্য থানা, মহকুমা ও জেলা বিভিন্ন সময় পরিবর্তন করেছেন। ১৮২৮ সালে পাবনা জেলা গঠিত হলে কুমারখালী পাবনা জেলাভুক্ত হয়। তার আগে কুমারখালী যশোরের অধীন ছিল। কুমারখালী থানা হবার পরে ভালুকা থানাকে কুমারখালী থানার অধীনে আনা হয়। ১৮৫৭ সালে কুমারখালীকে মহকুমা করা হয়। বালিয়াকান্দি থানা, পাংশা থানা ও খোকসা থানাকে কুমারখালী মহকুমার অধীনে আনা হয়। ১৮৭১ সালে কুমারখালী থেকে মহকুমা উঠে যায় এবং কুমারখালী পুনরায় থানায় রূপান্তরিত হয়ে কুষ্টিয়া মহকুমাভুক্ত হয়ে নদীয়া জেলার অধীনে আসে।"[৫]

'১৮৭২ সালের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে নদীয়া জেলায় ৬টি মহকুমা ছিল। (১) কৃষ্ণনগর; (২) মীরপুর; (৩) কুষ্টিয়া; (৪) চুয়াডাঙ্গা; (৫) বনগাঁ এবং (৬) রানাঘাট। ১৮০২ সালে নদীয়া জেলার জনসংখ্যা ছিল ৭,৬৪,৪৩০ জন, ১৮৬৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৯,৫১,২২৯ জনে। আর ১৮৭২ সালে এই সংখ্যা হয় ১৮,১২,৭৯৫ জন।

কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত যে ৬টি থানা ছিল, তা হলো (১) দৌলতপুর; (২) নোয়াপাড়া (Naopara); (৩) কুষ্টিয়া; (৪) কুমারখালী; (৫) ভালুকা এবং (৬) ভাদুনিয়া। এর মধ্যে কুমারখালী থানার আয়তন ছিল এসময় (১৮৭২ সালে) ১১০ বর্গমাইল। কুমারখালীর অন্তর্গত গ্রাম শহরের সংখ্যা ছিল ২৪২ টি। মোট বাড়ির সংখ্যা ১৪,৫৮১ এবং মোট জনসংখ্যা ছিল ৮৬,২৫৪ জন।

পাবনা জেলা থেকে নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর কুমারখালী শহর (পুরসভা) এলাকার মোট জনসংখ্যা ছিল ৫,২৫১ জন। জাতি-ধর্ম-বিশেষে এর সংখ্যা ছিল এ রকম:

হিন্দু- [পুরুষ: ১,৫৪৯ / মহিলা: ১,৭০৪] = মোট ৩,২৫৩ জন

মুসলমান- [পুরুষ: ৯২২ / মহিলা: ১,০৬৩] = মোট ১,৯৮৫ জন

খ্রীস্টান- [পুরুষ: ০৮ / মহিলা: ০৫] = মোট ১৩ জন

সর্বমোট = ৫,২৫১ জন'[৬]

Dhaka University Institutional Repository

'শিলাইদহ, ধোকড়াকোল প্রভৃতি গাঁয়ের মতো কুমারখালীতেও নীলকুঠি ছিল। এ ছাড়া ৫১ টি নীলকুঠির হেড অফিস অর্থাৎ প্রধান কার্যালয় ছিল কুমারখালীতেই।"

'... কুমারখালী ছিল তাঁতীদের তৈরী বস্ত্রের 'বৃহত্তম হাট'। শান্তিপুর, কুমারখালী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে তাঁতীরা এখানে এসে কাপড় বিক্রি করতো।" 'এই সময় কুমারখালী নদীয়া জেলার 'ম্যাঞ্চেস্টার' ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না। অসংখ্য তাঁতী নানারকম বস্ত্র প্রস্তুত করিত, এবং ইহার নাম সুদূর ইংলন্ড পর্যন্ত পরিচিত ছিল, এখানে মাননীয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রেশমের কুঠী ছিল, এবং 'কুমারখালী মার্কা' রেশম অধিক মূল্যে বিলাতের বাজারে বিক্রয় হইত। কুমারখালীর নীলপাড় কাপড়ের পাকা নীল রঙের জন্য সাহেব সওদাগরদিগের মনে লোভ সঞ্চার হইত।"

বাংলা ভাষার যে ইতিহাস তা হাজার বছরের ইতিহাস। বাংলা ভাষার চলিত রীতির সাথে কুমারখালীর ইতিহাস, কুমারখালীব শিক্ষা, কুমারখালীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। 'বাঙ্গালা ভাষার আদিম লেখকগণ, যথা- চন্ডীদাস, শাহ মুহম্মদ সগীর, কৃত্তিবাস, গুণরাজ খাঁ, কাশীরাম দাস প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। ইহাদের প্রভাবে তৎকালীন সাধু ভাষায় পশ্চিমবঙ্গের স্পষ্ট ছাপ পড়িয়া যায়। তারপর জন্মিলেন চৈতন্যদেব (জন্ম ১৪৮৬ খ্রী: অ:)। তাঁহার জন্মস্থান মধ্য বঙ্গের নদীয়া। তিনি নিজের কথ্য ভাষার গৌরব করিতেন। অন্যস্থানের কথ্য ভাষা তাঁহার নিকট হাসি-ঠাট্টার (বস্তু) ছিল।

"সবার সহিত প্রভু হাস্য কথা রঙ্গে।
কহিলেন যেন মত আছিলেন বঙ্গে॥
বঙ্গদেশি বাক্য অনুকরণ করিয়া।
বাঙ্গালের কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া॥
বিশেষ চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া।
কদর্থেন সেইমত বচন বলিয়া॥ — (চৈতন্য ভাগবত)

এই নদের চাঁদের প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে ভাবের জোয়ার আসিল। তাঁহার অলৌকিক জীবন বৃত্তান্ত লেখা হইল, অসংখ্য পদাবলী রচিত হইল। এই সমস্তই মধ্যবঙ্গের ভাষায়। এখন নদীয়া হইল বাঙ্গালা সাহিত্যের কেন্দ্র।"[১০] কুমারখালী নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত। নদীয়া জেলার ভাষা আদর্শ কথ্য ভাষা বা চলিত ভাষা। বাংলা ভাষার যে দুটি রূপ তার একটি হলো সাধু রূপ, অন্যটি চলিত রূপ। সাধুভাষা শুধুমাত্র সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষা। চলিত রূপ বাংলা শ্রেষ্ঠ মৌখিক ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত। এই শ্রেষ্ঠ চলিত বাংলার ভিত্তিমূলে নদীয়া জেলার কথ্য ভাষা ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। অবশ্য বর্তমানে সাহিত্যের ভাষাও চলিত বাংলা। সাধুভাষা খুব একটা ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না। বাংলাদেশের উপভাষাগত যে বিভাজন সেখানে কুমারখালীর ভাষা চলিত রীতি অথবা শিষ্ট ভাষার কাছাকাছি ধরা হয়ে থাকে। কুমারখালীতে এখনও এমন কিছু সংখ্যক বয়স্ক লোক পাওয়া যায়, যারা সাধু ও চলিত ভাষা মিশিয়ে কথা বলে থাকেন। কুমারখালী হতে গ্রামবার্ত্তা পত্রিকা বের হতো। গ্রামবার্ত্তা পত্রিকা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কুমারখালী থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রামবার্ত্তা পত্রিকাটি কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারের নিজস্ব মুদ্রণযন্ত্র থেকে ছাপা হতো। নিজ উদ্যোগে কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার গ্রামবার্ত্তা পত্রিকাটি বের করেন। গ্রামবার্ত্তায় কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারের ছেলে শতীশ মজুমদারের একটি লেখার অংশের দিকে নজর দেয়া যেতে পারে। উল্লেখ থাকে যে, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ সংখ্যায় লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল। সংস্কৃতভাষা শিরোনামের প্রবন্ধটি বাংলা সাধুভাষায় পত্রিকাতে স্থান পেয়েছে। পাঠ্যপুস্তক ও সংবাদপত্রে বর্তমানে যেমন চলিত ভাষার প্রচলন রয়েছে পূর্বে ঠিক এ রকম ছিল না। পূর্বে সাহিত্যের ভাষা বলতে সাধু ভাষাকেই বোঝাতো। বর্তমানেও বাংলাদেশের বহুল প্রচলিত সংবাদপত্র দৈনিক ইত্তেফাকে সাধু

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা ও চলিত ভাষা দুটি রীতিই পাশাপাশি ব্যবহৃত হচ্ছে। সাহিত্যের ভাষা কিংবা সংবাদপত্রের ভাষার সাথে মানুষের কথাবার্তার ভাষার মিল খুব একটা থাকে না। বিষয়টি শুধু বাংলার জন্য নয় অন্যভাষার ক্ষেত্রেও একই ভাবে প্রযোজ্য। তাই লিখিত ভাষার সাথে মৌখিক ভাষার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে লেখকের নিজস্ব ভাষা তার লেখনিতে কিছুটা যে ছাপ ফেলে না তা কিন্তু নয়। 'যাঁহারা বলেন যে সংস্কৃত ভাষা কখন চলিত ভাষা (যে ভাষায় লোকে সচরাচর কথা বার্ত্তা কহে) ছিল না, তাঁহাদের যুক্তি এই (১) সংস্কৃত ভাষা এত কঠিন যে ব্যাকরণ না জানিলে তাহাতে প্রবেশ করা যায় না। যাহারা ব্যাকরণ শিখে নাই, তাহারা কি প্রকারে সংস্কৃতে কথা বার্ত্তা বলিবে?

(২) দেখা যাইতেছে যে স্ত্রী ও দ্বিজেতর জাতি প্রাকৃত ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত। বালক কালে সকলেই স্ত্রীজাতির নিকট কথা কহিতে শিখে, এবং বড় হইয়া যখন তাহাকে বাহিরে আসিতে হয়, তখন যাহাদের সহিত তাহাদিগের কথাবার্ত্তা কহিতে হয় তখন তাহারা অধিকাংশই প্রাকৃত ভাষাভাষী শূদ্র। সুতরাং বালককে প্রাকৃত ভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহিতে হইবে। সংস্কৃত তাহাকে পরে রীতিমত শিক্ষা করিতে হইবে।

(৩) ব্রাহ্মণের বেদাধ্যয়ন, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধবিদ্যা এবং বৈশ্যের হালকর্ষণ বা বাণিজ্য নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়। শূদ্রের ব্যবসা সেবা করা। সেবা অর্থে শুদ্ধ "খানসামাগিরি" নহে। দ্বিজজাতির সমুদায় কার্য্যই করিতে হইবে। মহুরিগিরি কার্যও এই সেবার মধ্যে পরিগণিত। যদি শূদ্র মহুরিগিরি করিতে পারে, তবে তাহার ওয়াদার সমুদায় কার্য ও লেখাপড়া তাহার চলিত ভাষাতেই করিতে হইবে। তাহার চলিত ভাষা প্রাকৃত, সংস্কৃতে অধিকার নাই। সুতরাং প্রাকৃত ভাষাতেই হিসাবাদি রাখিতে হইবে এবং রাজাকেও সেই ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ হইতে হইবে। অতএব রাজা প্রজা সকলেই যে ভাষা জানে, সেই ভাষাকে চলিত ভাষা বলিব, না অল্প সংখ্যক লোকে যাহা বুঝে তাহাই চলিত ভাষা ?

(৪) দ্বিজজাতির পুরুষ মাত্র সংস্কৃত শিখিত; স্ত্রীকে প্রাকৃত ভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহিতে হইত এবং শূদ্রেরাও সংস্কৃত শিখিতে পাইত না। সুতরাং অধিকাংশ লোকের যে ভাষা ব্রাহ্মণদিগেরও সেই ভাষা ছিল, তবে সংস্কৃতে ধর্ম্ম গ্রন্থাদি লিখিত হইত।

উপরি উক্ত যুক্তি সমুদায় স্বপক্ষে বা বিপক্ষে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা বারান্তে প্রকাশ করিব।

ক্রমশ: শ্রীশ'—[১১]

শ্রী শতীশ মজুমদার 'শ্রীশ'—নামে লিখতেন। কাঙ্গাল হরিনাথ কখনও লিখতেন 'হীন' নামে কখনও বা লিখতেন 'দীন' নামে। গ্রামবার্ত্তা পত্রিকায় প্রকাশিত কাঙ্গাল হারিনাথের লেখার দিকে একটু নজর দেয়া যেতে পারে। কুমারখালীর আদি অধিবাসী কাঙ্গাল হরিনাথের লেখার কিছু অংশ উল্লেখ করা হলো, যা গ্রামবার্ত্তা পত্রিকায় ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কুমারখালী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। 'পাঠক! আমরা এতক্ষণ মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলি নাই, তন্নিমিত্ত বোধ হয়, অস্পষ্ট দোষে মনে[২] আমাদিগকে কতই ভর্ৎসনা করিতেছেন। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টায় গোপন করিতে না পারিয়া, অগত্যা যে কিছু আভাস প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে আপনাদিগের তৃপ্তি হয় নাই। বরং তৃষ্ণার্ত্তকে জল দেখাইয়া তাহা অপহরণ করিলে যাহা হয়, তাহাই হইয়াছে। এক্ষণে সকলেরই পরিচয় কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়া বলিতেছি, ইহাতে অস্পষ্ট ও অতি স্পষ্ট যেদোষেই আমাদিগকে দোষী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা করুন। মন্দরে আশ্বাগত তপস্বী ও তপস্বিনীদিগের সহিত সরস্বতীর উপকূলস্থ আশ্রমে আপনাদিগের একবার সাক্ষাৎ ছিল। যিনি, উড়ুপশায়িনীকে নিজাশ্রমে রাখিয়া শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তিনিই আশ্রমের অধিপতি এবং মন্দরে প্রথম তপস্বী। ইহাঁর নাম ব্রহ্মব্রত সরস্বতী। দ্বিতীয় তপস্বী শক্রতাড়িত রাজা অমরেন্দু। প্রথম তপস্বিনী তাঁহার মহিষী শান্তিপ্রভা। দ্বিতীয় তপস্বিনী তাঁহার কন্যা উড়ুপাশায়িনী

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমপ্রভা। নাগাসন্ন্যাসীর পরিচয় গোপন করিতে না পারিয়া এ স্থলে যাহা প্রকাশ করিয়াছি, সেই যথেষ্ট যথাসময়ে তাহার সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

হীন "[১২]

এবার কাঙ্গাল হরিনাথ রচিত কবিতার কিছু অংশ উল্লেখ করা হলো, যা গ্রামবার্ত্তা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

'তিল ফুল ভুলে তুলি, ধরিয়া কল্পনা তুলি
ভারতের কবিবরে, নারী-নাসা চিত্র করে,
খদচঞ্চু বলে কেহ ব্যাখ্যা করে সুখে,
চঞ্চু বটে বিষধর গড়রের মুখে॥

১০

গৃধিনীর কর্ণ ছবি, কল্পনায় কাট কবি,
তাহাতে কুন্তল দিয়া, গেছে সাধ মিটাইয়া,
আমি বলি, সুবিবর প্রেয়-কর্ণ মাঝে,
কিন্তু তথা ভুজঙ্গিনী লুকাইয়া আছে॥'[১৩]

গ্রামবার্ত্তা পত্রিকায় কুমারখালীর অধিবাসীদের যে লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, তা সাধুভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। বই পুস্তক ও অন্যান্য লেখা সংক্রান্ত কাজে তখন সাধুভাষার প্রচলন ছিল।

কুমারখালীর আদিবাসীদের মৌখিক ভাষা যে সাধু ভাষা ছিল না, তা বলা যায়। কারণ সাধুভাষা ছিল সংস্কৃত ঘেঁষা সাহিত্যের ভাষা। বর্তমানে যারা বয়স্ক এবং কুমারখালীর আদি অধিবাসী তারা চলিত ভাষার কাছাকাছি পর্যায়ে কথা বলে থাকে। তবে সাধু ভাষার দুয়েকটি শব্দ কথা বলার সময় এখনও কারও কারও এসে যায়। কুমারখালীর শিক্ষিত আদি অধিবাসীদের ভাষা। যেমন-

ক. বাজার অন্তে তুমি আমার সহিত দেখা করবে।
খ. ছাওয়াল শব্দটি হয়ে গিয়েছে ছেলে।
গ. পোলাপান না বলে বর্তমানে ছেলেপেলে বা ছেলেমেয়ে বলে।

উপরের ক,খ ও গ নম্বর উদাহরণে কুমারখালীর শিক্ষিত আদি অধিবাসীদের ভাষার ব্যবহার দেখানো হয়েছে। ক নম্বরে 'অন্তে' এবং 'সহিত' শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'অন্তে' ও 'সহিত' শব্দ দুটি সাধু ভাষায় ব্যবহৃত হয়। চলিত ভাষায় 'অন্তে' না বলে 'শেষে' বলা হয় এবং 'সহিত' না বলে 'সাথে' বলা হয়ে থাকে। খ নম্বর উদাহরণে 'গিয়েছে' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু চলিত ভাষায় 'গিয়েছে' ব্যবহৃত না হয়ে 'গেছে' ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গ নম্বর উদাহরণে চলিত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। কুমাখালীতে ছেলেমেয়ে না বলে পূর্বে সাধারণত পোলাপান বলা হতো। বর্তমানে কিছু বয়স্ক লোক ছাড়া ছেলেমেয়ে অর্থে পোলাপান শব্দটি ব্যবহার করতে খুব একটা দেখা যায় না।

আদি অধিবাসীদের সবাই যে একই ধরণের অর্থাৎ একই বাচন ভঙ্গিতে ভাষা ব্যবহার করে তা কিন্তু নয়। 'একই ধরণের বসতি, পেশা, সামাজিক অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য সামাজিক অবস্থান, বংশগত ধারা, ধর্মমত, বর্ণ প্রভৃতি একটি শ্রেণীগঠন মূলে বা শ্রেণী (class) চেতনাতে ক্রিয়াশীল থাকে। আরোপিত মূল্যবোধ বা সামাজিক উচ্চনীচভেদ একটি কৃত্রিম বিভাজন সৃষ্টি করে শ্রেণীকে চিহ্নিত করে। ভাষাবিদগণ মনে করেন সমাজের এই ভাগ বা বিভাজন ভাষার ব্যবহারকেও নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ

Dhaka University Institutional Repository

ভৌগোলিক কারণই নয়, সামাজিক কারণও ভাষা ভিন্নতা সৃষ্টি করে। যেমন একই 'খাওয়া' ক্রিয়াটি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীস্তরে আহার ভোজন গেলা বা পেটে দেওয়া হয়।'[১৪]

সমাজে অবস্থান করার জন্য মানুষ সামাজিক রীতি-নীতি অনুযায়ী চলে থাকে। জন্মের পর সমাজে অবস্থান করার জন্য মানুষ কিছু নিয়মরীতিতে অভ্যস্থ হয়। মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনে সমাজ সৃষ্টি করেছে। তেমনি মানুষ একে অপরের সাথে যোগাযোগ করার জন্য ভাষার মত বিস্ময়কর হাতিয়ারও সৃষ্টি করেছে। অবস্থানগত ভিন্নতা প্রাথমিক হিসেবে ভিন্ন সমাজ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে বলে প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া মানুষের মধ্যে নিজের মত বা মনোভাবকে বড় করে দেখার একটা সহজাত আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। এই স্বাতন্ত্র্যবোধও ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম-নীতি সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে বলে ধরে নেয়া যায়।

অর্থনৈতিক অবস্থান ও শিক্ষা, এ দুটি বিষয়কে বাদ দিয়ে সামাজিক শ্রেণীভেদ চিন্তা করা যায় না। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় অর্থ ও শিক্ষাকে সামাজিক শ্রেণী করণের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। আবার একই সমাজে এমনকি একই পরিবারের ভাষাভাষীদের মধ্যেও ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়। একই অর্থনৈতিক অবস্থা এবং একই শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ভাষার মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে। এই পার্থক্য সৃষ্টির মূলে যে বিষয়টি মুখ্য ভূমিকা পালন করে তা হলো যৌনগত কারণ। নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহারের যে বিষয়টি দেখা যায় তাতে শ্রেণীগত অবস্থান স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায়।

তাহলে ভাষার স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে শ্রেণীগত অবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কার ও যুক্তি নির্ভর ধারণা থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সমাজ ও ভাষা সৃষ্টি এবং এর প্রয়োগের প্রাথমিক সূচনা হতেই সামাজিক স্তরীকরণের বিষয়টি চলে আসছে। এর অন্যতম কারণ হলো, তখনও নারী ও পুরুষ ছিল। বয়সের বিষয়টি তখনও ছিল এবং ধরে নেয়া যায় আদি অবস্থায়ও মানুষের মধ্যে মান্য-অমান্য করার বিষয়টিও উপস্থিত ছিল। তা না থাকলে মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে অবস্থান করতে পারতো না।

'সমাজ ভাষাবিদগণের (লেবভ-মতবাদী ও বৃটিশ) হাতে শ্রেণীগত উপভাষা (sociolects) একটা ভিন্ন ও আধুনিক মাত্রা পায়। সমাজ ভাষাতাত্ত্বিক ধারণার বিকাশের আগেও এই শ্রেণীগত উপভাষা-চিন্তার নানা প্রকাশের কথা জানা যেত। সম্ভবত আরিষ্টটল শিষ্টাতিরিক্ত ভাষারূপের বৈচিত্র্য সম্পর্কে প্রথম স্পষ্ট মনোভাব ব্যক্ত করেন। এবং এ যাবৎ Koine (আদর্শ) ও Patois (মিশ্র ও নিত্যকার) ভাষারূপের পার্থক্যকে এই আরিষ্টটলীয় প্রথাতেই দেখা হতো। বাংলা ভাষায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একই সমাজে ও একই ভাষাভাষী শ্রেণীর ভেতরে শ্রেণীগত উপভাষার (class dialects) কথা বলেছেন (S.K. Chatterji 1970 : 138)। য়েসপারসনের অনুসরণে সুকুমার সেন 'বাংলায় নারীর ভাষা' (১৯২৭, ১৯২৮ ও ১৯৭৯) রচনা করেন। ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক অপরাধীশ্রেণীর ভাষা জরিপ করেন এবং একটি ভিন্ন শ্রেণীগত ভাষারূপে তাকে চিহ্নিত করেন।'[১৫]

কুমারখালীর আদি অধিবাসীদের বিষয়ে যে ধারণা পাওয়া যায় তাতে কুমারখালীর আদি অধিবাসী সিংহভাগই হিন্দু ধর্ম মতাদর্শী ছিল। হিন্দুদের মধ্যে শ্রেণীগত অবস্থান বড় রকমের ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে অবশ্য কুমারখালীতে মুসলমানদের আধিক্য দেখা যায়। কুমাখালী শহর পৌরসভার মর্যাদা পায় ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে। পৌরসভার মর্যাদা পাওয়া এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের যে চিত্র কুমারখালীতে দেখা যায় তা কুমারখালীর আদি অধিবাসীদের অবস্থান ও সামাজিক মর্যাদাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যার সাথে ভাষা প্রয়োগের বিষয়টির যোগসূত্র রয়েছে। কুমারখালী শহরের আদি

Dhaka University Institutional Repository

অধিবাসীদের বিষয়ে কুমারখালী পৌরসভার ১২৫তম বর্ষপূর্তি (১৮৬৯-১৯৯৪) উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা থেকে যা জানা যায় তা হলো:

'কুমারখালী শহরের আদিবাসী পাল অর্থাৎ কুমাররা। এদের প্রাচীন নিবাস গৌড়। বর্গির হামলা ১৭৪০-১৭৫০ শুরু হলে এরা চলে আসে কুমারখালী অঞ্চলে। তাদের সাথে আসে তন্তুবায় সম্প্রদায়ের লোকজন, যারা প্রামানিক, বসাক ও পোদ্দার নামে খ্যাত। বসাকরা সাধারণত রঞ্জক। সুতার রং করা দ্রব্যের ব্যবসা করতেন। এদের আদি নিবাস রাজ মহল (বর্তমানে বিহার) সেখান থেকে এদের কিছু অংশ ইংরেজ আসার আগেই কলাকাতার সূতাপট্টির হাটে ব্যবসা করতেন আর কিছু কুমারখালী, পাবনা এলাকায়। কুমারখালীর কুমার (পালদের) কিছু লোক কলকাতায় কুমারটুলিতে বসবাস শুরু করেন। ব্যবসা উপলক্ষ্যে ও কুঠিয়ালদের কুঠিতে চাকরির উদ্দেশ্যে আসেন বেনে দত্তরা। এ ছাড়া অধিকাংশ কুলিন হিন্দু জমিদারদের নায়েব, আমলা, গোমস্তা হিসাবে কর্মরত থাকাকালীন জমিজমার মালিক হন। ফলে এখানে চক্রবর্তী, বাগচি, লাহিড়ী, গোস্বামী, অধিকারী, সান্যাল, ভাদুরী, মুখার্জি, ব্যানার্জি, মজুমদার, মৈত্র, রায় বংশীয় ব্রাহ্মণ কুলের আধিক্য দেখা যায়। পূজারী ব্রাহ্মণদের মধ্যে ভট্টাচার্য্য গোত্রের আদিপুরুষ নিমচন্দ্র ভট্টাচার্যই এ এলাকার আদি ব্রাহ্মণ এবং তারই নির্মিত প্রাচীন অট্টালিকাটি অদ্যাবধি কুমারখালী শহরে বিদ্যমান আছে। এ ছাড়া ত্রিবেদী ও চতুর্বেদী বংশীয় ব্রাহ্মণরা এখানে বসবাসরত ছিলেন। অতীতে দু-একঘর বামুনের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। অধিক সংখ্যক ঘোষ, বোস, সেন, মিত্রসহ নন্দী ও চাকী বংশীয় কায়স্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা অধিক হারে এখানে ব্যবসায় নিয়োজিত ছিলেন। এই থানায় রোকনপুর, ব্রহ্মণকর্ণ, মোহাম্মদশাহী, জাহাঙ্গীরাবাদ, বিরাহিমপুর, ইসলামপুর, নাজির এনায়েতপুর, ভড় ফতেহপুর, জিয়া রাখী, বেগমাবাদ, কান্তনগর প্রভৃতি পরগনায় জমিজমা অন্তর্ভুক্ত থাকায় বিভিন্ন জমিদারগণের কাচারী ছিল। ফলে পাইক বরকন্দাজ হিসাবে রায় সিং নামক ক্ষত্রিয় বামুনদের বসবাস ছিল। চৈতন্য দেবের আগমনের কারণে এই এলাকায় বৈরাগী সম্প্রদায়ের লোকদের বসবাসের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বেশ কয়েকটি গোপী নাথ মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কুবের, মন্ডল, বিশ্বাস, চন্ডাল, যোগী, নাথ এরাও ছিল এই শহরে। কুমারখালী শহরের আশেপাশে সম্ভ্রান্ত মুসলমান হিসাবে সৈয়দ, খন্দকার, কাজী, মোল্লা, মুন্সীরা বসবাস করতেন। শেখ, সর্দার, খাঁ এরা শহরের আশেপাশেই বসবাস করতেন। ঘোড়ার গাড়ি চালনার জন্য শাহ (খুকস্) সম্প্রদায়ের লোকেরা শহরের মধ্যেই বসবাসরত ছিলেন। এককালে সেরকান্দী ও দূর্গাপুর অঞ্চল মিলে তাদের জন্য শাহাজীপাড়া নামক একটি পাড়াও ছিল। মুসলমান তাঁতীরা পূর্ব থেকেই বাটিকামারা অঞ্চলে বসবাস করতেন। এ ছাড়া ধর্মান্তরিত বিশ্বাস ও মন্ডল নামক মুসলিম সম্প্রদায় এই শহরের আশেপাশে প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। মুসলিম নিকারী সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রথমে এদ্রাকপুর গ্রামে পরবর্তীতে তেবাড়িয়া ও এলংগী এলাকায় বসবাস শুরু করেন।'[১৬]

বাংলার মানুষের মুখের ভাষাকে ভাষা বিজ্ঞানীরা প্রধান উপভাষা হিসেবে যে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন তা হলো: রাঢ়ী, বরেন্দ্রী, বাঙ্গালী, কামরূপী ও ঝাড়খন্ডী। এই উপভাষাগুলির মধ্যে রাঢ়ীর কলকাতা ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের ভাষা নিয়ে গড়ে উঠেছে আদর্শ চলিত বাংলা (Standard Colloquial Bengali)। যে ভাষার রূপকে পরবর্তীতে চলিত ভাষা বলা হয়ে থাকে। 'জর্জ আব্রাহাম্ গ্রীয়ার্সনের মতে বিশেষ করে হুগলীর উপভাষা হল শিক্ষিত জনের আদর্শ চলিত বাংলার মূল ভিত্তি;'[১৭] "The purest and most admired Bengali spoken in the area marked as central and... perhaps, that spoken in the District of Hooghly, near the river of the same name is the shade with which it is considered the most desirable to be familiar"[১৮] 'আবার ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে কলকাতা ও নদীয়ার শিক্ষিতজনের কথ্য বাংলাই হল 'আদর্শ' চলিত 'বাংলার ভিত্তি;'[১৯] "The speech of the upper classes in

Dhaka University Institutional Repository

the western part of the Delta and in Eastern Radha gave the literary language to Bengal, and now the educated colloquial of this tract, especially of the cities of Nadiya and calcutta, has become the standard one for Bengali, having come to the position of which educated southern English now occupies in Great Britain and Ireland"[২০] আসলে হুগলী বনাম নদীয়ার বিতর্কে না গিয়ে আমরা মোটামুটিভাবে বলতে পারি— কলকাতা এবং তার নিকটবর্তী উত্তর ২৪ পরগণা, নদীয়া, হুগলীর কথ্য বাংলাই হল আদর্শ চলিত বাংলার মূল ভিত্তি।'[২১]

কুমারখালী নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আদর্শ চলিত বাংলা গড়ে ওঠার যে ইতিহাস তাতে নদীয়া জেলার নাম বারবার এসেছে। তাছাড়া চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বাংলায় নতুন করে জোয়ার এসেছিল অর্থাৎ চৈতন্যদেব নিজের ভাষার বড়াই করতেন। চৈতন্যদেব নদীয়া জেলার অধিবাসী ছিলেন। চৈতন্যদেবের সময় নবদ্বীপ ছিল বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। বর্তমানে কুমারখালীর বাসষ্ট্যান্ডের অনতিদূরে কুলি পাড়া অবস্থিত। কুলিরা নিজেদের কুমারখালীর আদি অধিবাসী হিসেবে দাবী করে। তাদের সাথে কথা বললে তাদের দাবীকে অস্বীকার করা যায় না। এর কারণ হলো কুমারখালীর কুলিরা চলিত বাংলায় বা চলিত বাংলার কাছাকাছি কথা বলে থাকে। তাছাড়া কুমারখালী থানার ধর্মপাড়া বা ধরমপাড়া নামে যে এলাকা রয়েছে সেখানে বাস করে কুমাররা।

কুমারদের সাথে কথা বললে বাংলা ভাষার চলিত রীতির কথা অনুধাবন করা যায়। কুমারখালীর ধর্মপাড়ার কুমারেরা কিংবা কুমারখালীর শহরের কুলিরা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু নয় কিংবা উচ্চ শিক্ষিতও নয়। তাদের আর্থিক অবস্থাও খুব ভাল নয়। কিন্তু ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় তা হলো তারা চলিত বাংলার কাছাকাছি কথা বলে থাকেন। অবশ্য তাদের ভাষায় যে কোন আঞ্চলিক শব্দ নেই, তা নয়। তবে তার পরিমাণ বেশ কম। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ধর্মপাড়ার কুমাররা এবং কুমারখালী শহরের কুলিরা দু'পেশার লোকেরাই হিন্দু। কুমারখালীর আদি অধিবাসীরা চলিত ভাষার কাছাকাছি বা চলিত ভাষায় কথা বলে থাকেন তা বলা যায়।

কুমারখালীর আদি অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান রয়েছেন। বংশগতভাবে উঁচু-নিচুর বিষয়টি রয়েছে। তাছাড়া শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের বিষয়টি যেমন রয়েছে, তেমনি ভাবে রয়েছে ধনী ও গরিবের বিষয়টি। অশিক্ষিত ও গরীবশ্রেণীর ভাষাভাষীরা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছুটা অসতর্ক। কুমারখালীর অশিক্ষিত ও গরীবশ্রেণীর আদি অধিবাসীদের ভাষার দিকে একটু দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। যেমন:

ক. এ পন্ত থাক
   অর্থ: এ পর্যন্ত থাক

খ. কিডা কোলো
   অর্থ: কে বলল

গ. ঘাতোনি ঘুতোনি দিত
   অর্থ: মারপিট করতো

ঘ. এ্যাক ক্যান খর দ্যাও তো
   অর্থ: একটা খর (পান খাওয়ার খর) দাও

ঙ. খুতি আনতি খেয়াল নেই
   অর্থ: থলে আনতে মনে নেই

চ. আরে জন্তনা

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: কি ঝামেলা (বিরক্তি/আনন্দসূচক অর্থে)

উপরের উদাহরণগুলো কুমারখালীর কৃষ্ণপুর গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। পঁচানব্বই বছর বয়স্ক একজন অশিক্ষিত ও দরিদ্র কৃষকের ব্যবহৃত ভাষার রূপ দেখানো হয়েছে। কুমারখালী থানার সব মানুষ যে এক ভাবে কথা বলে তা কিন্ত নয়। ভৌগোলিক দূরত্ব ও যোগাযোগের বিষয়টি ভাষা পৃথক হওয়ার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। উপরের উদাহরণে আঞ্চলিক শব্দের যে বিষয়টি রয়েছে সে দিকে নজর দেয়া যেতে পারে।

	কুমারখালীর আঞ্চলিক শব্দ	অর্থ
ক নং উদাহরণে	পন্ত	পর্যন্ত
খ নং উদাহরণে	কিডা	কে
	কোলো	বলল
গ নং উদাহরণে	ঘাতোনি ঘুতোনি	মারপিট (স্বল্প অর্থে)
	দিত	করতো
ঘ নং উদাহরণে	এ্যাক-ক্যান	একটা
	দ্যাও	দাও
ঙ নং উদাহরণে	খুতি	থলে
	আনতি	আনতে
	খেয়াল	মনে
চ নং উদাহরণে	আরে	কি
	যন্তনা	ঝামেলা

কুমারখালীর আদি অধিবাসীদের মধ্যে বয়স্ক মহিলারা কথা বলার সময় প্রায়ই প্রবাদ প্রবচন বলে থাকেন। তবে পুরুষেরা যে বলেন না তা নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় নিজের নাম লিখতে পারেন না, পড়তে পারেন না, এমন সব অশিক্ষিত নারী পুরুষেরা সুন্দর সুন্দর প্রবাদ প্রবচন বলে থাকেন। যেমন:

ক. মাচা নেই তার বুধবার
অর্থ: সংসারী না হয়েও সংসারের খোঁজ নেয়া

খ. যেই ছা কে তেই ছা মেলে
রাজকে মেলে রাণী
ভূতকে ভূতেনী মেলে
খাপসেকে মেলে খাপসেনী
অর্থ: যে যেমন তার বন্ধু বা সঙ্গী তেমন হয়

গ. যেমনি আমার এজ্জেকান, তেমনি আমার ঘুন্নিকান, ভনভকাত ভনভকাত
অর্থ: নির্বোধ ও বোকা লোকদের কাজ অসম্পূর্ণ ও এলোমেলো হয়

ঘ. হাটতি জানে না বউ, উঠোনেরই দোষ
অর্থ: নিজে পারদর্শী না হয়ে কাজের প্রতি অনীহা দেখানো

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. গমও উদা যাতাও ঢিল
অর্থ: বিচারক ও অন্যায়কারীর মধ্যে যোগসাজস

চ. আল্লার মার দ্যাশের বার
অর্থ: প্রকৃতি প্রদত্ত দুর্যোগ ঠেকানো যায় না

ছ. কপালন কপালন, কপালে যা আছে, তার বেশী আর হবি নে, লেখলি পড়লি কি হবি
অর্থ: ভাগ্যে যা লেখা থাকে তা হয়

বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে বাড়তি কোন কথা না বলে বয়স্ক লোকেরা প্রবাদ প্রচন বলে তাদের মনের ভাব ব্যক্ত করে থাকে। এখানে উল্লেখ থাকে যে শুধুমাত্র অশিক্ষিত লোকেরাই যে প্রবাদ প্রবচন বলেন তা নয়। কুমারখালীর বয়স্ক শিক্ষিত লোকেরাও প্রবাদ প্রবচন বলে থাকেন। তবে বর্তমান সময়ের যে সব জনগোষ্ঠী কুমারখালীতে বসবাস করছেন তাদের মধ্যে প্রবাদ প্রবচন বলা লোকের সংখ্যা বেশ কম।

কুমারখালীর আদি অধিবাসীদের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে মান্য-অমান্য করার বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। বয়স্ক লোকও শিক্ষিত ও ধনী ঘরের ছেলেমেয়েদের সাথে 'বাবা', 'সোনা', 'মা' ইত্যাদি বলে সম্বোধন করে থাকেন। সর্বনাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে আপনি/আপনারা ইত্যাদি ব্যবহার করতে দেখা যায়। কিন্তু অশিক্ষিত ও গরীব ঘরের ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রে নাম ধরে ডাকতে বা তুই/তুমি/তোমরা সর্বনাম ব্যবহার করতে দেখা যায়। অবশ্য পূর্বে ধনী ও নামকরা পরিবার ছিল কিন্তু বর্তমানে গরীব ও অশিক্ষিত হয়ে গেছে এ ধরণের পরিবারের সন্তানদের সাথে অথবা ঐ পরিবারের লোকের সাথে কুমারখালীর আদি অধিবাসীদের বেশ ভাল আচরণ করতে দেখা যায়। অর্থাৎ সামাজিক ভাবে উঁচু নিচুর সাথে ভাষা প্রয়োগের বিষয়টি সমান্তরালভাবে কুমারখালীর আদি অধিবাসীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

বাংলা ভাষার চলিত রীতির যে রূপ গড়ে উঠেছে তার ভিত্তি মূলে নদীয়া জেলার উচ্চশ্রেণীর কথ্য ভাষা অবস্থান করেছে। কুমারখালী যেহেতু নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল, তাই ধরে নেয়া যায় কুমারখালীর উচ্চশ্রেণীর মুখের ভাষাও চলিত রীতির ভিত্তি হিসেবে অবস্থান করেছে। কুমারখালীর আদি উচ্চশ্রেণী বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ উচ্চশিক্ষিত ও সামাজিকভাবে উঁচু মানের আদি অধিবাসী। এ ধরণের অধিবাসী কুমারখালীতে বর্তমানে বেশ কম। এর পেছনে যে বিষয়টি অবস্থান করছে তা হলো বাংলা ভাষার চলিত রীতি গড়ে ওটার সময় নদীয়া জেলার কুমারখালীতে আদি উচ্চশ্রেণীর মধ্যে নামকরা বলতে কিছু হিন্দু পরিবার ছিল উল্লেখযোগ্য। কুমারখালীর বয়স্ক লোকদের কাছ থেকে জানা যায় যে কুমারখালীতে হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল। লর্ড বেন্টিংয়ের শাসনকালে লর্ড মেকলের সুপারিশক্রমে ফারসীর স্থানে রাজভাষা রূপে গৃহীত হলো ইংরেজী। ফারসীর পরিবর্তে ১৮৩৫ সালে রাজভাষা রূপে ইংরেজী গৃহীত হবার বহু পূর্ব থেকেই বাংলাদেশের হিন্দুদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ দেখা যায়। অবস্থাকে স্বীকার করে নিয়ে ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা করা জন্য উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাঙালী হিন্দু সমাজকে উদার আহবান জানান রামমোহন।"[২২] 'পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত রাজধানী মুর্শিদাবাদই ছিল সমগ্র বাংলাদেশের প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। রাজশক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক জীবন নি:শেষিত হয়ে গিয়ে নতুন-গড়ে-ওঠা রাজধানী কলকাতায় নতুন করে দানা বাঁধতে থাকে। মুর্শিদাবাদ-কেন্দ্রিক এতকালের সাংস্কৃতিক জীবনে মুসলমানের যে প্রাধান্য ছিল, সেখানে কলকাতা-কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক জীবনে মুসলমানের আর কোন প্রতিপত্তি খুঁজে পাওয়া গেল না।"[২৩] ধর্মের কারণে ভাষার ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। আরবি ও ফারসির প্রতি বাঙালী মুসলমানদের একটা উদার মনোভাব লক্ষ্য করা যেত। এর পেছনে যে যুক্তি আছে তা হলো মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'কোরআন' আরবি'তে সংরক্ষিত। তবে পবিত্র কোরআনের আরবি তার আরব দেশের ভাষা অর্থাৎ আরবি ভাষার

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাছাড়া ফারসি, উর্দূ ইত্যাদি ভাষা কোন অবস্থাতেই মুসলমানদের ভাষা তা বলা যায় না। কারণ ফারসি বা উর্দূর সাথে মুসলমান ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। ইংরেজি, বাংলা ও অন্যান্য ভাষার মতই ফারসী ও উর্দূ ভাষা।

তবে বাংলাদেশে যে সব মুসলমান ধর্মপ্রচারক এসেছেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ফারসী ভাষী। ফারসী ভাষার লিপি ও আরবি ভাষার লিপি প্রায় এক। ভারতীয় উপমহাদেশের শাসন ক্ষমতায় বহুকাল যাবত ফারসী ভাষী মুসলমাসন শাসকেরা ছিলেন। এ সব নানা বিষয়ের জন্য বাঙালী মুসলমানেরা ফারসীর প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন বলে ধরে নেয়া যায়। বাংলা ভাষার যে কথক সংখ্যা তাতে দুটি ধর্মালম্বীদের আধিক্য দেখা যায়। একটি মুসলমান, অপরটি হিন্দু। কুমারখালীতেও হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি অবস্থান করে আসছেন। ধর্মীয় বিষয় বাদ দিলে বাঙালীরা একই ভাষা ও একই সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে। কিন্তু ধর্মগত অবস্থানকে কোন অবস্থাতেই পাশে রেখে সামাজিক স্তরীকরণের বিষয়টি ভাবা যায় না। কুমারখালীর সমাজ ব্যবস্থায়ও হিন্দু ও মুসলমানের বিষয়টি বাদ দেয়া যায় না। তবে কিছু ধর্মীয় রীতি-নীতি ও স্বজনসূচক ভাষা বাদে কুমারখালীর হিন্দু ও মুসলমানদের ভাষা একই সূতোয় গাঁথা। অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমানদের ভাষা ব্যবহারের পার্থক্যের বিষয়টি নিতান্তই নগন্য।

পরিশেষে কুমারখালীর আদি অধিবাসীদের ভাষার বিষয়ে বলা যায় কুমারখালীর আদি অধিবাসীরা ভাষার বিষয়ে বেশ সচেতন। ভাষা ব্যবহার ও ভাষা প্রয়োগের যে চলিত রীতির বিষয়টি বাংলা ভাষায় রয়েছে তার ভিত্তি হিসেবে কুমারখালীর লোকের মুখের ভাষার উপস্থিতি ছিল এ কথা বলা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

১. ১২৫তম বর্ষপূর্তি (১৮৬৯-১৯৯৪) স্মরণিকা, ১৯৯৪, কুমারখালী পৌরসভা, কুষ্টিয়া, পৃ. ৩০।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

৩. অশোক চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৫, উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলন ও কাঙাল হরিনাথ, (উদ্ধৃতি, মোঃ আবদুল হালিম: কুমারখালীর কথা) লেখক সমাবেশ, কলকাতা, পৃ. ১৭।

৪. ১২৫তম বর্ষপূর্তি স্মরণিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

৬. অশোক চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, [উদ্ধৃতি, W.W. Hunter:A Statistical Account of Bengal. vol. II (Nadia & Jessore)]; পৃ. ১৭-১৮।

৭. অশোক চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, (উদ্ধৃতি, আবুল আহসান চৌধুরী : কাঙাল হরিনাথ মজুমদার), পৃ. ১৮।

৮. প্রাগুক্ত; (উদ্ধৃতি, সৈয়দ মুর্তাজা আলি : কুষ্টিয়ার ইতিহাসের যৎ কিঞ্চিত, আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত), পৃ. ১৮।

৯. প্রাগুক্ত; (উদ্ধৃতি, আবুল আহসান চৌধুরী : কাঙাল হরিনাথ হরিনাথ মজুমদার) পৃ. ১৯।

১০. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, বাঙ্গালা ব্যাকরণ, উপক্রমণিকা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় মুদ্রণ বাংলা ১৩৮৩, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, পৃ. ২-৩।

১১. গ্রামবার্ত্তা, (এই পত্রিকা কুমারখালীর মথুরানাথ যন্ত্রে শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রিন্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত), ফেব্রুয়ারি ও মার্চ, ১৮৮১, পৃ. ৩৬৪।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫।

১৪. মনিরুজ্জামান, উপভাষা চর্চার ভূমিকা, ১৯৯৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

১৬. ১২৫তম বর্ষপূর্তি স্মরণিকা, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৯-৪০।

১৭. রামেশ্বর শ', সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা , তৃতীয় সংস্করণ: ৮ই অগ্রাহায়ন ১৪০৩, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ৬৬২।

১৮. প্রাগুক্ত, (উদ্ধৃতি, George Abraham Grierson); পৃ. ৬৬২-৬৬৩।

১৯. রামেশ্বর শ', প্রাগুক্ত; পৃ. ৬৬৩।

২০. প্রাগুক্ত, (উদ্ধৃতি, Prof. Suniti Kumar chatterji); পৃ. ৬৬৩।

২১. রামেশ্বর শ', প্রাগুক্ত; পৃ. ৬৬৩।

২২. মুহম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৪, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, পৃ. ৪-৫।

২৩. প্রাগুক্ত; পৃ. ৬।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান অধিবাসীদের ভাষা

কুমারখালীর বর্তমান অধিবাসীদের ভাষা আলোচনার পূর্বে কুমারখালীর আয়তন, লোকসংখ্যা, ভৌগোলিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা থাকার আবশ্যকতা রয়েছে। ভাষার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থা যোগাযোগ ব্যবস্থা লোকসংখ্যা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেখানে মানুষ থাকে না, সেখানে ভাষার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। কারণ ভাষা মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম এবং ভাষা মানব মনের দর্পন। ভাষার মাধ্যমেই একজন মানুষ অন্য একজন মানুষকে জেনে থাকে, বুঝে থাকে। ভাষার মাধ্যমে একজন মানুষের সাথে অন্য একজন মানুষের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। ভাষার সঠিক ও সুচারু প্রয়োগের মাধ্যমে একজন মানুষ অন্য একজন মানুষকে কিংবা অসংখ্য মানুষের মন জয় করতে পারে। আবার ভাষার মাধ্যমেই একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের কিংবা অসংখ্য মানুষের বিরাগ ভাজন হয়ে উঠতে পারে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় ভাষার সঠিক প্রয়োগ না হওয়ার জন্য নানা সমস্যা মানুষের সামনে এসে উপস্থিত হয়ে থাকে। নানা রকম ঝগড়া বিবাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায় ভাষার প্রয়োগ অপপ্রয়োগের জন্য। বর্তমানে বাংলার যে প্রমিতরূপ অর্থাৎ চলিত বাংলা তার ভিত্তিমূলে কুমারখালী অঞ্চল ছিল বলে জনা যায়। কারণ কুমারখালী নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

'কলকাতা এবং তার নিকটবর্তী উত্তর ২৪ পরগণা, নদীয়া, হুগলীর কথ্য বাংলাই হল আদর্শ চলিত বাংলার মূল ভিত্তি।'[১] যেহেতু কুমারখালী নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল তাই বলা যায় কুমারখালীর কথ্য বাংলা চলিত বাংলার মূল ভিত্তি ছিল। কুমারখালীতে বর্তমানে যাঁরা বসবাস করছেন অর্থাৎ কুমারখালীর অধিবাসীদের মধ্যে ধর্মগত যে দিক রয়েছে তা হলো, মুসলমান এবং হিন্দু। তাছাড়া আছে শিশু, যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা নানান স্তরের লোক। শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত ভাষাভাষী রয়েছেন। পেশাগত দিক থেকে রয়েছেন কৃষক, কামার, কুমার, তাঁতী, জেলে, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, নানান পেশার লোক। সব শ্রেণীর মানুষই সংজ্ঞাপনের জন্য ভাষা ব্যবহার করেন। এক অঞ্চলের ভাষা অন্য অঞ্চলের ভাষা থেকে কিছুটা দূরে অবস্থান করে বলেই ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতা দেখা যায়।

বাংলাদেশ আদমশুমারী (১৯৯৯) কমিউনিটি সিরিজ, জেলা- কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ থেকে কুমারখালীর যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হলো : ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই কুমারখালী থানা জনসংখ্যার দিক থেকে কুষ্টিয়া জেলার তৃতীয় বৃহত্তম থানা হিসেবে অবস্থান করে আসছে। কুমারখালী থানার প্রকৃত নাম কি তা কেউই ঠিকমত বলতে পারেন না। তবে অনেকেই মনে করে থাকেন এই এলাকার পূর্বনাম ছিল 'তুলশী ডাঙ্গা'। মোগল শাসনামলের সময় এখানে একজন রাজস্ব সংগ্রাহক নিয়োগপ্রাপ্ত হন যাঁর নাম ছিল 'কুমারকুলি'। সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, কুমারখালী থানা ঐ ব্যক্তির নামানুসারেই পরবর্তীতে পরিচিতি লাভ করেছে।

নদীসহ কুমারখালী থানার আয়তন প্রায় ২৬৫.৮৯ বর্গ কিলোমিটার। কুমারখালী থানায় অবস্থিত নদীর আয়তন প্রায় ১১.৯১ বর্গকিলোমিটার। এই থানা ২৩°৪৪′ ও ২৩°৫৮′ উত্তর অক্ষাংশের এবং ৮৯°০৯′ ও ৮৯°২২′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। কুমারখালী থানার উত্তরে পাবনা সদর থানা, পূর্বে খোকসা থানা এবং রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানা, দক্ষিণে খোকসা থানা এবং ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা থানা এবং পশ্চিমে কুষ্টিয়া সদর থানা অবস্থিত।

Dhaka University Institutional Repository

কুমারখালী থানায় ১০টি ইউনিয়ন, ৫টি ওয়ার্ড, ১৮৮টি মৌজা, ৫টি মহল্লা এবং ২১৬টি গ্রাম আছে। ইউনিয়ন, ওয়ার্ড, মৌজা, মহল্লা এবং গ্রামের গড় জনসংখ্যা প্রায় ২৬৯০১, ৫৩৮০২, ১৪৩১, ৫৩৮০২, এবং ১২৪৫ জন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী কুমারখালী থানার মোট জনসংখ্যা ২৬৯০০৮ জন। তার মধ্যে পুরুষ ১৩৯২৫৫ জন এবং মহিলা ১২৯৭৫৩ জন।

কুমারখালী থানার জনসংখ্যার মধ্যে গ্রামে বাস করে ২৫৭৩৩৩ জন। তার মধ্যে পুরুষ ১৩৩১৯৩ জন এবং মহিলা ১২৪১৪০ জন। এই থানার জনসংখ্যার মধ্যে শহরে বাস করে ১১৬৭৫ জন। তার মধ্যে পুরুষ ৬০৬২ জন এবং মহিলা ৫৬১৩ জন। কুমারখালী থানায় প্রতি কিলোমিটারে বাস করে ১০১২ জন লোক। এই থানায় ৭ বছর এবং তার উপরের বয়সের জনসংখ্যার শিক্ষিতের হার শতকরা ২৪.৯ জন। কুমারখালীতে পুরুষ শিক্ষিতের হার ৩০.৩% এবং মহিলা শিক্ষিতের হার ১৯.২%।

এখানে বর্তমানে যে সব ভাষাভাষী রয়েছেন তাদের মধ্যে কুমারখালীর আদি অধিবাসী ও এখানে নতুন ভাবে বসতি স্থাপন করেছেন এমন অধিবাসী রয়েছেন। ভারতীয় উপমহাদেশের যে ইতিহাস সে দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় বৃটিশ শাসনের অবসানের পর দেশ বিভাগের কারণে অনেকেই নিজ আবাসস্থল ছেড়ে ধর্মগত দিক বিবেচনা করে নতুন ভাবে পৃথক হওয়া নতুন দেশে বসতি স্থাপন করেছেন। এই নতুন ভাবে বসতিস্থাপনের কারণে কিছু লোক যেমন কুমারখালী ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন, তেমনি কুমারখালীতেও বেশকিছু লোক নতুন ভাবে বসতি স্থাপন করেছেন।

তাছাড়া লেখাপড়া ব্যবসা-বাণিজ্য চাকুরি ও বৈবাহিক কারণে অনেকেই কুমারখালী ছেড়ে নতুন কোন জায়গায় বসতিস্থাপন করেছেন। আবার একই কারণে অনেকে কুমারখালীতে বসতিস্থাপন করেছেন। তাহলে কুমারখালীর বর্তমান অধিবাসী বলতে কুমারখালীর আদি অধিবাসী যাঁরা বংশ পরম্পরায় কুমারখালীতে বসবাস করছেন এবং যাঁরা কুমারখালীর আদি অধিবাসী নয় অর্থাৎ বাইরে থেকে এসে বসতিস্থাপন করেছেন, এই দুয়ের সমন্বয়ে গঠিত জনগোষ্ঠীকে বোঝায়।

কুমারখালীতে এমন কিছু পরিবার আছে যাঁরা পৈত্রিক পেশাকেই নিজের পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন বা করতে বাধ্য হয়েছেন। বিশেষ করে অশিক্ষিত অথবা স্বল্পশিক্ষিত লোকদের ক্ষেত্রে বিষয়টি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সাধারণত তাঁতী, কামার, কুমার, স্বর্ণকার, কৃষক, দর্জি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মিস্ত্রী ইত্যাদি পেশার লোকদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়, বাবার পেশাকেই তারা পরবর্তীকালে নিজের পেশা হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন।

কুমারখালীতে যাঁরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী তাঁদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে আত্মীয়তা সম্পর্ক থাকলে কোন ছেলে-মেয়ের বিয়ে হয় না বা সামাজিকভাবে বিয়ে দেয়ার কোন প্রচলন নেই। তাছাড়া একই বর্ণ ছাড়া হিন্দুদের বিয়ে হয় না। এসব কারণে দেখা যায় সাধারণত হিন্দু ভাষা-ভাষী মেয়েরা বিয়ের কারণে অন্য অঞ্চলে চলে যায় অথবা অন্য অঞ্চল থেকে এসে থাকে। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে আপন ভাই-বোন ছাড়া অন্য আত্মীয় স্বজনদের সাথে বিয়ে দেয়ার বা বিয়ে হওয়ার প্রচলন আছে। তাছাড়া মুসলমান ছেলে-মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে বর্ণ বা আত্মীয়-সম্পর্ক তেমন ভূমিকা পালন করে না। যদিও পূর্বে মুসলমানদের মধ্যেও বর্ণগত বিষয়টি যে ছিল না, তা নয়। কুমারখালীতে অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত ছেলে-মেয়েদের বিয়ে প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ কুমারখালীর ছেলের সাথে কুমারখালীর মেয়েরই বিয়ে হয়ে থাকে। অবশ্য কুমারখালী অঞ্চলের সীমা নির্ধারণী রেখার পাশের এলাকার সাথেও কুমারখালীর লোকদের বিয়ে যে হয় না, তা নয়। সীমা নির্ধারণী রেখার পাশের এলাকা কিংবা আরও দূরের এলাকার সাথেও বিয়ের কারণে আত্মীয়তা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে যোগাযোগের জন্য পরিচিত লোক কিংবা আত্মীয় থাকা লাগে। ভাষার ক্ষেত্রে বিয়ের প্রসঙ্গ বিশেষ

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা পালন করে থাকে। কারণ কুমারখালীর নিয়ম অনুযায়ী কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বিয়ের পরে মেয়েরা স্বামীর বাড়িতে চলে যায়। কুমারখালীর আদি অধিবাসী যে কুমারখালীর ভাষা অর্থাৎ চলিত বাংলার কাছাকাছি কথা বলে থাকে সে বিয়ের কারণে অন্য এলাকায় চলে গেলে কুমারখালীর ভাষা অন্য পরিবারের তথা অন্য এলকার সম্পদ হয়ে যায়। ঠিক তেমনি অন্য এলাকার মেয়ে কিংবা ছেলে বিয়ের কারণে অথবা অন্য কোন কারণে কুমারখালীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করলে অন্য এলাকার ভাষা অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির মখের ভাষা যে কুমারখালীর ভাষার উপর কিছুটা প্রভাব ফেলবে না বা ফেলে না তা নয়। এসব কারণে আঞ্চলিক ভাষার যে নিজস্ব রীতি প্রচলিত থাকে, সে রীতিতে কখনও কখনও কিছুটা মিশ্রভাব পরিলক্ষিত হতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রে একজন কিংবা দুজন ভাষাভাষীর মুখের ভাষার প্রভাবে বৃহৎ কোন জনগোষ্ঠীর ভাষা যে পরিবর্তিত হয়ে যায়, তা নয়। কিন্তু নতুন দুয়েকটি শব্দ বা দুয়েকটি কথা ভাষার মধ্যে স্থান পেলেও পেতে পারে।

নতুন বসতিস্থাপন করা যে সব লোক কুমারখালীতে রয়েছেন, তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় যে নারী অথবা পুরুষ কিংবা নারী ও পুরুষ দুজন অন্য এলাকা থেকে এসেছেন, তাদের ভাষায় তাদের নিজস্ব আঞ্চলিকতা লক্ষ্য করা যায়। তবে তাদের ছেলেমেয়ে যারা কুমারখালীতে জন্মগ্রহণ করে, তাদের ভাষা তার মা-বাবার ভাষার মত না হয়ে কুমারখালীর ভাষার মতই হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সামাজিক অবস্থা ও অঞ্চল বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

যশোর জেলার মহকুমা ঝিনাইদহ এখন পৃথক জেলা। ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা থানা কুমারখালীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। শৈলকুপা থানার ভাষা কুমারখালীর ভাষা থেকে খুব একটা পৃথক নয়। ধরা যায়, কুমারখালীর ভাষা ও শৈলকুপার ভাষা প্রায়ই একই রকমের। তেমনি কুষ্টিয়া সদর থানার সীমানা রয়েছে কুমারখালীর সাথে। কুষ্টিয়া সদর থানার ভাষাও কুমারখালীর ভাষা থেকে খুব একটা পৃথক নয়। খোকসা কুষ্টিয়া জেলার একটি থানা এবং কুমারখালীর পাশের থানা। খোকসা এবং কুমারখালী থানা মিলে জাতীয় সংসদের একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। অর্থাৎ কুমারখালী এবং খোকসা দুটি থানার জনগোষ্ঠীর জন্য জাতীয় সংসদের একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে থাকেন। ফলে খোকসা থানার ভাষাভাষীর সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ নানা কারণে কুমারখালীর ভাষাভাষীদের যোগাযোগ রয়েছে।

কুমারখালী থানার সাথে অন্য যে দুটি থানার সীমানা রয়েছে, সে দুটি হলো- রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানা এবং পাবনা সদর থানা। পাংশা এবং পাবনার সাথে কুমারখালীর ভাষাভাষীদের যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও শৈলকুপা, খোকসা এবং কুষ্টিয়া সদর থানার ভাষার সাথে কুমারখালীর ভাষার যে মিল রয়েছে পাংশা এবং পাবনার ভাষার সাথে ঠিক তেমন মিল পরিলক্ষিত হয় না। যদিও পাংশা এবং পাবনা থানার ভাষাভাষীরা কুমারখালীর ভাষা থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ভাষায় কথা বলেন না। 'বরেন্দ্রী বা উত্তরবঙ্গের উপভাষা বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, পশ্চিম বঙ্গের মালদা ও উভয় বঙ্গের দিনাজপুর জেলার দক্ষিণ অংশব্যাপী বিস্তৃত।'[২] যেহেতু কুমারখালীর ভাষা রাঢ়ী উপভাষার মধ্যে পড়ে তাই পাবনার ভাষার সাথে কুমারখালীর ভাষার কিছুটা পার্থক্য থাকা অস্বাভাবিক নয়। এবার বাংলা ভাষার উপভাষাগত শ্রেণীর দিকে নজর দেয়া যেতে পারে। 'প্রধান বাংলা উপভাষাগুলো নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীকরণ করা যায়:

ক. উত্তরবঙ্গ : দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনার প্রচলিত উপভাষা;
খ. রাজবংশী : রংপুরের উপভাষা;
গ. পূর্ববঙ্গীয় : অ) ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, বরিশাল ও সিলেটের উপভাষা;
আ) ফরিদপুর, যশোর ও খুলনার উপভাষা।

Dhaka University Institutional Repository

ওপরে উপভাষার শ্রেণীকরণ গ্রীয়ার্সন (১৯০৩) প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুসারে নির্দেশিত।"

উল্লেখ্য যে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ছিল বর্তমানের রাজবাড়ী জেলা। তাই বলা যায় যেহেতু পাংশা থানা বর্তমানের রাজবাড়ী জেলার থানা, সেজন্য পাংশার ভাষাকে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার মধ্যে ধরা যেতে পারে। কারণ ফরিদপুরের উপভাষা পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার মধ্যে পড়ে। তেমনি যেহেতু বর্তমানের ঝিনাইদহ জেলা যশোর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেজন্য শৈলকুপার ভাষাকেও পূর্ববঙ্গীয় ভাষার মধ্যে ধরা যেতে পারে। তবে 'প্রকৃত প্রস্তাবে যশুরে ভাষা রাঢ়ী ও পূর্ববঙ্গীয় (বঙ্গালি) ভাষার মধ্যবর্তী অবস্থা বা সেতু। 'যশোর' শব্দের অর্থও সম্ভবত তাই।"[৪] বাংলা উপভাষাগত যে শ্রেণী বিভাজন তাতে দ্বিমতের কোন কারণ নেই। তবে রাঢ়ী উপভাষা অঞ্চল সংলগ্ন যে বরেন্দ্রী ও পূর্ববঙ্গীয় (বঙ্গালি) উপভাষা অঞ্চল রয়েছে, সে সব অঞ্চলের ভাষা যে সম্পূর্ণরূপে উপভাষাগত বিষয়টির সীমানা (রাষ্ট্রীয় ম্যাপের জেলা, থানা) মেনে চলে তা ঠিক করে অর্থাৎ গণিত শাস্ত্রের সূত্রের মত ঠিক বলে প্রতীয়মান হয় না। সে জন্যই কুমারখালী সংলগ্ন কিছু এলাকার ভাষা যে এলাকা কুমারখালীর অন্তর্গত নয় তবুও সে এলাকার ভাষা কুমারখালীর ভাষার মতই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এর অন্যতম কারণ হলো বর্তমানের কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালীর ভাষা চলিত রীতির ভিত্তি মূলে ছিল। মানুষের সহজাত স্বভাব হলো ভাল ভাবে অর্থাৎ ভাল ভাষায় কথা বলা। রেডিও, টেলিভিশন ও বাংলা পাঠ্যপুস্তকের বর্তমান ভাষা হলো চলিত ভাষা। সেজন্য চলিত রীতির ভিত্তিমূলে যে এলাকা অবস্থান করেছে সে এলাকার পার্শ্ববর্তী বা সে এলাকা সংলগ্ন কিছু ভাষা-ভাষীর ভাষার উপর কুমারখালীর ভাষার প্রভাব পড়াটা অস্বাভাবিক নয়।

বাংলা সাহিত্যের স্বীকৃত যে দুটি রূপ দেখা যায় তা হলো সাধুভাষা এবং চলিত ভাষা। সাধু ও চলিত ভাষার বিষয়টি উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাঙালী পন্ডিতদের মধ্যে আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল। যদিও সাধুভাষা মূলত সাহিত্যের ভাষা ছিল। 'যাঁর হাতে বাংলা সাধু গদ্যের প্রাথমিক রূপটি বিশেষভাবে গড়ে উঠেছিল তিনি হলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। তার পরে এই সাধু গদ্যের আরো যুক্তিনির্ভর দৃঢ়পিনদ্ধ রূপ রচনা করেন রামমোহন রায়। তিনিই প্রথম 'সাধুভাষা' কথাটি ব্যবহার করেন তাঁর 'বেদান্ত গ্রন্থে' (১৮১৫)। মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহনের গঠিত সাধুগদ্যের কাঠামোতে ছন্দ:স্পন্দন ও শিল্পগুণ সঞ্চারিত করে একে প্রথম আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের যোগ্য মাধ্যম করে তোলেন বিদ্যাসাগর। অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষীদের হাতে এই ধারা পুষ্ট হতে থাকে। শেষে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে এসে বাংলা সাধু গদ্য পূর্ণ বিকশিত রূপ লাভ করে– একাধারে সৃজনধর্মী ও মননধর্মী সাহিত্যের যোগ্য প্রকাশ মাধ্যম হয়ে উঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে ক্রমে এই ধারায় একটা সরলীকরণের প্রবণতা ক্রিয়াশীল হয়ে উঠে এবং সাধুগদ্য তার আভিজাত্যের সিংহাসন থেকে জনজীবনের ভাষার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে পাত্রপাত্রীর সংলাপে চলিত গদ্য ব্যবহার করেছেন, শুধু বর্ণনায় ও বিবৃতিতে রেখেছেন সাধুগদ্য। ... শরৎচন্দ্রের এই ধারাই মোটামুটিভাবে অনুসরণ করেছেন বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক।"[৫]

'সাহিত্যে চলিত গদ্যের ব্যবহার প্রথমে ক্ষীণ ধারায় সূচিত হয় এবং ক্রমে পরিপুষ্টি লাভ করে। উইলিয়াম কেরীর 'কথোপকথনে'র বিভিন্ন শ্রেণীর সংলাপে ব্যবহৃত গদ্য যদিও সর্ববঙ্গীয় ব্যবহারের উপযোগী আদর্শ চলিত বাংলা (standard colloquial Bengali) ছিল না, তবু এখানেই মৌখিক গদ্য সাহিত্যে প্রথম প্রবেশাধিকার লাভ করে। তারপরে বিদ্যাসাগরের শকুন্তলার সংলাপ- অংশে ইতস্ততভাবে কিছু চলিত গদ্যের ব্যবহার দেখা যায়। ইংরেজ শাসনের সময় কলকাতা বাংলার রাজধানী এবং আইন-আদালত ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল আর উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের সময় কলকাতা শিক্ষা সাহিত্যচর্চা সামাজিক আন্দোলনের কেন্দ্রও ছিল। ফলে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্চলের ভাষা প্রাধান্য পায় এবং শিক্ষিত ব্যক্তির ভাববিনিময়ের সর্বজনীন মাধ্যম হয়ে উঠে। এই কলকাতা অঞ্চলের চলিত ভাষাকে কিঞ্চিৎ সাধুভাষার মিশ্রণসহ, সাহিত্যে প্রথম পূর্ণাঙ্গ বলিষ্ঠ আসন দেন প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) তাঁর 'আলালের ঘরের দুলালে' (১৮৫৮) এবং পুরোপুরি চলিত ভাষার ব্যবহার করেন কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায় (১৮৬২)'। বঙ্গিমচন্দ্র প্যারীচাঁদ মিত্রের ব্যবহৃত কথ্য ভাষাকে স্বীকৃতি জানিয়ে ছিলেন এবং এই ভাষাকে 'অপর ভাষা' নামে অভিহিত করেছিলেন। একটি প্রবন্ধে তিনি এই ভাষাকে 'প্রচলিত ভাষা'ও বলেছিলেন। মনে হয় এই 'প্রচলিত ভাষা' থেকেই পরে 'চলিত ভাষা' কথাটির প্রচলন হয়। ..... ১৯১৪ সালে যখন প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রকাশ করে চলিত গদ্যের সপক্ষে ব্যাপক সাহিত্যিক আন্দোলন শুরু করেন তখন রবীন্দ্রনাথও তাতে উৎসাহিত হয়ে সাহিত্যে সাধুগদ্যের ব্যবহার প্রায় ছেড়েই দেন এবং পুরোপুরি চলিত গদ্যে লেখা আরম্ভ করেন। তারপর থেকেই সাহিত্যে ক্রমে গদ্য একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে।"[৬]

সাধু ও চলিত ভাষা নিয়ে আলোচনা করা মূখ্য উদ্দেশ্য না হলেও গদ্য সাহিত্যে চলিত বাংলার গোড়ার কথা জানার আবশ্যকতা রয়েছে, এজন্য যে কুমারখালীর ভাষা চলিত ভাষার মূল ভিত্তি ছিল, এ বিষয়টি কুমারকালীর ভাষার স্তরীকরণ করতে গিয়ে বারবার এসেছে। চলিত রীতি জানতে হলে সাধুরীতির বিষয়েও কিছু ধারণা থাকার প্রয়োজন রয়েছে, এজন্য যে সম্ভবত সাধু রীতি না থাকলে চলিত রীতির প্রসঙ্গ আসতো না। যেহেতু বাংলা সাহিত্যের ভাষা এক সময় সাধুরীতিতে ছিল এবং যেহেতু সাধুরীতি হতে সমগ্র বাংলায় গৃহীত একটি উপভাষা রীতি যা নদীয়া জেলার উপভাষার রীতি বলে ভাষা বিজ্ঞানীরা মত প্রকাশ করেছেন, সে ভাষা সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে এবং সমগ্র বাংলায় আদর্শ বাংলা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, সে রীতি সম্পর্কেও জানার আবশ্যকতা রয়েছে এজন্য যে কুমারখালী অঞ্চলের সাথে বাংলা আদর্শ বা গ্রহণীয় রীতির একটি যোগসূত্র রয়েছে।

কুমারখালীর ভাষা চলিত রীতির কাছাকাছি হওয়ার জন্য কুমারখালী সংলগ্ন যে সব অঞ্চল রয়েছে সে সব অঞ্চলের ভাষার উপর কুমারখালীর ভাষার কিছুটা প্রভাব পড়েছে। তেমনি কুমারখালীর যে অঞ্চল পাবনা ও পাংশা সংলগ্ন সে এলাকার ভাষা কুষ্টিয়া সদর অঞ্চল সংলগ্ন ভাষার মত নয়। এর মূলে যে বিষয়টি রয়েছে, তা হলো যোগযোগ ব্যবস্থা ও ভৌগোলিক দূরত্বের জন্য ভাষায় ভিন্নতা এসে থাকে। ভাষায় ভিন্নতা আসার জন্যই উপভাষাগত বিষয়টির প্রসঙ্গ এসে থাকে। তাছাড়া উপভাষাগত যে শ্রেণীবিভাগ রয়েছে তাতে কুষ্টিয়া সদর ও কুমারখালীর ভাষা একই উপভাষার অন্তর্গত হিসেবে ধরা হয়েছে। কিন্তু পাবনা ও পাংশার উপভাষাগত শ্রেণীর সাথে কুমারখালীর উপভাষার কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

কুমারখালীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাথে জড়িত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। এসব স্থানে প্রতিদিন বাইরে থেকে নানা স্তরের লোক এসে থাকে। বিশেষ করে ছেউড়িয়ায় বাউল সম্রাট লালনশাহের মাজারে এবং শিলাইদহে কবিগুরু বরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠি বাড়িতে প্রতিনিয়ত লোক সমাগম লক্ষ্য করা যায়। কুমারখালীর তৈরি বেডশীট বাংলাদেশের মধ্যে শুধু খ্যাতিসম্পন্নই নয় বহির্বিশ্বেও কুমারখালীর বেডশীট রপ্তানী হয়ে থাকে। বেডশীট ছাড়াও লুঙ্গি, তোয়ালেসহ নানা কাপড় তৈরি হয়ে থাকে কুমারখালীতে। কাপড়ের হাটের জন্য কুমারখালীর বেশ নাম রয়েছে। ব্যবসায়ীক কারণে নানা অঞ্চলের লোক কুমারখালীতে এসে থাকে। নানা এলাকা থেকে লোক আসার কারণে সে সব লোকের মৌখিক ভাষাও কুমারখালীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে যেহেতু ঐসব লোক বেশীদিন ধরে কুমারখালীতে অবস্থান করেন না বা অবস্থান করলেও তাঁরা অধিকাংশই বাঙালী এ কারণে তাঁদের ভাষা খুব একটা কুমারখালীর ভাষার উপর প্রভাব ফেলতে পারে না। বরং অন্য এলাকার ভাষাভাষীরা

Dhaka University Institutional Repository

কুমারখালীর ভাষায় কথা বলতেই বেশী পছন্দ করে থাকেন। তাছাড়া বাংলাদেশে সর্বত্র যে ভাষা ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ চলিত বাংলা সে বাংলায় যেহেতু কুমারখালীর আঞ্চলিক ভাষার সাথে সম্পর্কিত এ জন্য কুমারখালীর ভাষাভাষীরা সাধারণত অন্য এলাকার আঞ্চলিক ভাষা অনুসরণ কিংবা অনুকরণ করেন না।

কুমারখালীর বর্তমান অধিবাসীদের ভাষার ক্ষেত্রে বিশেষ কয়েকটি দিক লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ কয়েকটি দিকের মধ্যে প্রধানত যা রয়েছে তা হলো:

- অশিক্ষিতদের ব্যবহৃত ভাষা
- শিক্ষিতদের ব্যবহৃত ভাষা
- অশিক্ষিত কিন্তু শিক্ষিত মনোভাবাপন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষা
- শিক্ষিত ও অত্যধিক আধুনিক মনোভাবাপন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষা
- অল্পশিক্ষিত ও অনুকরণপ্রিয় জনগোষ্ঠীর ভাষা
- শিক্ষিত এবং নিজেকে নিজেই উচ্চ মর্যাদার ভেবে আনন্দ পায় এমন জনগোষ্ঠীর ভাষা
- শিক্ষিত কিন্তু ভাষা ব্যবহারের প্রতি অসচেতন ভাষা-ভাষীদের ভাষা

কুমারখালীতে যারা অশিক্ষিত এবং কুমারখালীতেই যাদের অবস্থান তাদের ভাষায় বৈচিত্র্য কম। বৈচিত্র বলতে বয়স্ক ভাষা-ভাষীদের ভাষার সাথে বর্তমানের তরুণ-তরুণীদের ভাষার মধ্যে বড় রকমের পার্থক্য দেখা যায় না। এর অন্যতম কারণ হলো অশিক্ষিত ছেলেমেয়েরা তার নিজের বাড়িতে অর্থাৎ বাবা মায়ের বাড়িতে অবস্থান করতে বাধ্য হয়। বাবা-মা কিংবা অন্য আত্মীয়-স্বজনের কথা অনুযায়ীই তারা চলে থাকে। নিজের পরিবারের বয়স্ক ভাষা-ভাষীর কথা শুনে এরা কথা বলতে শেখে এবং বাড়ির অভিভাবকের আচার-আচরণ অনুযায়ী চলে থাকে। সেজন্য এদের ভাষায় বৈচিত্র্য তেমন একটা পাওয়া যায় না। এদের ভাষা চলিত বাংলার কাছাকাছি। তবে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রাম অথবা এক ইউনিয়ন থেকে অন্য ইউনিয়নের ভাষায় যে কিছুটা পার্থক্য থাকে না, তা নয়। পার্থক্য বা আঞ্চলিকতার যে বিষয়টি দেখা যায় তা পূর্ব অবস্থা থেকেই চলে আসছে বলে মনে হয়। তবে আঞ্চলিকতার যে বিষয়টি দেখা যায় তা ভাষায় তেমন বড় রকমের প্রভেদ সৃষ্টি করে না। অশিক্ষিত ভাষা-ভাষীদের ব্যবহৃত কয়েকটি বাক্যের প্রতি নজর দেয়া যেতে পারে। যেমন:

ক. কয়া দেবনে কোল।
চলিত রূপ: বলে দেবো কিন্তু।

খ. তুমা বাড়ি গিছলাম।
চলিত রূপ: তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম।

গ. ক্যামন আছ?
চলিত রূপ: কি রকম আছ?

ঘ. কি কবি ক।
চলিত রূপ: কি বলবা বল।

ঙ. দুকানদার ত্যাল দ্যাও।
চলিত রূপ: দোকানদার তেল দেও।

চ. লাল চুড়ি আনতি কইছিলাম যে।

Dhaka University Institutional Repository

চলিত রূপ: লাল চুড়ি আনতে বলেছিলাম যে।

ছ. ক্যা কবো?
চলিত রূপ: কেন বলবো?

জ. শুয়ারী আনতি গিছলাম।
চলিত রূপ: ভাড়া মারতে গিয়েছিলাম।

উপরের উদহরণের 'ক' নম্বরে 'কোল' শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে 'কয়া দেবনে কোল' অর্থাৎ কোন কিছু অন্যের নিকট বলে দেয়ার হুমকি দেয়া হচ্ছে। 'কয়া' শব্দের অর্থ হলো 'বলে' এবং 'কোল' শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'কোল' শব্দটি এক ধরণের অব্যয় বাচক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যা দ্বারা হুমকি দেয়া অর্থ বোঝানো হয়ে থাকে। 'জ' নং উদাহরণে 'শুয়ারী' শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'শুয়ারী' বলতে কুমারখালীতে কোন মহিলাকে বাবার বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়িতে 'আনা' অথবা শ্বশুর বাড়ি হতে বাবার বাড়িতে 'নেয়া' অর্থ বোঝানো হয়ে থাকে। সাধারণত ভ্যান চালক ও গাড়ি চালকেরা শুয়ারী শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। পূর্বে যখন পাল্কির প্রচলন ছিল তখন পাল্কি বহন করা লোকেরাও 'শুয়ারী' শব্দটি ব্যবহার করতো। তবে ইদানিং 'শুয়ারী' শব্দটির ব্যবহার বেশ কমে গেছে। 'ঘ' নম্বর উদাহরণে 'ক' ধ্বনিটি একটি শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'ক' অর্থাৎ 'বলা/বল' অর্থ বুঝিয়ে থাকে। 'ছ' নম্বর উদাহরণে 'ক্যা কবো' অর্থাৎ 'কেন বলবো', এখানে 'ক্যা' অর্থ 'কেন' এবং 'কবো' অর্থ 'বলবো'। কুমারখালীর ভাষায় এ ধরনের কিছু শব্দ ব্যবহার কুমারখালীর ভাষাকে সম্পূর্ণ চলিত রীতি থেকে কিছুটা পৃথক করেছে। আর এ কারণেই কুমারখালীতে বেশ কিছু আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। বিশেষ করে অশিক্ষিত লোকদের ভাষাতেই আঞ্চলিকতার বিষয়টি ফুটে ওঠে।

কুমারখালীর শিক্ষিত মানুষের ভাষা সাধারণত চলিত ভাষা। শিক্ষিত ভাষা-ভাষীরা বাড়িতে পর্যন্ত চলিত রীতিতে কথা বলে থাকেন। এঁরা ভাষা ব্যবহারে বেশ সচেতনার পরিচয় দিয়ে থাকেন। বাড়িতে যদি কেউ আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করে তাহলে সে সব শব্দ এরা সংশোধন করে দেন। শিক্ষিত ভাষা-ভাষীরা খুব একটা অপভাষা বা গালীজাতীয় ভাষা ব্যবহার করেন না। শিক্ষা, বংশ মর্যাদা, বয়স, সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় রেখে শিক্ষিত ভাষাভাষীরা আপনি, তুমি এবং তুই সর্বনাম ব্যবহার করেন এবং সর্বনাম ব্যবহারের পাশা-পাশি করেন, কারো এবং কর্ ক্রিয়া ব্যবহার করে থাকেন। উল্লেখ্য যে সর্বনামের বহুবচনরূপ প্রয়োজন সাপেক্ষে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কুমারখালীতে এমন ভাষাভাষী রয়েছেন যাঁরা অশিক্ষিত কিন্তু ভাল ভাবে অর্থাৎ ভাল ভাষায় কথা বলে থাকেন অথবা কথা বলার চেষ্টা করেন। এ সব ভাষাভাষীরা পেশাগত দিক দিয়ে সাধারণত ব্যবসায়ী। ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য নানা স্তরের ভাষা-ভাষীর সাথে এঁদের পরিচয় ঘটে থাকে। তবে এঁরা শিক্ষিত লোকদের বেশ মর্যাদা দিয়ে থাকেন এবং শিক্ষিত লোকদের কথা মন দিয়ে শোনেন। শিক্ষিত লোকেরা যেমন ভাবে কথা বলে থাকে তেমন ভাবে এঁরা কথা বলতে চেষ্টা করেন এবং শিক্ষিত লোকদের মত জীবন যাপন করতে চেষ্টা করেন। মূলত এই শ্রেণীর ভাষা-ভাষীরা অর্থনৈতিকভাবে বেশ স্বচ্ছল। সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে এঁরা আগ্রহ সহকারে অংশগ্রহণ করে থাকেন। অশিক্ষিত লোক অপেক্ষা শিক্ষিত লোকদের সাথে এঁরা মেশার চেষ্টা করেন। এ সব নানা কারণে এঁদের ভাষা ব্যবহার অশিক্ষিত ভাষাভাষীদের মত আর থাকে না। এই শ্রেণীর ভাষা-ভাষীরা অশিক্ষিত হলেও এঁদের ভাষা ব্যবহারে বেশ সচেতনতা ভাব পরিলক্ষিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কুমারখালীতে এক শ্রেণীর ভাষা-ভাষী আছেন যাঁরা শিক্ষিত ও অত্যধিক আধুনিক মনোভাবাপন্ন। ভাষা ব্যবহারে এঁদের সচেতনা বা অসচেতনার বিষয়টির তেমন কোন মূল্য থাকে না। এঁরা সাধারণত নব্য শিক্ষিত ও নব্য ধনীক শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। এঁদের ভাষায় অসংখ্য ইংরেজি শব্দ বা খন্ড বাক্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া এঁদের বাচনভঙ্গিতে এক ধরনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। এঁরা যেমন ভাবে ভাষায় শব্দ ব্যবহার করেন তা দেখানো যেতে পারে। যেমন:

সম্পর্কসূচক শব্দ	পরিবর্তিত রূপ
• চাচা/কাকা	চাচ্চু/কাক্কু/চাচ্চা/কাক্কা
• মা	আম্মু/মাম্মী/মাম্
• বাবা/আব্বা	আব্বু/বাপী/বাবু

বাক্যে কোন শব্দ দু'বার বা তিনবারও ব্যবহার দেখা যায় এবং বাক্য উচ্চারণে দীর্ঘ সূত্রীতা লক্ষ্যণীয়। যেমন:

• মাম্মী, মাম্মী আ-মি ভাত খাবো না তো।
• তোমাকে, তোমাকে তো বলেছি, যে আমি যাবো না।
• না, না তুমি যা বলছো না, একদম কিন্তু ঠিক না।

উপরের বাক্যগুলোর প্রচলিত ও স্বাভাবিক রূপ হলো:

• মা আমি ভাত খাবো না।
• আমি যাবো না, তা তো তোমাকে বলেছি।
• তুমি যা বলছো ঠিক না।

ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে এ শ্রেণীর ভাষাভাষীরা যেমন ভাবে কথা বলে থাকন, তার কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন:

• প্লিজ (please) কিছু মনে করো না।
• এখন আমি খুব বিজি (busy)।
• ডন্‌ট মাইন্ড (Don't mind) তোমার কথা আমার মনে ছিল না।

উপরের বাক্যগুলোর প্রচলিত ও স্বাভাবিক রূপ হলো:

• কিছু মনে করো না।
• আমি এখন খুব ব্যস্ত।
• কিছু মনে করো না, তোমার কথা আমার মনে ছিল না।

সাধারণত উঠতি বয়সী ছেলেমেয়েরা এ ধরণের বাক্য ব্যবহার করে থাকে। তাছাড়া মহিলাদের ক্ষেত্রে এ ধরণের ভাষা ব্যবহার করতে দেখা যায়। বয়স্ক পুরুষদের ভাষায় কৃত্রিমতা থাকলেও তার পরিমাণ বেশ কম। এই শ্রেণীর ভাষা-ভাষীদের মধ্যে বড়দের তথা গরুজনদের মান্য করার প্রবণতা বেশ কম। পরিবারে নারীদের প্রভাব এই শ্রেণীর ভাষা-ভাষীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

কুমারখালীর জনগোষ্ঠীর সিংহভাগই অল্পশিক্ষিত। অল্পশিক্ষিত বলতে অষ্টম শ্রেণী থেকে স্নাতকের নিচে পর্যন্ত বোঝানো হচ্ছে। এই শ্রেণীর ভাষা-ভাষীরা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধারণত অনুকরণ প্রিয় হয়ে থাকে। এরা সাধারণত গল্প-গুজব ও খেলাধুলা করে অনেক সময় ব্যয় করে থাকে। সংসারের কাজ কিংবা চাকরির প্রতি এদের আগ্রহ বেশ কম দেখা যায়। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া পিতা-মাতার সংসারে এরা

Dhaka University Institutional Repository

বহুদিন যাবত অলংকারের মত অবস্থান করে থাকে। সয়সের দিক থেকে এরা যুবক-যুবতীদের মধ্যে পড়ে।

ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুকরণের যে বিষয়টি বলা হচ্ছে তা হলো বাচন ভঙ্গির অনুকরণ। প্রত্যেক মানুষের বাচনভঙ্গি এক রকম হয় না। কেউ কেউ অতি শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে গিয়ে বিশেষ বাচনভঙ্গির সৃষ্টি করে থাকে। এটা তার নিজস্ব সৃষ্ট বাচনভঙ্গি। যেমন:

- তোমাকে তো আশকাল দিখাই যায় না।
  স্বাভাবিক রূপ: তোমাকে তো আজকাল দেখাই যায় না।
- পাশটার সময় আমার সাথে দিখা কোরো।
  স্বাভাবিক রূপ: পাঁচটার সময় আমার সাথে দেখা করো।
- কি যিন বুলতি চিয়ি ছিলাম?
  স্বাভাবিক রূপ: কি যেন বলতে চেয়েছিলাম।

উপরের উদাহরণের বাক্যগুলির স্বাভাবিক রূপ বাদে যে রূপ দেখানো হয়েছে তা বিশেষ ভঙ্গিতে উচ্চারণের ফল। নিজস্ব উচ্চারণ রীতিতে ভাষা ব্যবহারের কারণে এ ধরণের অবস্থার সৃষ্টি হয়। যে সব ভাষা-ভাষীরা অনুকরণ প্রিয় তারা ব্যতিক্রমধর্মী বাচন ভঙ্গিকে লক্ষ্য করে এবং সে রকম ভাষায় কথা বলতে চেষ্টা করে।

এমন কিছু ভাষাভাষী কুমারখালীতে আছেন যাঁরা নিজের প্রতি অতিমাত্রায় আস্থাশীল। এঁদের চাল-চলনে কিছুটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়। অন্যের কথার কিংবা অন্যের আচার-আচরণের দোষ ধরতে এঁরা পছন্দ করে। এই শ্রেণীর ভাষা-ভাষীরা শিক্ষিত এবং নিজেকে উচ্চ মর্যাদার ভেবে আনন্দ পায়। এঁরা কথায় কথায় ইংরেজি শব্দ কিংবা ইংরেজি খন্ড বাক্য ব্যবহার করে থাকেন। যেমন:

- আংকল (uncle) মার্কেটে (market) যাবেন না?
  স্বাভাবিক রূপ: চাচা/মামা বাজারে যাবেন না?
- আমি তাকে অল্‌য়েজ (always) ডিস্‌লাইক (dislike) করি।
  স্বাভাবিক রূপ: আমি তাকে পছন্দ করি নে।
- তোমার ম্যারেজ ডে (marriege day) কি নেক্‌স্ট (next) উইক (week)-এ?
  স্বাভাবিক রূপ: তোমার বিবাহবার্ষিকী কি পরবর্তী সপ্তাহে?

ইংরেজি যেহেতু আন্তর্জাতিক ভাষা। তাই ইংরেজি ভাষার প্রতি আগ্রহ অনেকের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কিছু শিক্ষিত ভাষাভাষী আছেন যাঁরা কথা বলার সময় অযথা ইংরেজি শব্দের বা খন্ডবাক্যের ব্যবহার করে থাকেন। এই শ্রেণীর ভাষাভাষীরা ভেবে থাকেন যে ইংরেজি শব্দ কিংবা খন্ড বাক্য ব্যবহার করলে তাঁর মর্যাদা সমাজে বেড়ে যাবে। এই শ্রেণীর শিক্ষিত ভাষা-ভাষীরা ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে নিজের মর্যাদা উঁচুস্তরে ভেবে নিজেই আনন্দ পেয়ে থাকেন। এঁরা সাধারণত নব্য ধনীক শ্রেণীর মধ্যে পড়ে।

কুমারখালীতে এমন কিছু শিক্ষিত ভাষাভাষী আছেন যাঁরা ভাষা ব্যবহারের প্রতি কিছুটা অসচেতন। ভাষা ব্যবহারের প্রতি অসচেতন বলতে তাঁরা কুমারখালীর আঞ্চলিকতা রক্ষা করে ভাষা ব্যবহার করতে পছন্দ করেন। এই শ্রেণীর ভাষা-ভাষীরা সাধারণত গ্রামে বসবাস করেন। এই শ্রেণীর ব্যবহৃত ভাষার উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন:

Dhaka University Institutional Repository

- মাটে যাতি কইছিলাম যে।
  স্বাভাবিক রূপ: মাঠে যেতে বলেছিলাম যে।
- ইস্কুলি গিছলি?
  স্বাভাবিক রূপ: স্কুলে গিয়েছিলে?
- অ্যাহুন টাকা দিতি পারবো নানে।
  স্বাভাবিক রূপ: এখন টাকা দিতে পারবো না।

এই শ্রেণীর ভাষাভাষীরা বাড়িতে এক রকম এবং কর্মক্ষেত্রে অন্যরকম ভাষা ব্যবহার থাকেন। বাড়িতে আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করলেও কর্মক্ষেত্রে এঁরা চলিত বাংলা ব্যবহার করে থাকেন।

গ্রন্থপঞ্জি

১. রামেশ্বর শ', ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, তৃতীয় সংস্করণ ১৪০৩, পুস্তক বিপণী, কলকাতা; পৃ. ৬৬৩
২. পি,এম, সফিকুল ইসলাম, ১৯৯২, রাজশাহী উপভাষা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা; পৃ. ৫
৩. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৭, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা; পৃ. ১৩৮
৪. মনিরুজ্জামান, ১৯৯৪, উপভাষা চর্চার ভূমিকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা; পৃ. ২০৯
৫. রামেশ্বর শ'. প্রাগুক্ত; পৃ. ৬৬৪
৬. প্রাগুক্ত; পৃ. ৬৬৪-৬৬৫

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

কুমারখালীর ভাষার সামাজিক স্তর বিন্যাস করতে গিয়ে যে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে এসেছে তা হলো:

- ভাষা ও সমাজ
- নারী ও পুরুষের ভাষা
- শিক্ষিতদের ভাষা
- অশিক্ষিতদের ভাষা
- হিন্দুদের ভাষা
- মুসলমানদের ভাষা
- পেশাগত ভাষা
- সুইপারদের ভাষা
- কুলিদের ভাষা
- প্রাচীন অধিবাসীদের ভাষা ও
- বর্তমান অধিবাসীদের ভাষা।

মানুষ সমাজে বাস করে। সমাজের নিয়ম-রীতি অনুযায়ী মানুষ চলে থাকে। অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বর্ণ, ধর্ম, পেশা ইত্যাদির কারণে সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে পৃথকীকরণ করা হয়ে থাকে। ভাষার মাধ্যমে একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে থাকে। ভাষা ও সমাজ দুটি বিষয়েরই মৌলিকত্ব বর্তমান। সামাজিক স্তর বিন্যাস বলতে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর অবস্থান বা বিন্যাস ব্যবস্থাকে বোঝায়।

সমাজে অবস্থানকারী ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর অসম অবস্থান বা অসম মর্যাদার কারণে ভাষায় তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কারণ সমাজ বলতে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে বোঝানো হয়ে থাকে এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যে মাধ্যমটির প্রয়োজন হয়, তা হলো ভাষা। সে জন্য সমাজে অবস্থানকারী মানুষের মর্যাদা অনুযায়ী ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সমাজে অবস্থানকারী মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যে শ্রেণী বিভাগ লক্ষ্য করা যায়, তা হলো যৌনগত শ্রেণীবিভাগ। যৌনগত কারণে নারী ও পুরুষের অবস্থান। নারী ও পুরুষের ভাষায় পার্থক্য বর্তমান। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেশ সাবধানতাভাব পরিলক্ষিত হয়। এমন অনেক শব্দ বা খন্ডবাক্য কিংবা বাক্য আছে, যা নারীরা ব্যবহার করেন না; সামাজিক বিধি নিষেধ এর মূলে অবস্থান করে বলে প্রতীয়মান হয়। পুরুষের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্য তেমন কোন বিধি নিষেধ লক্ষ্য করা যায় না। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষ থেকে সচেতন।

সামাজিক স্তর বিন্যাসে ক্ষেত্রে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শিক্ষার মধ্যে আবার শ্রেণী বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। উচ্চ শিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত, মোটামুটি শিক্ষিত ইত্যাদি শ্রেণীবিভাগে শিক্ষিত ভাষাভাষীদের স্তরীকরণ করা যায়। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষিত ভাষাভাষীদের মধ্যে সচেতনতা বা অসচেতনতার বিষয় লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষিত ভাষাভাষীদের বংশমর্যাদা, আর্থনীতিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে ভাষা প্রয়োগ করতে দেখা যায়।

শিক্ষিত ভাষাভাষীরা বাড়িতে বা তাঁর নিজস্ব এলাকায় সাধারণত আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে বা অন্য এলাকায় প্রমিতরূপ ব্যবহার করে থাকেন। ভাষার ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতা কিংবা

Dhaka University Institutional Repository

প্রমিতরূপ সামাজিক স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। একই ব্যক্তির বাচন ভঙ্গি বা কথা বলার ধরণ সামাজিক কারণে পৃথক হয়ে থাকে।

অশিক্ষিত ভাষাভাষীদের ভাষা সাধারণত এলাকা নির্ভর হয়ে থাকে। অশিক্ষিত ভাষাভাষীদের ধনী ও বংশগত ভাবে উচ্চ শ্রেণীর লোকদের মান্য করার প্রবণতা লক্ষণীয়।

ধর্মগত কারণে ভাষার শ্রেণীবিভাগ লক্ষ্য করা যায়। ধর্মসংক্রান্ত কিছু শব্দ বা খন্ডবাক্য কিংবা বাক্য আছে, যা বিশেষ ধর্মের ভাষাভাষীরা ব্যবহার করে থাকেন। ভাষার সামাজিক স্তরীকরণে ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ধর্ম সংক্রান্ত শব্দ বাদেও কুমারখালীতে কিছু শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, যা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে স্তরীকরণ করে থাকে; যেমন, হিন্দুরা ব্যবহার করেন 'জল', কিন্তু মুসলমানরা ব্যবহার করেন 'পানি'। তাছাড়া ছেলে-মেয়েদের নাম রাখা ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে ভাষার যে প্রয়োগ হয়ে থাকে, তাতেও ধর্মের উপস্থিতি লক্ষণীয়।

ভাষার সামাজিক স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে পেশাগত অবস্থা অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। পেশার সাথে সামাজিক মর্যাদার বিষয়টি জড়িত। শিক্ষা, আর্থনীতিক অবস্থা ও সামাজিক অবস্থা পেশাগত অবস্থার সাথে অনেকাংশে সম্পর্কিত। পেশাগত কারণে উচ্চ মর্যাদা ও নিম্ন মর্যাদার বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। উচ্চ মর্যাদা ও নিম্ন-মর্যাদার বিষয় জড়িত থাকার জন্য পেশাগত অবস্থা অনুযায়ী ভাষার প্রয়োগরীতি লক্ষ্য করা যায়।

যে কোন ভাষাভাষীদের শিক্ষা, সাংস্কৃতিক আচার-আচরণ ও বর্তমান অবস্থার সাথে প্রাচীন ভাষাভাষীদের যোগসূত্র অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আজকে যা বর্তমান, হয়তো বেশকিছু কাল পরই তা প্রাচীন। প্রাচীন অধিবাসীদের ভাষা ব্যবহার ও সামাজিক রীতি-নীতি পরবর্তী ভাষাভাষীদের ভিত্তিমূল হিসেবে বিবেচিত।

বর্তমান গবেষণা হতে কুমারখালীর ভাষার সামাজিক স্তর বিন্যাসে যা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে তা হলো, কুমারখালীর ভাষা প্রমিতভাষা বা শিষ্টভাষার কাছাকাছি এবং কুমারখালীর ভাষা আদর্শ কথ্য বাংলা বা প্রমিত বাংলার ভিত্তিমূলে অবস্থান করেছে।

গড়াই নদীর যে পাশে কুমারখালীর শহর সে এলাকার ভাষার সাথে অন্য এলাকার ভাষা-ভাষীদের ভাষা ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। কুমারখালীর ভাষাভাষীরা কিছু ব্যাতিক্রম ছাড়া অর্থ, শিক্ষা, ধর্ম, বর্ণ, বয়স. পেশা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখে ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। সমাজে একজন ব্যক্তির অবস্থান অর্থাৎ মর্যাদার সাথে ভাষা প্রয়োগের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বর্তমান গবেষকের পূর্বে অতীতে কোন ভাষাবিজ্ঞানী এ এলাকার ভাষার সামাজিক স্তর বিন্যাস করেন নি। সমাজ ও ভাষা দুটি বিষয়ই মানব জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে এলাকা ভিত্তিক বা অঞ্চল ভিত্তিক ভাষার সামাজিক স্তর বিন্যাস করলে সমাজে ভাষার ব্যবহার ও প্রয়োগরীতির অবস্থান সম্পর্কে পরিষ্কার ও বস্তুনিষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. রশেদ, আবুল কালাম মনজুর, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব (দ্বিতীয় সংস্করণ), ১৯৯৭, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।

২. ইসলাম, রফিকুল, ভাষাতত্ত্ব, চতুর্থ সংস্করণ: ১৯৯২, বুকভিউ, ঢাকা।

৩. ইসলাম, রফিকুল, ১৯৯৮, ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৪. মনিরুজ্জামান, উপভাষা চর্চার ভূমিকা, ১৯৯৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৫. নাথ, মৃণাল, ১৯৯৯, ভাষা ও সমাজ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।

৬. আজাদ, হুমায়ুন (সম্পাদিত), ১৯৮৫, বাঙলা ভাষা (২য় খন্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৭. মসা, মনসুর (সম্পাদিত), ১৯৯৪, মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৮. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার, ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৬, রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, কলিকাতা ।

৯. ইসলাম, পি,এম, সফিকুল, ১৯৯২, রাজশাহীর উপভাষা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১০. চট্টোপাধ্যায়, অশোক, ১৯৯৫, উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলন ও কাঙ্গাল হরিনাথ, লেখক সমাবেশ, কলকাতা।

১১. শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ, বাঙ্গালা ব্যাকরণ, উপক্রমণিকা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় মুদ্রণ বাংলা ১৩৮৩, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা।

১২. শ', রামেশ্বর, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা , তৃতীয় সংস্করণ: ৮ই অগ্রাহায়ন ১৪০৩, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

১৩. হাই, মুহম্মদ আবদুল, আহসান, সৈয়দ আলী; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৪, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

১৪. হক, মুহম্মদ এনামুল, (প্রধা. সম্পা.), লাহিরী, শিব প্রসন্ন,(সম্পা.), ১৯৮৪, বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষড়বিংশখন্ড, পুনরমুদ্রণ পৌষ ১৩৮৪, বিশ্বভারতী কলিকাতা।

১৬. বসু, রাজশেখর,(সংকলিত), চলন্তিকা আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান, ত্রয়োদশ সংস্করণ; ১৩৮৯, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স (প্রা: লি.) কলিকাতা।

১৭. শরীফ, আহমদ, (সম্পা.), ১৯৯২, বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৮. হুমায়ুন, রাজীব, ১৯৯৩, সমাজ ভাষাবিজ্ঞান, দ্বীপ প্রকাশন, ঢাকা।

১৯. দেব, আশুতোষ, নূতন বাঙ্গালা অভিধান, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৭৬, দেব সাহিত্য কুটীর (প্রা: লি:) কলিকাতা।

২০. চৌধুরী, আনোয়ার উল্লাহ; শামীম, ইশরাত; রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর; হক, মোহাম্মদ ইমদাদুল; সমাজবিজ্ঞান শব্দকোষ, ১৯৮৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২১. বটোমোর, টম; সমাজবিদ্যা তত্ত্ব ও সমস্যার রূপরেখা; হিমাচল চক্রবর্তী (অনুদিত), ১৯৯২, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা।

২২. সেন, রংগলাল; ১৯৮৫, বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২৩. মুসা, মনসুর; ১৯৮৪, ভাষা পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, মুক্তধারা, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

২৪. সরকার, পবিত্র; ভাষা, দেশ, কাল; ১৯৮৫ জি. এ. ই. পাবলিশার্স, কলিকাতা।

২৫. ১২৫তম বর্ষ পূর্তি স্মরণিকা (১৮৬৯-১৯৯৪), ১৯৯৪, কুমারখালী পৌরসভা, কুষ্টিয়া।

২৬. গ্রামবার্ত্তা, (এই পত্রিকা কুমারখালীর মথুরানাথ যন্ত্রে শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রিন্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত), ফেব্রুয়ারি ও মার্চ, ১৮৮১।

২৭. HOCKETT, CHARLES F. 1958. A COURSE IN MODERN LINGUISTICS, THE MACMILLAN COMPANY, NEW YORK.

২৮. BLOOM FIELD, LEONARD, LANGUAGE, Reprinted 1967, GEORGE ALLEN & UNWIN LTD, LONDON.

২৯. CAMBRIDGE INTERNATIONAL DICTIONARY *of* ENGLISH, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, Reprinted 1997, New York.

৩০. THE NEW SHORTER OXFORD ENGLISH DICTIONARY,(Ed.) LESLEY BROWN, Volume-1, Oxford University Press, Reprinted 1993, New York.

৩১. Schiffman, Harold F. 1998, Linguistic Culture and Language Policy, ROUTLEDGE, London.

৩২. Trudgill, Peter, Sociolinguistics: An Introduction to language and Society; Reprinted1988, Penguin Books, London, England.

৩৩. English Bengali Dictionary, 1993, Bangla Academy, Dhaka.

?82705